মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[ষষ্ঠ খণ্ড]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[ষষ্ঠ খণ্ড]

মূল

মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

আম্মার আবদুল্লাহ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা | জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২ | ০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫ | ০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[ষষ্ঠ খণ্ড]

মূল : মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ : আম্মার আবদুল্লাহ

প্রকাশক : মাওলানা মুফতী ইসহাক
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী, বাংলার প্রকাশন
রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ

মূল্য : ৫৪০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার আব্বা মুফতি হাবীবুর রহমানকে

যার জীবন থেকে নিজের অজান্তেই গ্রহণ করেছিলাম এই সবক মানুষের মধ্যেই তো থাকো, তাই দুঃখও পাবে, সুখও পাবে কিন্তু এমন কিছু করে যাও, যেন এপার-ওপারের অধিবাসীরা খুব সহজে তোমাকে ভুলতে না পারে এবং আমার শ্বশুর আব্বা মাওলনা ফারুক আহমাদকে যিনি প্রায়ই আমাকে বলেন,

বাবা! যদি সততা ও দৃঢ়তার সাথে কোনো কাজ নিয়মমতো, নিয়মিত ও পরিমিত করতে পারো তাহলে শেকড় থেকে শিখরে পৌঁছতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদকের কথা

হিজরি ৩৫ থেকে ৪০। বিপদসঙ্কুল সময়কাল। খলিফা তখন হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা তখন ঘনঘোর সঙ্কটে। রাজধানী মদিনায় বিরাজ করছে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। ঘটে চলছে একের পর এক বিদ্রোহ। কারণ, কিছুদিন হলো ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রা. কে শহিদ করা হয়েছে নির্মমভাবে। এর জের ধরেই মূলত তৈরি হয়েছে এই সব সংঘাত। তবে অস্থিতিশীল এই সময়টা খুব বেশি স্থায়ী হলো না। স্থিতি আসতে শুরু করলো অনেক রক্ত ঝরিয়ে। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর শাসনামলে। শুরুর দিকে যদিও তিনি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন; কিন্তু ধীরে ধীরে সব স্থির ও শান্ত হয়ে এলো। ফিরে এলো নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা। ফলে মুসলিম জাহান বাঁক ঘুরে দাঁড়ালো। নিজেদের মতো করে পুনরায় রচনা করতে থাকলো বিজয়ের ইতিহাস। তবে এই গতি কিছুটা মন্থর হয়ে এলো হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর ইনতেকালের পর। মুসলিমবিশ্বে পুনরায় দেখা দিলো কলহ। রচিত হলো কারবালা, হাররার মতো ভয়াবহ কিছু ট্রাজেডি। এরপর হযরত যুবাইর রা.-এর সময়ে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলেও তা নস্যাৎ হলো অবিলম্বে। ঘটনার ঘনঘটা জারি থাকলো। একসময় এলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.। পৃথিবী আবার প্রাণ খুলে নিলো শান্তির নিঃশ্বাস। তৈরি হলো খোলাফায়ে রাশেদার সেই আবহ। কিন্তু খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। তিনিও ইনতেকাল করলেন। পথ পেরুতে পেরুতে উমাইয়ারা ক্লান্ত হলো একসময়। আর সত্য বলতে পৃথিবীর কোনো সাম্রাজ্য বা রাজবংশই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে চিরস্থায়ী নয়। ব্যক্তিগত বা সামষ্টিগত কৃতিত্বের কারণে কোনো সাম্রাজ্যের সময়-সীমা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হলেও কালের করালোগ্রাস কেউই এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই তো ইবনে খালদুন বলেছেন, 'যেকোনো রাজবংশের স্থিতিকাল একশত বছর এবং ক্ষমতাসম্পন্ন রাজবংশকেও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা এবং ক্রমাবনতি ও পতন এ তিনটি নির্দিষ্ট অধ্যায়কে অতিক্রম করতে হবে। 'উমাইয়া সাম্রাজ্যও প্রায় নব্বই বছরের স্থিতিকালের মধ্যে

উপরিউক্ত তিনটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে এসেছিলো। ফলত প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

এই এতক্ষণের কথাগুলো মূলত ছিলো আমার অনূদিত অংশের সারকথা। লেখক ইসমাইল রেহান সেই ইতিহাসের বাঁক-ভাঁজগুলো খুলে খুলে বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণ দক্ষতায়। বিকৃতির কারগিররা ক্ষণিকের জন্য ইতিহাসের নিজস্ব রং বদলে যেই কৃত্রিম রঙের কারসাজির আয়োজন করেছিলো তিনি তাদের সেই খেলাঘরের অসারতা দেখিয়ে দিলেন। বের করে আনলেন ঋদ্ধ ও পরিশুদ্ধ ইতিহাস। মিথ্যায় চাপাপড়া সেই ইতিহাসকে ধুয়ে-মুছে সত্যের চাদর পরিয়ে হাজির করলেন আমাদের সামনে। আশাকরি পাঠক খুব সহজেই দেখে উঠতে পারবেন সেই অবিকৃত ইতিহাসের অবিমল অবয়ব।

আম্মার আবদুল্লাহ
১৭/ ২/ ২১ ইং

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ’র স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান ‘আল মানহাল পাবলিশার্স’-এর পক্ষ থেকে মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে প্রদত্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশের

অনুমতিপত্র
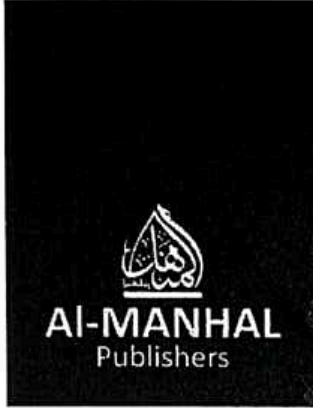
92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

St# 4 & 5, Block: 1/A,
Near Shaikh Zaid Islamic Centre,
Gulistan-e-Juhar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

Ref: AMP-107 ***Date:*** 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh.

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / Institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلادیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور و معروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مجوزہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

Al Manhal Publisher
Block 1-A, Gulistan-e-Juhar, Karachi
021-34612901 | 0321-3135009

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز، کراچی

সূচিপত্র

ফেতনার যুগ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর খেলাফতকাল

উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষীজন

ফেতনার যুগ

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া থেকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর শাহাদাত

রজব ৬০ -জুমাদাল উলা ৭২ হিজরি
এপ্রিল ৬৮০-অক্টোবর খ্রিষ্টাব্দ

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগ

রজব ৬০ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরি

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরাধিকার হলেন ৩৪ বছরের ইয়াজিদ। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় সে ছিল হিমসের উপকণ্ঠবর্তী হাওয়ারিন দুর্গে। পিতার ইনতেকালের এই দুঃসংবাদ শুনে দ্রুত রওনা করল খেলাফতের রাজধানীর উদ্দেশে। তবে ততক্ষণে হজরত মুয়াবিয়ার কাফন-দাফন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১]

এরপর ইয়াজিদ দেশের নেতৃবর্গ এবং দামেশকের অধিবাসীদের সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক একটি পত্র লেখে–'মুয়াবিয়া আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে খেলাফত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং অনুগ্রহ করে শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন। তিনি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। তিনি পরবর্তীদের চেয়ে উত্তম আর পূর্ববর্তীদের চেয়ে নিম্নস্তরের ছিলেন। আমি বলছি না যে, তিনি মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন; বরং তার আসল অবস্থা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। যদি তিনি ক্ষমা পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই। আর যদি পাকড়াও হন তাহলে সেটা তার নিজের ভুলত্রুটির কারণে। তার ইনতেকালের পর রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। তবে আমি এর জন্য নিজে থেকে কোনো চেষ্টা-তদবির করিনি। আল্লাহর যা পছন্দ, তিনি তা-ই করেছেন। তাই আল্লাহর জিকির এবং ইসতেগফার করাই উত্তম।"[২]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/১৬২; হাওয়ারিন দামেশক থেকে প্রায় তিন-চারদিন পায়ে হাঁটা পথের দূরত্বে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। মাসালিকুল আবসার : ১/৭২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ : ১১/৪৫৯; এবং এটা আরো বের করেছেন ইবনে কুতাইবা, যার শুরুটা ছিল 'নিশ্চয় মুয়াবিয়া ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একটি রশি।' উয়ুনুল আখবার : ২/২৬০

বাইয়াতের জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা

আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষজীবনে হজরত নুমান বিন বাশির রা. ছিলেন কুফার গভর্নর। আবদুল্লাহ বিন জিয়াদ ছিলেন বসরার গভর্নর। আর মদিনার গভর্নর ছিলেন ওয়ালিদ বিন উকবা। ইয়াজিদ তাদের কাউকে অপসারণ না করে সকলকেই আপন দায়িত্বে বহাল রাখল। এভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর সকল স্থানে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুসংবাদ জানানো এবং সবাইকে তার হাতে বাইয়াত করার জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা করার আদেশ দিলো।[৩]

হজরত হুসাইন রা. ইয়াজিদের বাইয়াত কেন গ্রহণ করলেন না?

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে হজরত হুসাইন ইবনে আলি রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান এই ছিল যে, পৈত্রিক রাজত্ব থেকে দূরত্ব বজায় রেখে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের আদলে শুরাভিত্তিক ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও উম্মতের নেতৃত্ব-লাগাম উত্তম থেকে আরো উত্তম কারো হাতে হস্তান্তর করা। ঠিক এই কারণেই তারা ইয়াজিদের হাতেও বাইয়াত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। অবশ্য ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে যাওয়াটা যদিও সময়ের দাবি ছিল; কিন্তু উচিত এটাই ছিল যে, এই পৈত্রিক রাজত্বের ধারাটা বন্ধ করে দেওয়া। কারণ এতে অনেক অনিষ্টের আশংকা রয়েছে। এজন্য তাদের সর্বোত্তম করণীয় এটাই ছিল যে, তারা ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে দল ভারী না করে ইসলামি রাজনীতির সঠিক ও শুদ্ধ চিন্তাধারাকে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা।

হজরত হুসাইন রা. কি বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন?

বিক্ষিপ্ত কিছু আলামত দ্বারা এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তাধারা প্রথমদিকে এমনই ছিল যে, নিজেদের মতাদর্শকে ভেতরে ভেতরে লালন করবেন এবং নীরব থাকবেন। সেইসাথে তাদের চিন্তাধারার বিপরীত কোনো মত ও পথে পা বাড়াবেন না। তবে এমন কোনো সহিহ বর্ণনা

---

[৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৭

পাওয়া যায় না, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তারা কোনো বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। নয়তো হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তো হজরত মুয়াবিয়া রা. জীবদ্দশাতেই কুফা থেকে প্রচুর চিঠি এসেছিল, যেগুলোতে হজরত হুসাইন রা. কে কুফায় এসে শাসনভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।[৪] কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। এমনকি ইয়াজিদের রাজত্ব সত্ত্বেও তিনি কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। বরং নিজের মতাদর্শ লালন করে মদিনাতেই থাকতে চেয়েছিলেন আজীবন। কিন্তু ইয়াজিদ যখন জোরজবরদস্তি করে তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো, তখন তিনি আশ্রয়শূন্য হয়ে পড়লেন। ফলে কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ তার সামনে খোলা রইলো না।[৫]

ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল

ইয়াজিদের জন্য উচিত এটাই ছিল যে, হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তার বাইয়াতগ্রহণে বাধ্য না করা। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেও এমন অনেকে ছিলেন, যারা তার বাইয়াত গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কাউকে অসম্মানিত বা বাইয়াতগ্রহণে বাধ্য করেননি। বরং তাদেরকে তাদের মতাদর্শের উপরেই থাকতে দিয়েছেন। সেইসাথে তাদের সম্মানও রক্ষা করেছেন শতভাগ। শুধু হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুই নয়, হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেও তার বাইয়াতগ্রহণে অসম্মত ব্যক্তিদের তিনি সামান্যও কষ্ট দেননি। নিজের আদর্শের উপর চলতে বাধ্য করেননি। কিন্তু ইয়াজিদ প্রথম রাজনৈতিক ভুলটাই করেছিল এক্ষেত্রে। কারণ সে বাইয়াতগ্রহণে অসম্মত ব্যক্তিদের বাধ্য করছিল তার বাইয়াত গ্রহণ করতে। তা ছাড়া সে পূর্ণমাত্রায় উপেক্ষা করেছিল তার পিতার অসিয়ত, যেখানে হজরত মুয়াবিয়া রা. বলেছিলেন, 'কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কঠোরতা করো না এবং নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করো না।'[৬]

---

[৪] আল মুজামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/৮০

[৫] আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৫৫-৫৬

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

পিতার সেই অসিয়ত ইয়াজিদ খুব সহজেই ভুলে গিয়ে নিচ্ছিল একের পর এক সব ভুল সিদ্ধান্ত। যার কারণে সমস্যাও বাড়ছিল পাল্লা দিয়ে। ফলত অনেক কিছুই চলে যাচ্ছিল তার আয়ত্তের বাইরে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে একথা জানা যায়, ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণের পরপরই হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আজাদকৃত গোলাম রুযাইককে মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উকবার কাছে এই সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল যে, হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে সে যেন দ্রুত তার কাছে ডাকে আর তাদের থেকে বাইয়াত নিয়ে নেয়।

প্রতিনিধি মদিনায় যখন পৌঁছল তখন রাত হয়ে গিয়েছে। এরপর দারোয়ানের সাথে অনেক পীড়াপীড়ি করে গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উতবার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ফরমানের কথা জানাল।[৭]

হজরত হুসাইন রা. ও ইবনে যুবাইর রা. এর মদিনা ছেড়ে মক্কার পথে রওনা

ওয়ালিদ ইবনে উতবা এই আদেশ পেয়ে প্রথমে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে নিজ প্রাসাদে তলব করলেন। এরপর বাইয়াত গ্রহণ করতে বললে তিনি বললেন, দেখুন, এটা বাইয়াতের সময় না। আমার মতো ব্যক্তি এভাবে গোপনে বাইয়াত করতে পারে না। কাল মিম্বরে বসে আপনি আমার থেকে বাইয়াত নিন।

এর ঠিক কিছুক্ষণ পরেই এলেন হজরত হুসাইন রা.। যেহেতু ওয়ালিদ বিন উতবা একটু নরম মনের ও আপসপ্রিয় মানুষ ছিলেন এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায় নিশ্চিন্ত ছিলেন; তাই তিনি হজরত হুসাইন রা. কে বাইয়াতগ্রহণে আর জোর করলেন না। বরং উভয়কেই যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে তাদেরকে দেখাশোনার জন্য কিছু লোককে পেছনে নিযুক্ত করে দিলেন। হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. রাষ্ট্রের অবস্থা দেখে অনুধাবন

---

[৭] তারিখে খলিফা : ২৩২ ওয়াহাব ইবনে জারির তিনি জারির ইবনে হাযেম থেকে তিনি মুহাম্মদ থেকে আর তিনি রুযাইক থেকে বর্ণনা করেছেন, আল ইকদুল ফারিদ : ৫/১২৫ ইবরাহিম বাইহাকির আলমাহাসিন ওয়াল মুসাবি; ২৬

করলেন, ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ না করলে তাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যেহেতু বাইয়াত গ্রহণ করতে তারা বদ্ধপরিকর এবং তাদের একান্ত ও একমাত্র চাওয়া; তাই হজরত যুবাইর রা. রাতের শেষপ্রহরে ফুর-এর পথধরে মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।[৮]

পরদিন সকালে ওয়ালিদ যখন এই সংবাদ জানতে পারল তখন সে ৩০ বা ৮০ জন অশ্বারোহী সৈন্যকে তার পশ্চাতে পাঠাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি হাতছাড়া হয়ে গেলেন। ফলত তাকে আর ফেরাতে সক্ষম হলো না।[৯]

এর এক-দুদিন পর হজরত হুসাইন রা. পরিবার-পরিজনসহ মদিনা ছেড়ে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন।[১০]

তাদের মক্কা যাওয়ার কারণ হলো, মদিনা শহরটি শামের অনেকটা কাছাকাছি ছিল। মক্কা ছিল আরো দ্বিগুণ দূরত্বে। তা ছাড়া মক্কা পাহাড়-পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং সেখানে প্রশাসনের পক্ষে তাদের গ্রেফতার করা ছিল ভীষণ কঠিন ব্যাপার। উপরন্তু কাবার সম্মানের দিকটা সামনে রেখে এটা সহজেই ভাবা যাচ্ছিল যে, ওখানে প্রশাসন আপত্তিকর কিছু করে জনমনে ঘৃণার উদ্রেক করবে না। তো এসব দিক বিবেচনা করে তারা মক্কায় অবস্থানকেই নিজেদের জন্য উপযুক্ত মনে করলেন।

মদিনায় রওনার পূর্বে হুসাইন রা. এর সাথে ইবনে উমর রা. এর সাক্ষাৎ

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মদিনায় রওনার পূর্বে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছেও গিয়েছিলেন। তিনি হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইচ্ছার কথা শুনে বললেন, তুমি মদিনা ছেড়ে যেয়ো না। কিন্তু হজরত হুসাইন রা. কিছু বললেন না। এরপর কথার এক ফাঁকে হজরত ইবনে উমর রা. কে সেই চিঠিও দেখালেন, যাতে ইরাকবাসীদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা

---

[৮] তারিখে ইবনে খাইয়াত : ২৩২; ওয়াহাব ইবনে জারির থেকে, তিনি জুয়াইরিয়া বিনতে আসমা থেকে, তিনি মদিনার কোনো এক বৃদ্ধ থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

[৯] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩০০; তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪১

[১০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪১

লেখা ছিল। ইবনে উমর রা. সেই চিঠি দেখেও বললেন, তুমি ওইসব লোকের কাছে যেয়ো না।

এভাবে যখন বিদায়ের সময় হয়ে এলো তখন হজরত ইবনে উমর রা. হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। খুব কাঁদলেন। আর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে শহিদ, আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার হাতে সোপর্দ করলাম।[১১]

মক্কা যাওয়ার পথে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হজরত আবদুল্লাহ বিন মুতি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছেন?

উত্তরে হজরত হুসাইন রা. বললেন, আপাতত মক্কায় যাচ্ছি। পরে কী করব সেটা ভেবে দেখতে হবে।[১২]

এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, হজরত হুসাইন রা. কে কুফাবাসীরা উদ্বুদ্ধ করার পরেও তিনি সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। কারণ তিনি কুফায় যেতে চাইলে মদিনা ছেড়ে সোজা কুফাতেই চলে যেতেন, মক্কায় যেতেন না। তা ছাড়া মদিনা থেকে সেখানকার দূরত্বও ছিল তুলনামূলক অনেক কম।

অথচ প্রসিদ্ধ বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি রবিবার ২৭ বা ২৮ রজব মদিনা থেকে বের হয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সফর করে শুক্রবার ৩ বা ৪ শাবান মক্কায় পৌছেন। সেখানে তিনি চার মাস পাঁচদিন অবস্থান করেন।[১৩]

হজরত হুসাইন রা. এর আন্দোলনের আসল প্রেক্ষাপট

হজরত হুসাইন রা. তো সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নবীজির একান্ত সান্নিধ্য পেয়ে বেড়ে উঠেছেন এবং আত্মিক উন্নতি ও স্বচ্ছ ঈমানকে নিজের

---

[১১] সর্বশেষ তিনি একথাও বলেছিলেন-"আসতাওদিকুল্লাহ মিন মাকতুল"। মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদিস-১৫১৩০ হাইসামি বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন বাযযার এবং তাবারানি। আর বাযযার ছিলেন একজন সিকাহ রাবি। আল মু'জামুল আওসাত লিততাবারানি। হাদিস, ৫৯৮, তারিখে দিমাশক : ১৪/২০২

[১২] আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৫৫-৫৬

[১৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮১; আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৬০

ভেতর ধারণ করেছেন। সেইসাথে হজরত আবু বকর, হজরত উমর ও হজরত উসমান রা. থেকে শুধু সুনজরই নয়; বরং অনেক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনও করেছিলেন। তিনি ছিলেন পুরো উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বংশের। ছিলেন হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচার-বিবেচনার বিশ্বস্ত ধারক। অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও গভীর জ্ঞানে ছিলেন প্রাজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি অপরিণামদর্শী কোনো বখাটে যুবক ছিলেন না; বরং ছিলেন বিচক্ষণ ও শতভাগ সচেতন। তা ছাড়া বয়সের বিচারেও ছিলেন অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং তার ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই অযৌক্তিক যে, তিনি শুধু ইয়াজিদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতা এবং তার পাপাচারের উপর ভিত্তি করে বাইয়াত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। বরং এটা ছিল দীন ও ঈমানের আলোকে তার স্বার্থমুক্ত ও আন্তরিক সিদ্ধান্ত।

বাস্তবতা হলো, তার অন্তর্দৃষ্টিতে ইসলামি রাজনীতির মূল অবকাঠামো ধরা পড়েছিল বলেই তিনি স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই পৈত্রিক রাজত্ব এক ভয়ংকর ফেতনা হয়ে দাঁড়াবে। যদিও এখন এটাকে খুবই সাধারণ ও সামান্যই মনে হচ্ছে।

সমুদ্রের বাধে সামান্য ফাটল দেখে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সহজেই উত্তাল পানির ভয়ংকর আচরণ আঁচ করতে পেরে নিজের সব কাজকর্ম ফেলে সামান্য সেই ফাটলটা বন্ধ করার কাজে নেমে যান এবং প্রাণপণে কাজ করেই চলেন তেমনই হজরত হুসাইন রা. বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষয়টা সাদা ও সাধারণ চোখে দেখতে যদিও ঠুনকো; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ভয়াবহ। যার ফলে অনেকে তাকে অনেক কিছুই বলেছেন; কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দেননি। বরং নিজ সিদ্ধান্তেই ছিলেন অবিচল। ঠিক যেমন মানুষের বাজে কথায় কান দেন না সমুদ্রের বাধে সামান্য ফাটল দেখা সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি ফাটলটা বন্ধ করার কাজে জীবন দিচ্ছেন।

এখন এই কথা থেকে যায় যে, হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর কি তাহলে রাষ্ট্রের বিরোধিতা ও বিদ্রোহের তকমা লাগানো যায়?

আসলে আমরা যদি তার আন্দোলনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু খতিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে, ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ও তার ক্ষমতার

প্রতিরোধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে ছিল এক অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব তথা ফরজ। সেই কারণেই বীরত্ব, সাহসিকতা, সতর্কতা ও মধ্যপন্থার যেই বিরল চিত্র দেখতে পাই তার আন্দোলনে, তাতে হজরত হুসাইন রা. কে বিদ্রোহীদের কাতারে খুব সহজে দাঁড় করানো যায় না। তা ছাড়া হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে তখনো ইয়াজিদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ হজরত মুয়াবিয়া রা. জীবদ্দশায় ইয়াজিদকে পৈত্রিক রাজত্ব দেওয়ার যেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সেটা ছিল শুধু কারো কারো পরামর্শের ভিত্তিতে। আর শুধু এমন পরামর্শ দ্বারা ইয়াজিদের খেলাফত সাব্যস্ত হয়ে যায় না। যেমনটা বলেছেন ইসলামি রাজনীতির প্রাজ্ঞ ও বরিত ব্যক্তি কাজি আবু ইয়ালা আল ফাররা রহ.—'খেলাফত শুধু পৈত্রিকভাবে দিয়ে দিলেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। বরং উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের ঐকমত্যে ও তাদের সকলের স্বীকারোক্তিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।'[১৪]

তা ছাড়া তখন অবস্থা এমন ছিল যে, ইয়াজিদ গদিতে বসেছিল ঠিকই; কিন্তু শাম ছাড়া কোথাও কেউ তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারছিল না। দামেশক ছাড়াও তখনকার ইসলামি রাজনীতির অন্যসব কেন্দ্রীয় শহর, যেমন : মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা এবং হিজাজের অধিবাসীরাও ইয়াজিদের খেলাফত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় যখন ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করার কথা উঠল তখন সবচেয়ে রক্ষণশীল অবস্থানে ছিলেন হিজাজের নেতৃবর্গ। হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর তো

---

[১৪] যোগ্যতা থাকার শর্তে বর্তমান খলিফা তার পিতা বা পুত্রকে মনোনয়ন দিতে পারেন। কেননা, মনোনয়নদানের অর্থ খেলাফতের পদে বরণ করে নেওয়া নয়; বরং মুসলমানদের বরণের মাধ্যমেই তিনি বরিত হন। আর তখন সন্দেহেরও অবসান ঘটে। আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ: ৯

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি বলেছেন, উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত এই যে, যুগের খলিফা একক সিদ্ধান্তে যে-কাউকে ভাবী খলিফারূপে মনোনয়ন দিতে পারেন। অবশ্য সেটা নিছক প্রস্তাবের মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং পরবর্তীতে উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের তা অনুমোদন ও প্রত্যাখ্যানের পূর্ণ অধিকার থাকবে। সে-হিসেবে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর ইনতেকালের পর উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুমোদন ও মঞ্জুরি লাভের আগ পর্যন্ত ইয়াজিদের খেলাফত স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বলা চলে না। (হজরত মুয়াবিয়া রা. আওয়ার তারিখি হাকায়েক : ১২৬)

মসজিদে নববির চত্বরে দাঁড়িয়ে স্পষ্টই ঘোষণা দিয়েছিলেন– খলিফা বানানোর এই পদ্ধতি নিছক রোম-পারস্যের নিয়মের নতুন রূপ ছাড়া কিছুই নয়। হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এবং হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. সেই পরামর্শে শরিক না হয়ে নিজেদের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও বাইয়াত গ্রহণে 'আজ না কাল' করে করে নিজের অনীহা প্রকাশ করছিলেন। ইয়াজিদের ব্যাপারে ভাবছিলেন যে, সে নিছক শক্তি ও অস্ত্র-বলে গোটা ইসলামি জাহানে তার অবৈধ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চাচ্ছে। অনেক সাহাবি তো ইয়াজিদের বাইয়াত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।[১৫] ওদিকে ইরাকের লোকেরাও ইয়াজিদের বাইয়াতগ্রহণে সম্মত ছিল না এবং তাদের থেকে হজরত হুসাইন রা. কে বারবার লেখা চিঠিগুলো সেকথাই প্রকাশ করছে যে, ইয়াজিদের রাজত্ব সেখানে তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি ইয়াজিদের খুব কাছের কয়েকজন গভর্নরও এটা বুঝতে পারছিলেন না যে, ইয়াজিদের ক্ষমতা থাকবে না শেষ হয়ে যাবে? তাদের আস্থা ছিল হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর। যেমন কুফার গভর্নর নুমান ইবনে বাশির একথা স্পষ্টই বলেছিলেন যে, আমাদের কাছে বাহদালের নাতির চেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিই অধিক প্রিয়।[১৬]

এই অবস্থায় হজরত হুসাইন রা. ভাবছিলেন, ইয়াজিদ যেহেতু এখনো সফল হয়নি, এখনো যেহেতু গোটা ইসলামি জাহানের উপর জবরদখল প্রতিষ্ঠা পায়নি, সবদিকের মানুষজনও তার খেলাফত মেনে নেয়নি; তাই চেষ্টা করলে তাকে প্রতিরোধ করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব। তার এই চিন্তাচেতনার কারণে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিদ্রোহী ভাবাটা ঠিক হবে না। কারণ, তিনি কোনো ন্যায় বা আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেননি। তিনি চেয়েছেন উম্মাহর মূর্তিমান অভিশাপ

---

[১৫] শাহার ইবনে হাওশাব বলেন, যখন আমার কাছে ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণের প্রস্তাব এলো তখন আমি বললাম, হায়! আমি যদি শামে চলে যেতাম তাহলে হয়তো বাইয়াতের এই অনিষ্ট থেকে হেফাজতে থাকতাম। (জামে মাআমার ইবনে রাশেদ : আশরাতুস সাআহ অধ্যায়)

[১৬] আল-মিহান : ১৫০ পৃষ্ঠা

ইয়াজিদের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করে খোলাফায়ে রাশেদিনের আদলে একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে নিরাপত্তা, শান্তি ও সুশৃঙ্খল জীবন উপহার দিতে। উপরন্তু তার সামনে নবীজির সেই হাদিস ছিল, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় দেখে তখন সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন মুখে হলেও প্রতিহত করে। আর যদি এতেও সক্ষম না হয় তাহলে অন্তত মনে যেন সে অন্যায়ের ঘৃণা পোষণ করে। তবে এটা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[১৭]

হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে তখনো তাকে প্রতিহত করার মতো শক্তি ও সুযোগ ছিল। এজন্য তারা মক্কায় গিয়ে উভয়ে একত্র হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ইয়াজিদের ক্ষমতা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া যাবে না। সেজন্য আমাদের যা করতে হয় আমরা তাই করব এবং এই জিহাদকে আমৃত্যু অব্যাহত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করব। যদিও এতে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এমনকি জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকাও রয়েছে শতভাগ। কিন্তু তবু আমাদের এ পথই অবলম্বন করতে হবে। কারণ ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ও তার ক্ষমতার প্রতিরোধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া এখন আমাদের জন্য অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব তথা ফরজ।

মদিনায় ধরপাকড়, ওয়ালিদ ইবনে উতবার অপসারণ ও উমর ইবনে সাঈদের নিয়োগ

হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন মদিনা থেকে চলে গেলেন তখন গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবা আবদুল্লাহ বিন মুতি রা. এবং মুসআব ইবনে আবদুর রহমান বিন আউফ রা. কে (যিনি আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন) গ্রেফতার করে জেলে বন্দি করে রাখল। তখন মদিনার অধিবাসীরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলল, আপনি এই অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

---

[১৭] সহিহ মুসলিম : ১৮৬ কিতাবুল ঈমান অধ্যায়। সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০১৩ মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১০০৯

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. পেরেশান হয়ে ছুটে গেলেন মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবার কাছে।

“দেখুন, আপনারা নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য হকের উপর চলুন। জুলুম ও অন্যায় পথ অবলম্বন থেকে বিরত থাকুন। আপনি যাদেরকে বন্দি করেছেন, তারা নিরপরাধ। সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দিন।”

ওয়ালিদ নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল– “আমিরুল মুমিনিন, ইয়াজিদের নির্দেশ এমনটাই ছিল।”

মদিনার অধিবাসীগণ যখন দেখল ইবনে উমরের মতো লোকের সুপারিশও কোনো কাজে এলো না, তখন তারা নিজেরাই জেলখানায় হামলা করে বসল। এতে মুক্তি পেয়ে গেলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন মুতি রা.। তিনি তখনই সেখান থেকে পালিয়ে চলে যান মক্কায়, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে।[১৮]

হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ করতে না পেরে ইয়াজিদের পেরেশানি খুব বেড়ে গেলো। বাইয়াত করতে না পারার ব্যর্থতা সে সবটা চাপিয়ে দিলো গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবার উপর। সর্বোপরি তাকে দায়িত্বে অবহেলার কারণে মদিনার প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণ করে তার পরিবর্তে নিয়োগ করল আমর ইবনে সাঈদকে, কঠোরতায় যে ছিল সবার শীর্ষে।[১৯] এরপর দায়িত্ব পেয়ে সে রমজান মাসেই মদিনায় আগমন করে।[২০] আসার সময় সে মক্কায় আক্রমণের শপথ করে এবং দৃঢ়চিত্তে সেকথা ঘোষণা করে,যেখানে হজরত হুসাইনসহ অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে আমর ইবনে সাঈদের জন্য এটা একেবারে সহজসাধ্য কোনো কাজ ছিল না। তা ছাড়া শাওয়াল মাস শুরু হয়ে যাবে যাবে অবস্থা। হাজিদের কাফেলাও মক্কার উদ্দেশ্যে রওনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমনিতেও বড় বড় অনেক ব্যক্তি সেখানে অবস্থান করছেন। তাই জিলহজ মাস শেষ হওয়া

---

[১৮] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩০২ এ ঘটনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইয়াজিদের ক্ষমতা তখনো শুধু নামেই ছিল, কাজে কিছুই ছিল না। একমাত্র শামের অধিবাসী ছাড়া তার কর্তৃত্ব কেউ মেনে নিতে চায়নি।

[১৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩০২

[২০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৩

এবং হাজিদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না।

হুসাইন রা. ইরাক যাওয়ার ইচ্ছা কেন করলেন?

মক্কায় যাওয়ার পর থেকে হজ চলাকালীন পূর্ণ সময়টাই হজরত হুসাইন রা. ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে খুব ভাবলেন। পরস্পর পরামর্শ করলেন। একপর্যায়ে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, আমাদের এই আন্দোলনটা অব্যাহত রাখার জন্য প্রথমে নিরাপদ কোনো জায়গা দরকার, যেখান থেকে মূল আন্দোলন পরিচালিত হবে। কিন্তু সেই স্থানটা কোথায় হবে—এ নিয়ে তাদের মধ্যে দেখা দিলো মতানৈক্য। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মক্কাকেই আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং উপযুক্ত মনে করলেন। কারণ, এখানে নবীজির অনেক বড় বড় সাহাবি উপস্থিত। শুদ্ধ তাওহিদি চেতনা লালনকারীদের সংখ্যাও অনেক। সেইসাথে কুরাইশ ছাড়াও তাদেরকে দেখাশোনা করার মতো লোক আছে এখানে। তাই তিনি চাইলেন হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুও যেন মক্কাকেই কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ইরাকবাসীর পক্ষ থেকে বারবার চিঠি প্রেরণ এবং তাতে শতভাগ সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে তিনি বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবলেন। কারণ, প্রথমত তার কাছে আন্দোলনে জনসাধারণের জীবন ও তাদের সম্পদ রক্ষা করাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিকে হিজাজের অধিবাসীদের চেয়ে ইরাকের লোকজনের শক্তি-সামর্থ্য ছিল অনেক বেশি। তাই তিনি ইরাকে ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা কম অনুভব করে সেখানেই যেতে চাইলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসতেন মক্কার পবিত্র ভূমিকে, যার সম্মানে হজরত উসমান রা. পাহাড়সম দৃঢ়তা ও ধৈর্য নিয়ে জীবন দিয়েছেন। যার কারণে হজরত আলি রা. নবীজির শহর ছেড়েছেন। হজরত হুসাইন রা. বুঝতে পারছিলেন যে, হজের মৌসুম শেষ হওয়ার পরও যদি আমি এখানে থাকি তাহলে আমার ব্যাপারে ইয়াজিদ কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত অবশ্যই নেবে। হয়তো সফল হবে বা হবে না। কিন্তু আমার কারণে এই পবিত্র মাটিতে মুসলমানদের রক্ত ঝরবে! সেজন্যই মক্কায় অবস্থানকালে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তিনি বলেছিলেন, যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয় তাহলে তাতে

আমার কোনো আফসোস নেই। কিন্তু আমি এটা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবো না যে, আমার কারণে মক্কার এই পবিত্র ভূমির সামান্য সম্মান ক্ষুণ্ন হবে।[২১]

এ থেকে বুঝা যায় হজরত হুসাইন রা. নিজের প্রাণহানির আশংকার ব্যাপারে একেবারে বেখবর ছিলেন না, যেই ধোঁকাটা পরবর্তীতে ইরাকের অধিবাসীরা তাকে ওয়াদা মাফিক সাহায্য-সহযোগিত না করার মাধ্যমে দিয়েছিল এবং বনু উমাইয়াদের পক্ষ থেকে কঠোরতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল।[২২] সুতরাং এ কথা বলাই যায় যে, তিনি ইরাকিদের নানান সময়ের নানান রূপ ও রং ধারণের ব্যাপারে একেবারেই অনবগত ছিলেন না। ইরাকবাসীদের উপর তার এমন অন্ধবিশ্বাস ছিল না, সাধারণভাবে মানুষ যেমনটা ধারণা করে। এজন্যই তো তিনি ইরাক যাওয়ার ব্যাপারে কোনো তাড়াহুড়া করেননি। বরং ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করেছিলেন।

---

[২১] আখবারু মাক্কা : ২/২৪২

[২২] এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। একদিন হজরত হাসান রা.-এর বাঁদি একটি চিঠির বাক্স নিয়ে এলো। হজরত হাসান রা. তখন তাকে বললেন, তুমি একটা পাত্রে পানি নিয়ে এসো এবং এই চিঠিগুলো সেখানে ফেলে দাও। অথচ সেখানে কী আছে সেটা খুলেও তিনি দেখেননি। তখন সেখানে উপস্থিত ছিল ইয়াজিদ ইবনে আহমার। সে হজরত হাসান রা. কে জিজ্ঞাস করল, আচ্ছা! এগুলো কার চিঠি? তিনি বললেন, ইরাকবাসীদের।... (আল মু'জামুল কাবির : ৩/৭০) মোটকথা উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইরাকবাসীরা যেন কোনোভাবে হজরত হুসাইন রা. কে ধোঁকা দিতে না পারে। বিষয়টি স্পষ্ট যে, হজরত হাসান রা.-এর আশংকা ও ভয়ের ব্যাপারটা হজরত হুসাইন রা.-এর কাছে গোপন ছিল না। এতসবের পরও যখন আমরা হজরত হুসাইন রা. কে ইরাকের উদ্দেশ্যে সপরিবারে রওনা করতে দেখি তখন আমরা যেন এটা না ভাবি যে, তিনি হয়তো অনভিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। কারণ তিনি অবশ্যই সেখানে নিজের কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন। আমাদের মতে হজরত হুসাইন রা. ইরাকিদের মাধ্যমে রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছার সাথে সাথে এই সম্ভাবনার কথা একেবারেই ভুলে যাননি যে, এই ইরাকবাসীরা জোশে হুঁশ না থাকলেও প্রয়োজনের সময় ঠিকই পিছিয়ে পড়ে। তা ছাড়া তিনি এটাও মনে করছিলেন যে, আন্দোলন শুরু করার পূর্বেই ইয়াজিদের হুকুমত আগ্রাসী মনোভাবের কারণে ব্যতিক্রম কিছুও করে ফেলতে পারে। এবং এরই মধ্যে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিতও হয়ে যেতে পারে। তখন এই আন্দোলনের পরিণতিতে যে শাসকদের রোষানলে পড়তে হবে বা গভর্নরদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়ে যেতে হবে শুধু এটাই নয়, তখন বিদ্রোহের বিধানও এসে যাবে। আগত প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত হুসাইন রা. সেই পরিস্থিতিতে কী করতে হবে বা কী পদক্ষেপ নিতে হবে সেটাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন। বিস্তারিত সামনে আসবে।

বড়দের অধিকাংশই কেন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াতে সন্তুষ্ট ছিলেন?

ইতিমধ্যে ইয়াজিদ তার শাসনক্ষমতা আরো পোক্ত করে বসল। স্থানে স্থানে জারি করে দিলো বাইয়াত গ্রহণের আদেশ। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রায় সব অঞ্চলের লোকেরাই গভর্নরদের হাতে বাইয়াত হতে থাকল।[২৩]

এখন প্রশ্ন হলো, যদি ইয়াজিদের খেলাফত খোলাফায়ে রাশেদিনের আদলে না হয়ে থাকে অথবা তার নেতৃত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তখনকার প্রবীণ সাহাবি ও তাবেয়িগণ কেন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন?

আসলে বাস্তব বিষয়টা হলো, অনেকে তো পূর্ব থেকেই হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতাদর্শ ও চিন্তাধারার সাথে একমত ছিলেন। তাই সে হিসেবেই তারা ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। আর কেউ কেউ শরিয়তের অন্যান্য দিক বিবেচনা করে বাইয়াত গ্রহণ করাকেই উত্তম মনে করেছিলেন। কারণ তাতে বিচ্ছিন্নতা ও বৈপরীত্য দূর হয়ে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকবে, যে আদেশ কুরআন ও হাদিসে বহুবার এসেছে। দীনের সেই গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও আদর্শ পালনের জন্য অনেকে মন্দ ও নিম্নস্তরের কাজ করাকেই ভালো মনে করেছেন। তাই তারা ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন।

হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমানের এক বর্ণনায় আছে, ইয়াজিদ খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণের সময় একজন সাহাবির কাছে গেলে তিনি বলেছিলেন, সবাই বলছে, ইয়াজিদ উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে কোনো ভালো লোক নয়। জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদায় সবার শীর্ষে নয়। আমিও এমনই বলি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও মতানৈক্য সৃষ্টি করা থেকে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি।[২৪]

তা ছাড়া বড়দের বাইয়াত গ্রহণের আরো একটি কারণ এটাও ছিল যে, খেলাফত গ্রহণের সময়কালে ইয়াজিদের ব্যাপারে তেমন বড় কোনো

---

[২৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৭
[২৪] তারিখে খলিফা : ২১৭

সমস্যা ছিল না, যেমনটা হয়েছিল পরবর্তীতে। কারণ তখনো কারবালা, হাররার মতো দুঃখজনক ঘটনাগুলো প্রকাশ পায়নি। অধিকন্তু সিংহাসনে আরোহণের পরও সে তো ছিল একজন সাহাবির সন্তান, এক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের উত্তরাধিকারী। তাই একারণেও অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি শুরুর দিকে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে উমর ইয়াজিদের বাইয়াতের ব্যাপারে কী বলেছিলেন?

ইয়াজিদের প্রতিনিধি যখন বাইয়াত গ্রহণের জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মক্কায় পৌঁছল তখন তিনি উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহর কসম, মুয়াবিয়া রা. তার পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো ছিলেন না। কিন্তু তার পরেও তার মতো অন্য কোনো খলিফা আসবে না। নিঃসন্দেহে ইয়াজিদ তার বংশধর। সুতরাং এখন তোমরা সবাই যার যার স্থানে আরাম করে বসে থাকো এবং ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করে তার আনুগত্য স্বীকার করো।[২৫] এরপর তিনি নিজেও বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

আর হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ছিল—যদি সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করে তাহলে আমিও বাইয়াত গ্রহণ করব।[২৬] এজন্য তিনি যখন দেখলেন, প্রায় সকলে বাইয়াত হয়ে গেছে তখন তিনিও ইয়াজিদের বিরোধিতার বদলে বাইয়াত হয়ে যান।[২৭] কারণ তাতে উম্মতের মধ্যে রক্তপাত ও অনিষ্টের আশংকা কম ছিল। তবে একথা প্রকাশ্য যে, এই বাইয়াত খুশি ও আগ্রহের সাথে ছিল না। এজন্যই তিনি বাইয়াত গ্রহণের সময় বলেছিলেন, যদি এতে কল্যাণ থাকে তাহলে আমি সন্তুষ্ট আর যদি অকল্যাণ ও মুসিবত থাকে তাহলে ধৈর্যধারণ করব।[২৮]

---

[২৫] আনসাবুল আশরাফ : ৫/২৯০

[২৬] আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ১৬৮০৯; আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩০১

[২৭] আসসুনানুল কুবরা : ১৬৬৩২

[২৮] তারিখে খলিফা : ২১৭ বিশুদ্ধ সনদে।

ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কি কোনো নম্রতা বা ছাড় প্রকাশ পাচ্ছিল?

কারো কারো মতে ইয়াজিদ পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজরত হুসাইন রা. ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে শতভাগ ছাড় দিয়েছে এবং তাদের সম্মান রক্ষা ও নম্রতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। এজন্যই খেলাফতের পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সে তাদের বিদ্রোহের স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিছু বলেনি।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই মন্তব্যটা বাতুলতা ও ইয়াজিদের অসার প্রশংসা ছাড়া কিছুই না। আসলে ইয়াজিদের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কিছু করতে পারছিল না। কারণ, প্রথমত হজরত হুসাইন রা. যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন ততক্ষণ ইয়াজিদের ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা পায়নি। এজন্যই সে জাজিরাতুল আরবের মাটিতে তাদেরকে কিছু করার সাহস পাচ্ছিল না এবং একারণেই দামেশকের নেতৃবৃন্দও তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। দ্বিতীয়ত, যখন হজরত হুসাইন রা. ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মক্কায় গেলেন তখন হজের মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই হজের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের মোকাবেলা করার সাহস হয়নি। কিন্তু যখনই হজের সময় শেষ হয়ে এলো এবং ইয়াজিদও এতোদিনে শাসনব্যবস্থা কিছুটা গুছিয়ে নিলো তখনই ৬১ হিজরিতে ইয়াজিদের গভর্নর উমর ইবনে সাঈদ প্রায় দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কায় আক্রমণ করে বসল। তবে এটা আলাদা বিষয় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মক্কাবাসীদের নিয়ে সেসব সৈন্যকে পরাস্ত করে পিছু ধাওয়া করেছিলেন।[২৯] যদি হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতিকে ছাড় দেওয়াই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে পবিত্র মক্কায় এই সেনাদল পাঠানোর কী প্রয়োজন ছিল? যদি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতির সাথে নম্রতা ও সম্মানপ্রদর্শনই ইচ্ছা হতো, তাহলে তা শুধু এই চার-পাঁচ মাস মক্কা ও আরব উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ থাকতো না। বরং কুফার সীমান্ত এলাকা এবং কারবালার প্রান্তরেও তা প্রদর্শন করতো। কিন্তু করেনি। উলটো জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণের দাবি তুলে তাদেরকে নিজেদের বাড়িঘর এবং নবীজির মদিনা ছাড়তে বাধ্য করেছে।

---

[২৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৩; আল-কামিল ফিততারিখ : ৩/১৩২; এ ছাড়াও এই হামলার আলোচনা সহিহ বুখারির ১০৪ পৃষ্ঠা কিতাবুল ইলমেও বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর নামে ইয়াজিদের চিঠি

হজরত হুসাইন রা. তখনো মক্কায় ছিলেন। এরই মধ্যে ইয়াজিদ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করে, যার ভাষ্য থেকে একথা স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল যে, ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সকল অবস্থা সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে তার স্পষ্ট সতর্কবাণী ঝলকে উঠেছে। চিঠিতে ইয়াজিদ লিখেছিল, 'পূর্বাঞ্চলের লোকজন এসে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খেলাফতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আর আপনার তো তাদের বৃত্তান্ত জানা আছে এবং তাদের পূর্ব আচরণের অভিজ্ঞতা আছে। এখন হুসাইন রা. যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তো তিনি আমাদের দৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে চলেছেন। আপনি আপনার গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও সর্বমান্য; তাই আপনি তাকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত রাখুন।'

ইয়াজিদের এই চিঠির জবাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. লিখেছিলেন, আমি আশাকরি হুসাইনের গমন তোমার ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে হবে না। যা দ্বারা সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনা প্রশমিত হয় এমন প্রতিটি বিষয়ে আমি তাকে উপদেশ না দিয়ে ছাড়ব না।[৩০]

---

[৩০] তারিখে দিমাশক : ১৪/২১০; এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হজরত হুসাইন রা.-এর আন্দোলন শুরু থেকে শান্ত ও নীরবই ছিল। আসলে তিনি চাচ্ছিলেন কোনো ঝামেলায় না জড়িয়ে সাধারণ জনগণের মাধ্যমে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. একথাই লিখেছেন- হুসাইন রা. যুদ্ধের ইচ্ছায় বের হননি; বরং তিনি ধারণা করেছিলেন মানুষ তার আনুগত্য প্রদর্শন করবে। -মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৪২;
হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উদ্দেশ্যও এমনটাই ছিল যে. হজরত হুসাইন রা.-এর উদ্দেশ্য যুদ্ধ বা ফেতনা সৃষ্টি করা নয়। এ থেকে এটা বুঝা যায়- হজরত হুসাইন রা-এর আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং তার সাথে এ নিয়ে হজরত হুসাইন রা. পরামর্শও করেছিলেন। এজন্যই হজরত হুসাইন রা.-এর ব্যাপারে তিনি শতভাগ আশ্বস্ত ছিলেন। সেই সাথে চাচ্ছিলেন ইয়াজিদও যেন শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারে। অন্যান্য বর্ণনা থেকেও জানা যায়, হজরত ইবনে আব্বাস রা. হজরত হুসাইন রা.-এর পরিণতির ব্যাপারেও ছিলেন সতর্ক। কারণ কুফার শাসকবর্গের গতি-প্রকৃতি ও মেজাজ দেখে তিনি ঠাওরে উঠছিলেন যে, বিষয়টা সফলতার মুখ নাও দেখতে পারে। তা ছাড়া যদি কুফার অধিবাসীরা দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে এবং শাসকবর্গের উপর ক্ষেপে যায় তাহলে হজরত হুসাইন রা.-এর বেঁচে থাকা আরো অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। এজন্য অন্যান্য সাহাবির মতো তাকেও ইরাক যেতে বারণ করেছিলেন।

মোটকথা, দামেশকে এক অস্থির ও সন্ত্রস্ত ভাব বিরাজ করছিল এবং হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কুফাবাসীর সখ্য দেখে ইয়াজিদ ভীত হয়ে পড়েছিল। কোথাও আবার বড় রকমের বিদ্রোহ করে না বসে! অপরদিকে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই বিশ্বাস ছিল যে, ইয়াজিদ ও তার নেতৃবর্গ এই আন্দোলনের আগ-পিছ কিছু না ভেবে বিদ্রোহী মনে করে হত্যা করে ফেলবে। এজন্য তখন ইয়াজিদের সাথে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করাটাকে তিনি উপযুক্ত মনে করেননি। বরং ইরাক গিয়ে নিজের সাথিদের নিয়ে এই অবস্থার অবসান করাটাই ভালো মনে করলেন।

ইরাকের চিঠি

কুফাবাসীদের থেকে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বারবার চিঠি প্রেরণ এবং লাগাতার প্রতিনিধিদলের আগমন এটাই স্পষ্ট করছিল যে, পুরো ইরাক এখন ইয়াজিদের আয়ত্তের বাইরে। শুধু কুফাতেই হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগিতার জন্য এক লাখ সশস্ত্র সৈন্য তৈরি রয়েছে।[৩১] এবং এরা এখন সেখানকার গভর্নর নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে জুমআর নামাজ আদায় করাও বন্ধ করে দিয়েছে। মোটকথা, সেখানকার সকলেই হজরত হুসাইন রা. কেই চাচ্ছেন। তিনি ছাড়া কারো উপর তেমন ভরসাও করতে পারছে না তারা। [৩২]

পরিস্থিতি এতটাই অশান্ত ছিল যে, যদি দ্রুত ইরাক সফর না করেন তাহলে যখন-তখন সেখানে হত্যা ও নির্বিচারে নিধন শুরু হয়ে যেতে পারে। কেননা, সেখানকার সাহসী এবং ক্ষিপ্র অভিরুচির লোকেরা যেকোনো সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে।

এই চিঠি থেকে আরো একটি বিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং হজরত হুসাইন রা. ইরাকের জনগণের শক্তি সাথে নেওয়ার পূর্বে শাসকবর্গের কাছে এই আন্দোলনের বিন্যস্ততা প্রকাশ করা রাজনৈতিক কল্যাণ পরিপন্থি ভাবছিলেন। এজন্যই চিঠিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. একটি অস্পষ্টতা রেখেছেন। কোথাও বলেননি যে, হজরত হুসাইন রা. আসলে কী করতে চাচ্ছেন, যাতে ইয়াজিদ শান্ত থাকে এবং ক্ষিপ্রতার সাথে ধ্বংসাত্মক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়।

[৩১] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯১ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত

[৩২] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৭ বিশুদ্ধে সনদে বণিত

হজরত হুসাইন রা. স্বীয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন। আর সবদিক বিবেচনা করে বুঝতে পারছিলেন যে, এই স্বল্পবুদ্ধির মানুষগুলোকে নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মায়া ও মহব্বত দিয়ে তাদেরকে তরবিয়ত করার চেষ্টা করাই বেশি কল্যাণকর। এখন অনেকেই অস্থির হয়ে তাকে ডাকছে এবং তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ এমনও ছিলেন না, যিনি তাদের মাথায় হাত রেখে সঠিক কোনো দিকনির্দেশনা দেবেন। এখন যদি তাদেরকে নিজেদের অবস্থার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে অযথাই খুনখারাবি ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। তাই যদি একজন নেতার কারণে জনসাধারণের মাঝে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং সামান্য ক্ষতি দিয়ে অনেক বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায় ও উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যায় তাহলে তা কল্যাণকরই হবে। এজন্যই হজরত হুসাইন রা. শতসমস্যা ও ক্ষতির আশংকা থাকা সত্ত্বেও ইরাকে যাওয়া জরুরি মনে করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন হয়তো লোকেরা সেখানে তাকে সানন্দ ও সাগ্রহেই গ্রহণ করবে। তা ছাড়া হিজাজের অধিবাসীরাও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বের সুবাদে তাকে সহযোগিতা করবে। এতে এমন বিশাল জনসংখ্যা ও শক্তি দেখে শামের অধিবাসীরা এমনিতেই নতি স্বীকার করবে। আর যদি নাও করে তবু খুব বেশি রক্তপাতের প্রয়োজন হবে না। ইরাক এবং হিজাজের সম্মিলিত শক্তির সামনে অল্পতেই তারা হার মানতে বাধ্য হবে। ফলে খুব সহজেই একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬০ হিজরির কুফা

৬০ হিজরিতে যখন হজরত হুসাইন রা. কুফায় যাওয়ার চিন্তা করছিলেন তখনও শিয়ারা তাদের পূর্ব অবস্থাতেই বহাল ছিল। রাফেজিদেরকে আলাদা করে চেনা যায়, তেমন তাদের পরিচয় বা চর্চা কোনোটাই ছিল না। হজরত হুসাইন রা. যাদের আহ্বানে সেখানে যেতে চাচ্ছিলেন তারা অধিকাংশই সহিহ আকিদাই পোষণ করতো এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বড় বুজুর্গ ও নামকরা ব্যক্তি। সাধারণ জনগণ থেকে তারা চিন্তায় শুধু এতটুকু ব্যতিক্রম ছিলেন যে, হজরত আলি রা. কে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য দিতেন। তা ছাড়া তারা সিদ্ধান্তেও ছিলেন বেশ মজবুত। অযথাই কোনো রক্তপাতের পক্ষে তারা ছিলেন না।

কুচক্রী মহলের চক্রান্ত কী ছিল?

কুচক্রী মহল একথা ভালো করেই জানতো যে, হজরত হুসাইন রা. কুফায় আসবেন শুধু জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে। অপরদিকে তাদের এটাও জানা ছিল যে, ইয়াজিদ এবং তার প্রশাসক মহলে হজরত হুসাইন রা. একজন বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবেই পরিচিত। তৃতীয়ত, তাদের কাছে এটাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিল যে, কুফার অধিবাসীগণ যদিও বনু হাশিমের ব্যাপারে ভয়াবহমাত্রায় দুর্বল; কিন্তু বিপদের সময় তারা পিছপা হতে সামান্যও দ্বিধা করে না। এজন্য সবদিক বিবেচনা করে তারা কাজ ঠিক করল। প্রথমত, হজরত হুসাইন রা. কে কোনোভাবে কুফায় রওনা করাতে হবে। দ্বিতীয়ত, তার এসে পড়ার আগেই কুফায় কিছু আপত্তিকর ঘটনা ঘটাতে হবে। যাতে ইয়াজিদ ও তার প্রশাসকবর্গের এই ধারণা জন্মায় যে, হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যই এসব হচ্ছে। ফলে তারা এসবের সত্যতা যাচাই না করে অবশ্যই দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে এবং হজরত হুসাইন রা. কে শহিদ করে দেবে। এই কুচক্রী মহলের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠিন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে কুফার অধিবাসীরা নিজেদের অবস্থান থেকে এমনিতেই ফিরে আসবে এবং একেবারেই চুপসে যাবে।

তবে একথা সত্য যে, আমাদের কাছে এই কুচক্রী মহলের ধারাবাহিক কার্যসম্পাদনের কোনো প্রমাণ নেই যে, অমুক এই ধরনের কাজ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে ধারাবাহিক আপত্তিকর ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। বরং এর পেছনপর্দায় এমন কিছু হাত অবশ্যই কাজ করেছে, যারা সমাজ ও সমাজের মানুষদের এক ভয়ংকর অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছিল এবং নিঃসন্দেহে তারা কুফার অধিবাসীই ছিল। একারণেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও কারবালার দুঃখজনক ঘটনার জন্য কুফাবাসীকেই অভিযুক্ত করেছেন। যদিও এই কুচক্রীমহলের কারো নাম আমরা নিশ্চিতভাবে লিখতে পারছি না; কিন্তু এতটুকু ধারণা করা যায় যে, এটা তাদের মধ্য থেকেই কারো কাজ, যারা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বারবার পত্র প্রেরণ করছিল। অবশ্য চিঠি প্রেরকদের অনেকেই নেক স্বভাবের ছিলেন এবং

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিও খুব দুর্বল ছিলেন; তারা তো অবশ্যই নয়। কিন্তু চক্রান্তকারীরা তাদের সাথেই ছিল।[৩৩]

হুসাইন রা. এর প্রতি ইবনে যুবাইর রা. এর পরামর্শ

হিজাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কুফার পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কে ভালো করেই অবগত ছিলেন। এজন্য হজরত হুসাইন রা. যখন হিজাজ ছেড়ে কুফায় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন সকলেই তাকে কুফায় না গিয়ে হিজাজে থাকার পরামর্শই দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সেই হিতাকাঙ্ক্ষীদেরই একজন। তিনি যখন একথা জানতে পারলেন, তখন হজরত হুসাইন রা. কে বললেন, আপনি কি তাদের কাছে যাবেন, যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, যারা আপনার ভাইকে ত্যাগ করেছে?

হজরত হুসাইন রা. তখন উত্তরে বললেন, যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয় তাহলে তাতে আমার কোনো আফসোস নেই। কিন্তু আমি এটা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারব না যে, আমার কারণে হিজাজের এই পবিত্র ভূমির সামান্যও সম্মান ক্ষুণ্ন হবে।[৩৪]

এই বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয় :

প্রথমত, হজরত হুসাইন রা. নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিজাজের মাটি থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারছিলেন না।

দ্বিতীয়ত, তার আশংকা হয়েছিল যে, নিশ্চয় ইয়াজিদ তার ব্যাপারে ভয়ংকর কোনো সিদ্ধান্ত নেবে এবং তাকে তার অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য করবে। এমনকি প্রয়োজনে হত্যাও করে ফেলতে পারে। এই ভয় যদিও অন্য কোথাও চলে গেলেও ছিল; কিন্তু তিনি এটা মেনে নিতে পারছিলেন না যে, হারাম শরিফ তার কারণে রক্তরঞ্জিত হবে।

---

[৩৩] এখানে একটা বিষয় বুঝার আছে, হজরত হুসাইন রা. কে কুফায় যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি ও হত্যার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন শুধু আবু মিখনাফ এবং হিশাম কালবি। তারা এমন কিছু ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছেন যাদের ব্যাপারটা সংশয়পূর্ণ। এখানে এটাও সম্ভাবনা আছে যে, পরবর্তীতে হয়তো সেই নামগুলো যোগ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

[৩৪] আখবারু মাক্কা : ২/২৪২ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এজন্যই তাকে হিজাজ ছেড়ে যেতে বারবার বারণ করেছেন। এর ব্যতিক্রম যেসব বর্ণনা রয়েছে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাকে উসকে দিয়েছিলেন এবং কুফায় যেতে প্ররোচিত করেছিলেন, যাতে হিজাজ তার হাতছাড়া না হয় এবং তিনি নিজেই যেন শাসক হতে পারেন, এগুলো ভয়ানক রকম দুর্বল বর্ণনা। কারণ এর বিপরীতে অনেক মজবুত বর্ণনাকারীর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং সেই দুর্বল বর্ণনাগুলো গ্রহণের কোনো উপযুক্ততা নেই।

মুসলিম ইবনে আকিলের কুফায় রওনা

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যখন কুফা থেকে বারবার প্রতিনিধি দল ও চিঠি আসতে লাগল তখন তিনি ভাবলেন, হয়তো কুফাতে গিয়ে ভালো কিছু করা সম্ভব। তাই তিনি নিজে সেখানে যাওয়ার পূর্বে তার চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকিল ইবনে আবু তালেবকে প্রকৃত অবস্থা যাচাই এবং ইরাকবাসীর ঐক্যবদ্ধতা পর্যবেক্ষণের জন্য ইরাকে পাঠান। যেন সে নিজ চোখে তাদের আসল অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারে।[৩৫]

মুসলিম ইবনে আকিলের সাথে নুমান ইবনে বাশিরের সাক্ষাৎ

মুসলিম ইবনে আকিল যখন কুফায় পৌঁছলেন তখন তিনি হজরত হানি বিন উরওয়া নামক এক খাঁটি মুসলিমের ঘরে অবস্থান নিলেন। কুফাবাসী যখন তার আগমনের সংবাদ শুনতে পেলো তখন তার কাছে এসে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসন কর্তৃত্বের অনুকূলে বাইয়াত গ্রহণ করল।[৩৬] তৎকালীন সময়ে কুফার গভর্নর ছিলেন নুমান ইবনে বাশির রা.। তিনি একজন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সাহাবি ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং একশো চৌদ্দটি হাদিসের বর্ণনাকারী ও সুবক্তা ছিলেন।[৩৭] মুসলিম ইবনে আকিলের আগমন এবং তার উদ্দেশ্য জানা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন এবং এদিকে কোনো

---

[৩৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯১ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত।

[৩৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯১ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

[৩৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪১১-৪১২

ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এরপর কোনো কোনো উত্তপ্ত মেজাজের কর্মকর্তা যখন নুমান ইবনে বাশির রা. কে এসব বিষয় অবগত করল এবং তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যা দিলো তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের গণ্ডির ভেতরে থেকে দুর্বল গণ্য হওয়া আমার কাছে তার নাফরমানি থেকে শক্তিধর ও পরাক্রমশালী হওয়ার চেয়ে প্রিয়।[৩৮] আরেক বর্ণনা অনুযায়ী হজরত নুমান বিন বাশির রা. থেকে মুসলিম ইবনে আকিলের ব্যাপারে এমন কথাও পাওয়া যায় যে, মিথ্যা অপবাদ বা কুধারণার কারণে আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করব না। কিন্তু আল্লাহর শপথ, যদি তোমরা তোমাদের আমিরকে বর্জন করো এবং তার বাইয়াত প্রত্যাহার করো তাহলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই করে যাবো যতক্ষণ আমার হাতে আমার তরবারি থাকবে।[৩৯]

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হজরত নুমান ইবনে বাশির রা. হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর তৎপরতা ও আন্দোলনকে ফেতনা ও বিদ্রোহ মনে করছিলেন না।[৪০] তা ছাড়া একজন গভর্নর হিসেবে তার কাছে কিছুই

---

[৩৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৮

[৩৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৮

[৪০] জেনে রাখা ভালো যে, আবু মাখরামার মতে হজরত হুসাইন রা. মুসলিম ইবনে আকিলকে দিয়ে কুফার গভর্নরদের কাছে সর্বশেষ যেই চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার বক্তব্য ছিলো এমন-"এই চিঠি হুসাইন ইবনে আলির পক্ষ থেকে সকল মুসলমান এবং ঈমানদারদেরকে। হানি এবং সাইদ, আপনাদের চিঠি আমার কাছে নিয়ে এসেছে। আপনাদের সাথি-সঙ্গীদের মধ্যে তারাই সর্বশেষ আমাকে এসে সেসব কথা জানিয়েছে যেমনটা আপনারা লিখেছেন যে, আমাদেরকে দিকনির্দেশানা দেওয়ার মতো এখানে তেমন কেউ-ই নেই। এখন আপনি যদি আসেন তাহলে হয়তো আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হক এবং হেদায়েতের উপর এক করে দেবেন। সেমতে আমি আমার চাচাতো ভাইকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছি। সে আমাদের পরিবারভুক্ত এবং আমার খুব বিশ্বস্ত। যাওয়ার সময় আমি তাকে একথাও বলে দিয়েছি যে, আপনাদের সকলের বর্তমান অবস্থা এবং মতামত লিখে আমার কাছে পাঠাবে। যদি তার চিঠি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আপনাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান, সেই সাথে জনসাধারণও, সেই কামানাই করছেন যেমনটা আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন। তাহলে আমি খুব দ্রুতই ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। আসলে এমন দলের নেতৃত্ব দেওয়াই সাজে, যারা কুরআনের বিধানের উপর আমল করে। সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং হক ও সত্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে চায়। ওয়াসসালাম-" তারিখে তাবারি : ৫/৩৫৩

হজরত হুসাইন রা.-এর লিখিত সর্বশেষ এই চিঠিতেও যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে সামান্য কোনো ইঙ্গিতও ছিলো না। এই চিঠি থেকে সর্বোচ্চ এতটুকু জানা যাচ্ছে যে, তিনি শুধু কুফাবাসীদেরকে নিজের সহযোগী হিসেবে পেতে চাচ্ছিলেন।

গোপন থাকার কথা নয়। যদি প্রকৃতপক্ষেই তারা কোনো বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতেন তাহলে সে কথাও তিনি জানতে পারতেন এবং এর বিরুদ্ধে অবশ্যই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

ইবনে আকিলের সন্তোষজনক পত্র প্রেরণ এবং হুসাইন রা. এর সফরের দৃঢ় সংকল্প

মুসলিম ইবনে আকিল কুফার পরিস্থিতি সন্তোষজনক দেখে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি লিখলেন-বারো হাজার মানুষ বাইয়াত হয়ে গেছে; সুতরাং আপনি চলে আসুন।[৪১] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি পত্রে লিখেছিলেন- কুফাবাসীদের সকলেই আপনার অনুকূলে আছে। তাই আপনি আমার এই পত্র পাওয়ামাত্র রওনা হয়ে যান।[৪২] এই চিঠি ১১ যিলকদ ৬০ হিজরিতে প্রেরণ করা হয়েছিল।[৪৩]

কুফায় অবস্থার পরিবর্তন এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নিয়োগ

মুসলিম ইবনে আকিলের চিঠি পৌঁছতে প্রায় তিন-চার সপ্তাহ লেগে যায় এবং এর মধ্যে কুফার অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে যায়, যেসব ব্যাপারে হজরত হুসাইন রা. কিছুই জানতে পারেননি। যেমন, কুফার কঠোরতাপ্রিয় কিছু সেনাপতি মুসলিম ইবনে আকিলের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনের কারণে গভর্নর নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অসন্তুষ্ট হলো। প্রথমে তাকে কিছু বকাঝকা করল। কিন্তু যখন তারা দেখল এতেও সে নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে না তখন ইয়াজিদকে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে এই সংবাদ লিখে পাঠাল। ইয়াজিদ এই সংবাদ পেয়ে দূত পাঠাল এবং হজরত নুমান ইবনে বাশির রা. কে কুফার প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণ করল এবং বসরার পাশাপাশি কুফাকেও উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের শাসন-কর্তৃত্বের অধীন করে দিলো। সেইসাথে ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদকে পত্রযোগে নির্দেশ দিলো, তুমি কুফায় গিয়ে

---

[৪১] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৮
[৪২] আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৬৭
[৪৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮১; ৫/৩৯৫

মুসলিম বিন আকিলকে তলব করবে। এরপর তাকে যদি আয়ত্তে পাও তাহলে হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে।[৪৪]

এভাবে ইরাকের সকল কার্যক্রম এমন এক ব্যক্তির অধীনে এসে গেলো, যে ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতরো কোনো ঘটনার জন্ম দিতে সামান্য কুণ্ঠাবোধ করতো না। উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এই আদেশ পাওয়ার সাথে সাথেই বসরা থেকে সোজা কুফায় চলে গেলো। মুসলিম বিন আকিল তখন শহরের একজন সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট আমির হানি বিন উরওয়ার ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবদুল্লাহ বিন জিয়াদ এই সংবাদ পেয়ে গেলো। এরপর সে হানিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। ফলে ইবনে জিয়াদ হানির মুখমণ্ডলে বর্শাঘাত করে তার ভ্রুর উপর ক্ষতের সৃষ্টি করল এবং নাক ভেঙে দিলো। তারপর হানিকে দুর্গেই বন্দি করে রাখল। [৪৫]

মুসলিম বিন আকিলের হত্যা

এইখানটায় এসে মুসলিম বিন আকিলের একটু পদস্খলন ঘটে গেছে, যার কারণে পূর্ণ ঘটনার মোড় পালটে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়ে গেলো। তিনি মেজবান হানি বিন উরওয়াকে ইবনে জিয়াদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য চার হাজারের এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে ময়দানে চলে এলেন।[৪৬]

যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে ইবনে জিয়াদের প্রাসাদের কাছাকাছি গেলেন তখন ইবনে জিয়াদ ভয়ে প্রাসাদে দ্রুত প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। এরপর কুফাবাসীরা নিজেদের সেই পুরাতন অভ্যাসটাই পুনরায় প্রকাশ করল। মুসলিম বিন আকিল তখনো সামনে বাড়ছিলেন কিন্তু সৈন্যরা মুসলিম বিন আকিলকে অসহায় অবস্থায় রেখে একে একে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে গেলো। অবশেষে তার সাথে রইলো মাত্র ৫০

---

[৪৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৮ এই বর্ণনাতেই রয়েছে, ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদকে গভর্নর বানিয়েছিল মূলত ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মাওলা সারজুনের ইশারায়। সে ছিল একজন খ্রিষ্টান এবং ইয়াজিদের পরামর্শ দাতা। এথেকে সামান্য একটু ধারণা নেওয়া যায় যে, আসলে একটা সফল আন্দোলনকে পূর্ণমাত্রায় ব্যর্থ করতে পেছনপর্দায় কত শক্তিশালী হাত কাজ করেছে।

[৪৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯১

[৪৬] তারিখুত তাবারি; ৫/৩৯১

জনের মতো।[৪৭] কিন্তু এরাও ধীরে ধীরে চালাকি করে সটকে পড়ল। ফলে তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন। এসময় তাকে গ্রেফতার করার জন্য ইবনে জিয়াদ সিপাহি পাঠাল। তিনি একাকী তাদের সাথে লড়লেন এবং আহত হয়ে সেখান থেকে কেটে পড়লেন। আর রাতের অন্ধকারে একাকী বনি হাশেমের এই সন্তান ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে থাকলেন। তখন অবস্থাটা ছিল এই যে, তার সাথে না থাকল পথ দেখানোর কেউ, কিংবা অন্তরঙ্গতা দান করার মতো কেউ, না স্বগৃহে আশ্রয় দেওয়ার মতো কেউ। অবশেষে তাওয়া নামক এক নারী তাকে পানি পান করালেন এবং উনিই মুসলিম ইবনে আকিল জানতে পেরে তাকে ঘরে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু তাওয়ার ছেলে আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আশআসের কাছে গিয়ে এই সংবাদ জানিয়ে দিলো। এরপর মুসলিম ইবনে আকিলকে সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হলো এবং ইবনে জিয়াদ তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহিদ করে প্রাসাদের ছাদ থেকে নিচে নিক্ষেপ করল। সেইসাথে হানি বিন উরওয়াকেও হত্যা করল।[৪৮]

কুফা যাওয়া থেকে সাহাবিগণের বারণ

হজরত হুসাইন রা. কুফায় যাওয়ার পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন এবং সপরিবারে জিলহজ মাসের প্রথম দিকে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু তার কাছে তখন কুফার কোনো সংবাদই ছিল না।[৪৯]

যখন তিনি মক্কা থেকে বের হওয়ার জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অনুমতি চাইলেন তখন তিনি বললেন, 'তোমার পিতাকে যারা হত্যা করেছে, তুমি কি তাদের কাছে যাবে? যারা তোমার ভাইকে অন্যায় অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে সেই গোষ্ঠীর কাছে যাবে? যদি আমার ও তোমার জন্য অবজ্ঞাজনক না হতো তাহলে আমি

---

[৪৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯১ আল-মিহান : ১৫১ আল-ইকদুল ফারিদ : ৫/১২৭-১২৮

[৪৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২

[৪৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮১ আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৬০ প্রসিদ্ধ উক্তিমতে হজরত হুসাইন রা. ৬০ হিজরি যিলহজ মাসের ৮ তারিখে মক্কা থেকে রওনা হন। এ দিনেই মুসলিম ইবনে আকিল শহিদ হয়েছিলেন। আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৬০ তারিখে দিমাশক : ১৪/২১২

আমার হাত দিয়ে তোমার মাথা জাপটে ধরতাম এবং যেতে দিতাম না।"

এরপর হজরত হুসাইন তাকে সে-কথাই বললেন, যা বলেছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে– যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয় তাহলে তাতে আমার কোনো আফসোস বা আপত্তি নেই; কিন্তু আমি এটা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারব না যে, আমাকে মক্কায় হত্যা করা হবে এবং আমার কারণে মক্কার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে।[৫০]

এরপর হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হজরত আবু সাঈদ খুদরি এবং হজরত আবু ওয়াকিদ লাইসি-সহ অনেকেই হজরত হুসাইন রা. কে মক্কা ছেড়ে যেতে বারণ করেছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও নিষেধ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি বলতেন, হুসাইন মক্কা থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনো কথা কানেই তোলেনি। আমার সত্তার শপথ, তিনি নিজের বাবাকে হত্যা করা, ভাইকে অন্যায় অভিযোগে অভিযুক্ত করা এবং তার সাথে ওয়াদা ভঙ্গের বর্ণিল চিত্র দেখেও নিবৃত্ত হলেন না। এতো কিছুর পরে তো জীবনভর আর কোনো নড়াচড়া না করে সবাই যেখানে শামিল হয়েছে, সেখানেই নাম লেখানো ভালো ছিল। কারণ, ঐক্যেই কল্যাণ রয়েছে।[৫১]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আস রা. বলতেন, হুসাইন তার ভাগ্যবিধানকে ত্বরান্বিত করেছেন। আল্লাহর শপথ, যদি আমি তার নাগাল পেতাম তাহলে আমাকে পরাজিত না করা পর্যন্ত তাকে বের হতে দিতাম না।[৫২]

শত নিষেধ সত্ত্বেও হজরত হুসাইন রা. থামলেন না

এতো বড় বড় সাহাবি ও ব্যক্তিদের নিষেধ সত্ত্বেও হজরত হুসাইন রা. থামলেন না; কিন্তু কেন? আসলে কি তিনি নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভে পড়েছিলেন? কখনোই নয়। আসল বিষয় তো হলো, তিনি এটা অনেক বেশি উপলব্ধি করছিলেন যে, কুফায় যাওয়া ছাড়া উদ্দেশ্য সাধনের দ্বিতীয়

---

[৫০] মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৫১৩২ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩৭৩৬৪ আল মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/১১৯

[৫১] তারিখে দিমাশক : ৪/২০৮ তাহযিবুল কামাল : ৬/৪১৬

[৫২] তারিখে দিমাশক : ১৪/২০৩ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৯৭

কোনো পথ খোলা নেই। তা ছাড়া হিজাজে বনু উমাইয়াদের দিক থেকে তিনি খুব শংকিত ছিলেন। কারণ তারা সুযোগ পেলেই বাইয়াতের জন্য পীড়াপীড়ি করবে এবং বাইয়াত গ্রহণে আজ-কাল করলে যেকোনো সময় হত্যা করে ফেলবে এবং হিজাজের এই পবিত্র ভূমি রক্তরঞ্জিত হবে। নিঃসন্দেহে অন্যান্য সাহাবির পরামর্শ মেনে ফেতনাময় এই সময়ে তিনি যদি বাইয়াত গ্রহণ করে ঘরে বসে থাকতেন তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তিনি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতেন ঠিকই; কিন্তু আসলে তিনি নিষ্কর্ম ও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি ছিলেন না। তার ইজতিহাদ ও বিবেচনা অনুযায়ী এই পথ অবলম্বন করাই ভালো মনে করছিলেন এবং রাজত্বের এই পৈত্রিক ঠিকাদারির উৎসটা উৎখাত করে ইসলামি ও শুরাভিত্তিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন। এই কারণেই সকলের নিষেধের পরেও তার অন্তর প্রশান্ত ছিল। আসলে তার হৃদয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর শতভাগ সন্তুষ্টি এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা ছাড়া কিছু ছিল না।

চিঠি সাথে নিয়েছিলেন কেন?

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, হজরত হুসাইন রা. কুফায় যাওয়ার সময় সেইসব চিঠিও সাথে নিলেন, যেগুলো তিনি কুফাবাসীদের থেকে পেয়েছিলেন।[৫৩] সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, যদি ঘটনাক্রমে কুফাবাসীরা তাদের ওয়াদার কথা ভুলে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এই চিঠিগুলো দিয়ে অন্তত তাদেরকে তাদের ওয়াদা ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাবে।

প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে হজরত হুসাইন রা. জিলহজ মাসের ৮ তারিখে মক্কা থেকে রওনা হয়েছিলেন; কিন্তু প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, তিনি এর পূর্বেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।[৫৪]

---

[৫৩] তারিখে দিমাশক : ১৪/২০২

[৫৪] এর প্রথম প্রমাণ হলো, আবুল আরব তামিমির বর্ণনামতে গভর্নর আমর ইবনে সাঈদ ৮ যিলহজের একদিন পূর্বে মক্কায় এসে গিয়েছিলেন এবং সেদিনই হজরত হুসাইন রা. মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, পথিমধ্যে হজরত হুসাইন রা. এমন অনেককেই দেখেছিলেন, যারা হজ করার জন্য মক্কায় আসছে। যুবাইর ইবনে কায়েন বা কীন নামক এক ব্যক্তির কথা হুসাইন ইবনে আবদুর রহমানের বর্ণনায় এসেছে, তিনি হজে যাওয়ার পথে হজরত হুসাইন রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২; এমনিভাবে হজরত হুসাইন রা. মক্কা

ইয়াজিদকে হজরত হুসাইন রা. এর রওনা হওয়ার সংবাদ অবগত করা এবং ইবনে জিয়াদকে মারওয়ানের চিঠি প্রেরণ

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর রওনা হওয়ার কথা যখন হিজাজের গভর্নর উমর ইবনে সাঈদ জানতে পারল তখন সে এই সংবাদ আবার রাজধানী দামেশক এবং কুফায় পাঠিয়ে দিলো। সে আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে লিখল, 'হুসাইন তোমাদের দিকে যাচ্ছে।'[৫৫]

এই সংবাদটাই মারওয়ান ইবনে হাকাম আবার ইবনে জিয়াদকেও দিয়েছিল; কিন্তু সেইসাথে খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখার পরামর্শও দিয়েছিল। তবে এটা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত নয়; বরং নিছক পরামর্শ। মারওয়ান লিখেছিল, পর কথা হলো, হজরত হুসাইন রা. তোমার অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। মনে রাখবে, তিনি হলেন হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্র হুসাইন। আর ফাতেমা রা. হলেন আল্লাহর রাসুলের কন্যা। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা লাভকারী কেউই আমাদের কাছে হুসাইনের চেয়ে অধিক প্রিয় না। কাজেই সতর্ক থেকো, নিজের বিরুদ্ধে এমন কিছু উসকে দিয়ো না, যাকে কোনো কিছুই

থেকে দুই মঞ্জিল আগে, যাতে ইরাকে যখন পৌঁছেন তখন প্রসিদ্ধ কবি ফিরাযদাকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইরাক থেকে হজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। হজরত হুসাইন রা. তাকে পেয়ে কুফার অবস্থা জিজ্ঞাস করলে ফিরাযদাক বলল-মানুষের অন্তর আপনার সাথে আছে আর তরবারি বনু উমাইয়াদের সাথে। তারিখে খলিফা : ২৩১;

তৃতীয় প্রমাণ হলো, মক্কা থেকে কারবালা প্রায় ৩০ মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। এখন যদি স্বাভাবিকভাবে ধরা হয় তাহলে যিলহজের ৬ বা ৭ তারিখে সফর শুরু করে ৬ বা ৭ মহররম কারবালায় পৌঁছার কথা। এর পূর্বে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তার সাথে ছিল পূর্ণ পরিবার এবং পরিবারের ছোট ছোট সদস্য। তখন এক্ষেত্রে কারবালায় ঘটা এমন কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দেবে, যেগুলো বিশুদ্ধসনদে বর্ণিত। আর মাত্র দুদিনেও সেগুলো ঘটে যাওয়া অসম্ভব। এইখানটায় এসে মাহমুদ আব্বাসি এবং তার অনুসারীরা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। প্রথমে যুক্তি দিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হজরত হুসাইন রা. মূলত হজের মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর কুফায় রওনা করেছিলেন। এরপর মাহমুদ আব্বাসি মঞ্জিলের দূরত্ব পরিমাপ করে বলেছেন, "হজের পর হজরত হুসাইন রা. রওনা হয়ে ১০ মহররমেই কারবালা পৌঁছেন। সুতরাং কারবালায় যেসব ঘটনা এর পূর্বে ঘটেছে, সেগুলো যেহেতু এত তাড়াতাড়ি ঘটা সম্ভব নয়; তাই সেগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট। কারবালায় হজরত হুসাইন রা. শুধু কয়েক ঘণ্টাই অবস্থান করেছিলেন এবং তখনই তার পরিবারের সকলকে শহিদ করে দেওয়া হয়।" এটা তাহকিকের নামে স্পষ্ট ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

[৫৫] তারিখে দিমাশক : ১৪/২১২

রোধ করতে পারবে না; সর্বসাধারণও যা ভুলবে না এবং শেষকাল পর্যন্ত তারা যার সমালোচনা ছাড়বে না।[৫৬]

মারওয়ানের এই চিঠি থেকে বুঝা যায়, বনু উমাইয়ার লোকেরাও হজরত হুসাইন রা. কে সম্মান ও মহব্বত করতো। কিন্তু আফসোস, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তার কোনো কথাতেই কান দিলো না। বড় ও বিশেষ কারো সম্মান তার ভেতরে বিন্দুমাত্র ছিল না। সে মানুষের আদলে শুধুই একটা খেলনা পুতুলের মতো ছিল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা তো ছিলই না; এমনকি একজন গভর্নরের কথাও সে পাত্তা দিলো না।

ইবনে জিয়াদের কাছে ইয়াজিদের চিঠি

এই সময় ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদকে একটি পত্র পাঠাল, যাতে লেখা ছিল আমি জানতে পেরেছি যে, হজরত হুসাইন রা. কুফার দিকে রওনা হয়েছেন। তার এই পদক্ষেপ দ্বারা তোমার শাসনের স্থান ও কাল বিশেষভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রশাসকদের মাঝে তুমি বিশেষভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো। আর এ ধরনের পরীক্ষার ফল দ্বারাই মানুষ স্বাধীনতা ও সম্মান লাভ করে কিংবা ক্রীতদাসের ন্যায় দাসত্ব ও অপমান বরণ করে।[৫৭]

সেইসাথে এই হুকুম দিয়েছে যে, গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র বাহিনীকে পর্যবেক্ষণের কাজে লাগিয়ে দাও। আর যার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা হয়, তাকে আটকে রাখো। আর অভিযুক্তকে শক্তভাবে পাকড়াও করো। তবে তোমার বিরুদ্ধে লড়াইকারী ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না। আর ইতিবাচক যা ঘটে, সে ব্যাপারে আমাকে লিখে জানাও। ওয়াস-সালাম।[৫৮]

ইয়াজিদের চিঠির উপর কিছু বিশ্লেষণ ও বিবেচনা

ইয়াজিদের চিঠি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইবনে জিয়াদকে ইয়াজিদ প্রথমে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলায় আক্রমণ করতে

---

[৫৬] তারিখে দিমাশক : ৪/২১২ তাহযিবুল কামাল : ৪২২৬

[৫৭] আল-মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ৩/১১৫

[৫৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮১

নিষেধ করেছিল। বরং যুদ্ধের শর্তের সাথে জুড়ে দিয়েছে। হয়তো ইয়াজিদ এতটুকুই যথেষ্ট মনে করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বলছে, এই দিকনির্দেশনা যথেষ্ট ও উপযুক্ত ছিল না। কারণ মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যার পর ইবনে জিয়াদের দুঃসাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এখন সে যদি হজরত হুসাইন রা. কে শহিদ করার সামান্য ইঙ্গিত পায় তাহলে জঘন্য কাজটা করে ফেলতে তার এক মুহূর্তও ভাববার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ইয়াজিদ যদি চিঠির ভাষা কিছুটা পরিবর্তন করে লিখত যে, হজরত হুসাইন রা. কে সসম্মানে দামেশকে পাঠিয়ে দাও তাহলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটতো না। নিশ্চয় ইয়াজিদের এই ভুলের কারণে জনগণ ঘোর বিপাকে পতিত হয়েছে।

হজরত হুসাইন রা. কে কুফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখার জন্য ইবনে জিয়াদের অপচেষ্টা

মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যা করার পর ইবনে জিয়াদের একমাত্র চেষ্টা ছিল যে, হজরত হুসাইন রা. এসব সংবাদ যেন কোনোভাবে জানতেই না পারে। সেজন্য ইবনে জিয়াদ যা করার তাই করল। কুফা থেকে বসরা এবং শামের এলাকাগুলোকে পুরোপুরি আবদ্ধ করে রাখল, যাতে কেউ হজরত হুসাইন রা. পর্যন্ত পৌঁছতেই না পারে। এমনকি আরব থেকেও কেউ এলে তাকে খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই করে তারপর শহরে প্রবেশ করতে দিতো। মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যা করা হয়েছিল ৮ জিলহজ আর হজরত হুসাইন সেদিনই কিংবা তার দু-তিনদিন পর মক্কা ছেড়ে কুফার পথ ধরেছেন। এমন অবস্থার কারণে তিনি এটাও জানতে পারেননি যে, কুফায় এখন নরম মনের সেই গভর্নর নুমান ইবনে বাশির রা. আর নেই। বরং তার স্থানে সমাসীন হয়েছে পাথরদিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। যদি ইবনে জিয়াদ এসব শহরের পথ অবরুদ্ধ করে না রাখতো তাহলে কোনো না কোনোভাবে এসব সংবাদ হজরত হুসাইন রা. পেয়ে যেতেন। কিন্তু এখন তার আর সম্ভাবনাও নেই। তাই হজরত হুসাইন রা. পূর্ববিশ্বাসেই ভর করে অগ্রসর হতে থাকলেন।[৫৯]

---

[৫৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২

হুসাইন রা. এর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা এবং ইবনে আকিলের ভাইয়ের সামনে অগ্রসরের তাগিদ

ইরাকের খুব কাছাকাছি যাওয়ার পর হজরত হুসাইন রা. খবর পেলেন যে, মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যা করা হয়েছে।[৬০]

এই সংবাদ শুনে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এখন তো তাহলে শাসকদের পক্ষ থেকে আমাদের ব্যাপারেও কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং জনসাধারণ থেকেও ওয়াদাভঙ্গ ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। সর্বশেষ মুসলিম ইবনে আকিল আর হানি বিন উরওয়ার মতো ইবনে জিয়াদ আমাদেরকেও হত্যা করবে। এজন্য তিনি হিজাজে ফিরে যাওয়াকেই উত্তম ও নিরাপদ মনে করলেন। কিন্তু ভাগ্যে যা লেখা ছিল তাই ঘটবে। তাই যখন তিনি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন মুসলিম ইবনে আকিলের ভাই বেঁকে বসল। বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের রক্তের প্রতিশোধ না নেবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাবো না; যদি সকলেই নিহত হয়ে যাই তবু এর বদলা নিয়ে ছাড়ব।

হজরত হুসাইন রা. তখন বললেন, তোমাদের ছাড়া আর বেঁচে থেকেই-বা লাভ কী![৬১]

টগবগে সেই যুবক এটাও বলেছিল যে, আপনি ফিরে যেতে চাচ্ছেন; অথচ তারা আমার ভাইকে হত্যা করেছে! তা ছাড়া আপনার কাছে তো তাদের পাঠানো চিঠিও আছে, যার উপর আপনার বিশ্বাস এখনো বদ্ধমূল।[৬২]

---

[৬০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৭ আবু মিখনাফের বর্ণনা অনুযায়ী, এই সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন বনু আসাদ গোত্রের এক লোকের কাছে। কিন্তু ততক্ষণে তিনি যুরুদ নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যা মক্কা থেকে কুফার পথে আঠারো মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত। কিন্তু কাসেম ইবনে সালামের বর্ণনামতে তিনি আশরাফ নামক স্থানে গিয়ে আকিলের হত্যার সংবাদ শুনতে পেরেছিলেন, যা মক্কা থেকে কুফার পথে ২৫ মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত। আল-মিহান : ১৫৩; তবে এক্ষেত্রে ইমাম কাসেম ইবনে সালামের বর্ণনাটিই অধিক শুদ্ধ। আর হুসাইনের বর্ণনামতে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ওয়াকেসাহ থেকে বসরা এবং সেখান থেকে শাম পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল এবং বিভিন্ন রাস্তায় সেনাটহল দিচ্ছিল। তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২

[৬১] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৯

[৬২] আল-মিহান : ১৫৩; আবু মিখনাফের বর্ণনামতে, হজরত হুসাইনকে তার পরিবারবর্গও সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আপনি মুসলিম ইবনে আকিলের মতো নন। যখন

এসব শুনে হজরত হুসাইন রা. পুনরায় সাহস ফিরে পেলেন এবং অগ্রসর হতে হতে যেখানটায় ইবনে জিয়াদ পাহারাদার লাগিয়েছিল একেবারে সেখানে পৌঁছলেন। এরপর এখানেই তাদের সাথে ইবনে জিয়াদের সিপাহি হুররা বিন ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ হয়।[৬৩]

হুররা বিন ইয়াজিদের পরামর্শ, হুসাইন রা. এর দামেশক যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তার কারণ

হুররা বিন ইয়াজিদ একজন ভদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কল্যাণ কামনা করছিলেন। তাই প্রথমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন?

এরপর যখন হুররা জানতে পারলেন যে, তিনি কুফা যাচ্ছেন। তখন হুররা খুব কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আপনি ফিরে যান। ওখানে আপনার কল্যাণের কোনো আশা নেই।

এই পরিস্থিতিতে হজরত হুসাইন রা. দামেশকে ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্ত এতই দৃঢ় ছিল যে, বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তিনি দামেশকের পথ ধরলেন।[৬৪]

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কার্যক্রম ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো, তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এটা বুঝতে পারছিলেন যে, ইয়াজিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন এটাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা মানে সরাসরি বিদ্রোহ। তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে তিনি এবার যা করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন, তাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন দামেশক গিয়ে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সম্ভাবনা ছিল পরস্পর মতবিনিময় করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন এবং মূল উদ্দেশ্যও সহজে সাধন হয়ে যাবে। তার এ কর্মপন্থাই বলে দিচ্ছে যে, তিনি ইয়াজিদের শাসনের ব্যাপারে নিজের ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও সেসব সাহাবির দৃষ্টিভঙ্গিরও সম্মান করতেন, যারা ইয়াজিদের কিছু অযোগ্যতা থাকার পরেও ঐক্যের উদ্দেশ্যে তার বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। হজরত হুসাইন

আপনি কুফায় পৌঁছবেন তখন দেখবেন সেখানকার লোকেরা আপনার কাছে ঠিকই দ্রুত জড়ো হবে এবং আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯৮

[৬৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯৮

[৬৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৯

রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা যাওয়ার উদ্দেশ্যও ক্ষমতা অর্জন ছিল না; বরং ইয়াজিদের দুর্বল দিকগুলো সংশোধন করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। কুফাবাসীদেরকে একত্র করে সম্ভবত তিনি সেই কাজটিই সহজে করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি যেহেতু সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল; তাই তিনি সরাসরি ইয়াজিদের সাথে কথা বলাকেই জরুরি মনে করলেন। কারণ, এ ছাড়া অন্য কোনো পথও খোলা ছিল না।

যদিও এ ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিল যে, দামেশক এবং কুফার শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সবাই হজরত হুসাইন রা. কে বিদ্রোহী হিসেবেই দেখছিল। তাই ইয়াজিদকে বোঝানো যতটা সহজ ছিল ইবনে জিয়াদকে ততটা সহজে বোঝানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার।[৬৫]

তিনি দামেশকের পথে সম্ভবত ৪৫ মাইল সফর করে অবশেষে কারবালায় পৌঁছেন, যা কুফা থেকে দামেশক যাওয়ার পথে অবস্থিত ছিল। ওখান থেকে ফুরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চল কাছেই ছিল, যাকে আত্তাফ নামকরণ করা হয়েছে।[৬৬]

---

[৬৫] হজরত হুসাইন রা.-এর প্রশানসনিক কাঠামো সংশোধন ও তার অবস্থান এবং ইয়াজিদের কাছে সেই অবস্থানের উপর ভিত্তি করে যাওয়াটা যে নিছক তার ধারণার বশে ছিল এমনটা নয়; বরং খুব ভেবে-চিন্তেই করছিলেন। সে-কথা খোদ ইয়াজিদের বক্তব্য থেকেও বুঝে আসে। কারবালার ঘটনার পর ইয়াজিদ বলতো-আমার কী এমন হয়ে যেতো যদি আমি সাময়িক কিছু কষ্ট সহ্য করে নিতাম এবং হজরত হুসাইন রা. কে তার ঘরেই থাকতে দিতাম আর তিনি যা চাচ্ছেন তাতে তাকে স্বাধীনতা দিতাম! তাহলে তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত ও সম্মান এবং হজরত হুসাইন রা.-এর হক ও আত্মীয়তার সম্পর্কের চাওয়া ও কামনা এটাই ছিল। তাতে যদি আমার ক্ষমতা বা শক্তিতে কিছুটা ভাটাও পড়ত। তারিখে তাবারি : ৫/৫০৬

এথেকে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে যায়, ইয়াজিদের পরবর্তী ধারণা এটাই ছিল যে, হজরত হুসাইন রা. অবশ্যই আমার কাছে কিছু পরামর্শ ও দাবি উত্থাপন করতে চাইছিলেন, যেগুলো মেনে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলে বনি উমাইয়া বংশের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা ছিল। এবার এখানে এই বিষয়টা থেকে যায় যে, ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা.-এর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বা তার সাথে কথাবার্তা বলা ছাড়া এটা সে কীভাবে বুঝলো। আসলে এতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই। কারণ হজরত হুসাইন রা.-এর সন্তান আলি ইবনুল হুসাইন রহ. কারবালার ঘটনার পরে যখন ইয়াজিদের কাছে ছিলেন তখন হয়তো ইয়াজিদ তার থেকে এসব কথা ও বিষয় উদ্ধার করেছে।

[৬৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২; উল্লেখ্য যে, আলআযীব থেকে কারবালার মধ্যকার মঞ্জিলগুলোর কথা আবু মিখনাফ বর্ণনা করেছেন। আলআযীব কুফা থেকে কমপক্ষে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত। আলমাসালিক ওয়াল মামালিক:১/৪৭

ইবনে জিয়াদ আসলে কী চাচ্ছিল এবং কেন?

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যদি একটু রাজি থাকত তাহলে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলাকে শামে যেতে দিতে পারতো। কিন্তু আফসোস, সে সামান্যও দয়া ও নম্রতার পরিচয় দিলো না। বরং হজরত হুসাইন রা. কে কারবালাতেই থেমে যেতে বাধ্য করল এবং সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করে কুফায় উপস্থিত করার আদেশ দিলো।

এখানে এই প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক যে, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এমনটা আসলে কেন করল? দামেশকের প্রশাসন থেকে কি তার উপর কোনো চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছিল? এমন হওয়া তো সম্ভব নয়। কারণ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলা ইরাকে পৌঁছার পর ১০ মহররম পর্যন্ত কুফা এবং দামেশকে কোনো চিঠি প্রেরণ সম্ভবই ছিল না।[৬৭] দামেশকের প্রশাসনের নির্দেশমতে তার মূল দায়িত্ব ছিল ইরাকের অবস্থা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখা এবং সেটা সে ভালো মতোই করতে পেরেছিল। কারণ সেখানকার জনগণ তার ভয়ে তটস্থ ছিল এবং হজরত হুসাইন রা. তখন কুফা থেকে চলে যাচ্ছিলেন। তাহলে এখন কেন উবাইদুল্লাহ হজরত হুসাইন রা. কে যেতে বাঁধা দিলো? তার তো খুশি হওয়ার কথা ছিল এই ভেবে যে, যাক, নতুন একটা বিপদ থেকে কোনোরকম উদ্ধার হওয়া গেলো।

এসব আচরণের কারণে ইবনে জিয়াদকে গভর্নরের পরিবর্তে একজন হঠকারী বলাই ভালো। তা ছাড়া এটা তো নিশ্চিত যে, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ হজরত হুসাইন রা. কে একজন বিদ্রোহী ও ক্ষমা-অযোগ্য অপরাধী বলেই ভাবত। সেইসাথে আত্মতুষ্টি ও নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা

---

[৬৭] কুফা এবং দামেশকের মাঝে ৪৮১ মাইলের দূরত্ব ছিল। যদি খুব দ্রুতগামী কোনো আরোহী দিনে ১০০ কিলোমিটার করেও পথ অতিক্রম করতো তাহলেও দামেশক যেতে তার ৭ বা ৮ দিন সময় লাগার কথা। আবার সেখান থেকে উত্তরপত্র নিয়ে আসতেও এতদিন সময়ের প্রয়োজন ছিল। মোটকথা, ইয়াজিদের নতুন কোনো সংবাদ জানা বা কোনো নির্দেশ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ১৫ বা ১৬ দিন লেগে যাওয়ার কথা। অথচ হজরত হুসাইন রা. এর কারবালায় আসার পর ৫ দিনও অতিবাহিত হয়নি। এর মধ্যেই ইয়াজিদ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। ফলে ১০ মহররম হজরত হুসাইন রা. এবং তার সাথিরা শহিদ হয়ে গেলেন। সুতরাং এখানে একথাটা স্পষ্ট যে, ইয়াজিদের চিঠি পড়ার পর উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিজেকে সবধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত বলে ভাবছিল। ফলে তার থেকে নতুন কোনো নির্দেশনার অপেক্ষাও সে করেনি।

করাই ছিল ইবনে জিয়াদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে যেভাবে মুসলিম ইবনে আকিল ও হানি বিন উরওয়াকে হত্যা করেছিল সেভাবেই হজরত হুসাইন রা.-কেও শহিদ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যাতে সকলের মনে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার কেউ দুঃসাহস না দেখায়।

ইবনে জিয়াদ যদি চক্রান্ত ও বিশৃঙ্খলাকেই থামাতে চাইতো তাহলে তার জন্য তা অনেক সহজ ছিল। কারণ তখন সে হজরত হুসাইন রা. কে নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরখাস্ত করা ও তদস্থলে তার নিয়োগ এবং ইরাকের উপর আধিপত্য বিস্তার ও মুসলিম ইবনে আকিলকে নির্মম হত্যার সংবাদগুলো চাইলে খুব সহজেই পৌঁছে দিতে পারতো। তাহলেই কিন্তু হজরত হুসাইন রা. আর এইদিকে পা বাড়াতেন না। সব ভেবে ফিরে যেতেন। কিন্তু ইবনে জিয়াদ এসবের কিছুই করেনি। উলটো হজরত হুসাইন রা. যেন এসব সংবাদ কোনোভাবেই জানতে না পারেন সেজন্য ইবনে জিয়াদ যা করার তা-ই করল। কুফা থেকে বসরা এবং শামের এলাকাগুলোকে পূর্ণমাত্রায় আবদ্ধ করে রাখল। এমনকি আরব থেকেও কেউ এলে তাকে খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই করে তারপর শহরে প্রবেশ করতে দিতো। মোটকথা, হজরত হুসাইন রা. যেন কোনোভাবেই কুফার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে না পারে এবং খুব সহজেই তাকে নিজের আয়ত্তে এনে একথা প্রমাণ করতে পারে যে, তার মতো এত বড়মাপের নেতা দ্বিতীয়জন নেই। এজন্যই ইবনে জিয়াদ সীমান্তের সিপাহিদের এই নির্দেশ দিয়েছিল যে, তারা যেন হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলাকে গ্রেফতার করে সোজা কুফায় নিয়ে আসে।

উমর ইবনে সা'দের কারবালায় রওনা

ইবনে জিয়াদ প্রথমেই পরিস্থিতি সামলে নিলো। সে উমর ইবনে সা'দকে তেহরানের গভর্নর বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে এই আদেশ দিলো যে, সে যেন কারবালায় গিয়ে হজরত হুসাইন রা. কে কোনো নিরাপত্তার ওয়াদা না দিয়ে গ্রেফতার করে সোজা কুফায় নিয়ে আসে। আর যদি হজরত হুসাইন রা. নিজে থেকে আত্মসমর্পণ না করে এবং ধরা দিতে না চায় তাহলে ওখানেই তাকে যেন শহিদ করে দেয়। কিন্তু হজরত হুসাইন

রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বেআদবি ও তার উপর হাত তোলা যে কতটা অন্যায় এবং এর পরিণতি যে কতটা ভয়ংকর, সেসব ভেবে উমর ইবনে সা'দ ইবনে জিয়াদের কাছে অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করল। তবে তাতে খুব বেশি কাজ হলো না। কারণ ইবনে জিয়াদ তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়তে নারাজ ছিল। তাই উমর ইবনে সা'দকে সে খুব হুমকি-ধমকি দিলো এবং একাজ না করলে গর্দান উড়িয়ে দেওয়ারও ভয় দেখাল।[৬৮]

উমর ইবনে সা'দ সকাল পর্যন্ত ভেবে দেখার সুযোগ চাইলো। তারপর সে সারারাত বিষয়টির পূর্বাপর নিয়ে ভাবল। শেষপর্যন্ত যুদ্ধই জয়ী হলো তার ভেতরে। পরদিন সকালে সে ইবনে জিয়াদের কাছে এসে কারবালায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল এবং সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে কারবালায় পৌঁছল।[৬৯]

---

[৬৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/১৬৮

[৬৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৯; উল্লেখ্য উমর ইবনে সা'দের নামের মতোই আরেকজন উমর সা'দ ছিল। তারা উভয়েই আসলে হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর সন্তান ছিল। উমর ইবনে সা'দ ইয়াজিদের সেনাপ্রধান ছিল। যখন উমর ইবনে সা'দ রা. হাররার যুদ্ধে ইয়াজিদের সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে করতে নিহত হয়ে গিয়েছিল।

কারবালার বধ্যভূমি

কারবালার ময়দানে সেনা-অফিসার উমর ইবনে সা'দ, শাম্মার ইবনে যিল-জাওশান এবং হুসাইন ইবনে নুমাইরের সাথে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা হয়। হজরত হুসাইন রা. তখন তাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বললেন, আমাকে আমিরুল মুমিনিনের কাছে যেতে দাও। আমি আমার হাত তার হাতে দিয়ে দেবো।[৭০]

উত্তরে তারা বলল, আসলে ইবনে জিয়াদের নির্দেশ মেনে নেওয়া ছাড়া এখন আপনার জন্য দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই।[৭১]

কুফার সেনাদেরকে হজরত হুসাইন রা. এর তিনটি প্রস্তাব

সকল পথ বন্ধ দেখে হজরত হুসাইন রা. দ্বিতীয়পর্যায়ে তাদেরকে তিনটি প্রস্তাব দিলো :

---

[৭০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২ এখানে আমিরুল মুমিনিন শব্দটা শুদ্ধ বর্ণনাতে বিদ্যমান; তাই আমরাও অনুবাদে হুবহু শব্দটাই বর্ণনা করে দিলাম। কিন্তু কথা হলো, এই শব্দ থেকে যেন কোনো ভুল ধারণা ও ভুল বুঝের সৃষ্টি না হয়। যদিও শব্দে সম্বোধন দ্বারা ইয়াজিদই বুঝা যাচ্ছে; তাই বলে ইয়াজিদের ন্যাপরায়ণতা কিংবা নেককার হওয়ার কথা বুঝা যায় না। আমিরুল মুমিনিন যদিও খোলাফায়ে রাশেদিনের উপাধি ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে এটা খারাপ ভালো সকলেই ব্যবহার শুরু করে দিয়েছিল। যেমন মামুন এবং মু'তাসিমের মতো খারাপ আকিদার খলিফাকেও ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল আমিরুল মুমিনিন বলতেন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১৪/৪০০-৪০৪

হজরত হুসাইন রা.-এর ইয়াজিদের ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন শব্দের ব্যবহারটা তেমনই। তবে একথা তো অবশ্যই নিশ্চিত যে, শেষপর্যন্ত হজরত হুসাইন রা. ইয়াজিদের খেলাফত প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিয়েছিলেন। যদি ইয়াজিদের সাথে তার সাক্ষাৎ হতো এবং ইয়াজিদ তার কথা মেনে নিতো তাহলে হয়তো তিনি ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে যেতেন। কারণ 'আমার হাত তার হাতে দিয়ে দিবো' একথা দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদ যদিও ফাসেক ও ফাজের ছিল; কিন্তু তাই বলে তা কুফর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। অন্যথায় হজরত হুসাইন রা. তার সাথে আলোচনার ইচ্ছাও করতেন না।

[৭১] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২ বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে।

১. যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাওয়ার সুযোগদান।
২. ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সুযোগদান।
৩. অন্য যেকোনো জায়গায় চলে যাওয়ার সুযোগদান।

উমর ইবনে সা'দ মেনে নিলো। সে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে বিষয়টা জানাল। কিন্তু ইবনে জিয়াদ পরিষ্কার ভাষায় সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং কোনো শর্ত ও সন্ধি ছাড়াই তাকে গ্রেফতার করে আনার নির্দেশ দিলো।[৭২]

একপর্যায়ে আবু মিখনাফের কারণে আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদও কিছুটা রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শাম্মার বিন যিল-জাওশানের বোঝানোর কারণে ইবনে জিয়াদ আবার উলটো পদক্ষেপ নিল এবং হজরত হুসাইন রা. কে গ্রেফতার করে এনে হুকুমতের অধীনে আনার নির্দেশ বহাল রাখল।

শাম্মার উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে বলেছিল, আল্লাহ দুশমনকে আপনার কবজায় এনে দিয়েছেন আর আপনি তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন?[৭৩]

ইবনে জিয়াদেরও সিদ্ধান্ত এটাই ছিল; কিন্তু মাঝে অনেকের বোঝানোতে একটু শিথিল হয়েছিল।[৭৪]

শাম্মারের ফয়সালা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেওয়ার কারণে ইবনে জিয়াদ দোষমুক্ত হয়ে যেতো না। কারণ সে আসলে ইবনে জিয়াদের মনের কথাটাই বলে দিয়েছিল। অন্যথায় ইবনে জিয়াদ কোনো অবুঝ বালক ছিল না যে, সে শাম্মারের কথার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেবে।

হজরত হুসাইন রা. কেন গ্রেফতার হতে রাজি ছিলেন না?

ইতিহাসবিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞগণ একথা ভেবে অস্থির হয়ে যান যে, হজরত হুসাইন রা. যখন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণে সম্মত হলেন তখন ইবনে জিয়াদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে তিনি অসম্মত ছিলেন কেন? কারণ প্রকারান্তরে ইবনে জিয়াদ তো ইয়াজিদেরই নিয়োগপ্রাপ্ত

---

[৭২] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৭
[৭৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৪১৩ আল-মিহান : ১৫৪
[৭৪] আল-মিহান : ১৫৪

গভর্নর এবং ইয়াজিদের পক্ষ থেকেই বাইয়াত নিচ্ছে।

তারা আসলে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর লক্ষ-উদ্দেশ্য এবং কুফার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়াকে নিছক ছেলেখেলা ও বোকামি ভেবে বসে আছে। তারা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণকে শুধুই এই ভেবে বসে আছে যে, হজরত হুসাইন নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সেই পথই বেছে নিলেন, যাকে তিনি শুরু থেকে এতদিন হারাম ভেবে আসছিলেন। অথচ হজরত হুসাইন রা. যদি জীবনের ভয়ই করতেন তাহলে ইবনে জিয়াদের প্রেরিত সৈন্যদের সামনে নিজের মাথা নত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তেমনটা করেননি। প্রকৃত বিষয় হলো, শিয়া সম্প্রদায় যেখানে হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তানদের নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে সীমালঙ্ঘন করছিল সেখানে কিছু বিশ্লেষক তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং নিষ্পাপ পর্যায় থেকে টেনে নামানোর জন্যই মূলত এসব করেছেন। তারা আজকালের অনভিজ্ঞ রাজনীতিকদের মতোই হজরত হুসাইন রা. কে ধারণা করছিল এবং তার সিদ্ধান্তকে নিছক ছেলেখেলা ভেবে বসেছিল। এজন্যই তারা এই জায়গাটাতে এসে পিছলে গেছে।

কিন্তু যদি তারা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত সামনে রাখতো তাহলেই বিষয়টা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেতো। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মূলত উদ্দেশ্য ছিল সংশোধন আর তিনি সেই উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধিকে সামনে রেখেই ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হতে চেয়েছিলেন। যেহেতু সংশোধন হওয়ার বিষয়টি ইয়াজিদের হাতেই ছিল এজন্য তিনি সেখানেই যেতে চাচ্ছিলেন। তা ছাড়া উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে তার এই স্বার্থসিদ্ধির কোনো উপযোগিতা ও সুযোগই ছিল না। সেই কারণেই তিনি ইবনে জিয়াদের হাতে বাইয়াত গ্রহণে অসম্মত ছিলেন।

কীভাবে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা?

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও উমর ইবনে সা'দ যুদ্ধ এড়িয়ে যেতেই চাচ্ছিল। কিন্তু ইবনে জিয়াদ কুফায় বসে এখানকার প্রত্যেকটা মুহূর্তের সংবাদ নিচ্ছিল। সে জুওয়াইরিয়া বিন বদর তামিমিকে এই নির্দেশ দিয়ে

পাঠাল যে, উমর ইবনে সা'দকে বলো হজরত হুসাইন রা. এবং তার সাথিদের সাথে লড়াই শুরু করে দিতে; নয়তো আমিই তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। উমর ইবনে সা'দ যখন এই সংবাদ শুনলো তখন খুবই দ্রুত সকলকে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিলো।[৭৫]

হজরত হুসাইন রা. যখন দেখলেন তাদের সাথে এসব কথা অযথা ছাড়া কিছুই না তখন তিনি নিজ সাথিদের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন অক্টোবর মাস চলছিল। হালকা ঠান্ডা আবহাওয়া ছিল প্রকৃতিতে। সেজন্য হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়ে ছিল মোটা চাদরের জুব্বা। এরই মধ্যে উমর ইবনে সা'দের এক সৈন্য আমর তহবী নামে বনু তামিমের একব্যক্তি প্রথমে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উভয় কাঁধ বরাবর একটি তির নিক্ষেপ করল। এটাই যেন ছিল যুদ্ধের ঘোষণা।[৭৬]

ঠিক তখন কুফার অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান আশহুর বিন ইয়াজিদের হৃদয় জেগে উঠল। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রস্তুত দেখে অফিসারদের তিরস্কার করে বলতে লাগল, "তোমরা কি হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব গ্রহণ করবে না? আল্লাহর শপথ, তুর্কি কিংবা দায়লামির কাফেররাও যদি তোমাদেরকে এই প্রস্তাব দিতো তাহলেও তোমাদের জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হতো না।"

কিন্তু আফসোস, কেউ তার কথায় কান দিলো না। তারপর হুর বিন ইয়াজিদ তার ঘোড়ার মুখে আঘাত করে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে অগ্রসর হলেন। তখন হজরত হুসাইন রা. ও তার কাফেলার সবাই ধারণা করছিলেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে। কিন্তু তিনি যখন তাদের নিকটবর্তী হলেন তখন তার ঢাল উলটে তাদেরকে সালাম করলেন। এরপর ইবনে জিয়াদের প্রেরিত বাহিনীর উপর আক্রমণ করে দুজনকে হত্যা করলেন এবং তিনি একপর্যায়ে শহিদ হয়ে গেলেন।

---

[৭৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২

[৭৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২; এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তির এসে তার মোটা জুব্বাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করলেও তার গায়ে তেমন মারাত্মক রকম কোনো আঘাত লাগেনি।

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবমাননা

এখন উভয় দল নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেলো। ইবনে জিয়াদের সৈন্যরা লড়াইকে তীব্রতর করার জন্য হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তানদেরকে অবমাননা ও তিরস্কার করতে লাগল। এক দুর্ভাগা তো বলেই বসল, তোমাদের মধ্যে কি হুসাইন এখনো আছে?

উত্তরে কেউ একজন বলল, হ্যাঁ।

তখন সে বলল, তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

এরপর হজরত হুসাইন রা. বললেন, কখনোই নয়। বরং আল্লাহ ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু, যার আনুগত্য করা হয়।

আচ্ছা! তুমি কে? হজরত হুসাইন রা. জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জুওয়াইরিয়ার সন্তান।

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখ থেকে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে এলো, "হে আল্লাহ, ওকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দাও।"

একথা শুনে সে তৎক্ষণাৎ খুব ক্ষিপ্র বেগে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর আক্রমণ করতে চাইলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। আর পা আটকে গেলো ঘোড়ার জিনের সাথে বাধা আংটায়। ফলে ঘোড়া তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ছুটতে থাকল। অবশেষে শুধু তার পা-টাই জিনে অবশিষ্ট রইলো।[৭৭]

---

[৭৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩৭৩৬৯; আল-মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ৩/১১৬; এখানে একটা বিষয় স্মৃতিতে থাকা উচিত। আমরা হজরত হুসাইন রা.-এর ব্যাপারে সহিহ এবং হাসান রেওয়ায়েতের আলোকেই লিখছি; কিন্তু মাঝে দুর্বল কিছু বর্ণনাও গ্রহণ করছি, যাতে সেই বিষয়গুলো সামনে এসে যায়, যেগুলো হজরত হুসাইন রা.-এর ব্যাপারে আরো নতুন কিছু জানতে সাহায্য করবে। তবে তার যুদ্ধের বর্ণনাগুলোতে কোনো যয়িফ বর্ণনাকে গ্রহণ করিনি। সেখানে শুধু সহিহ রেওয়ায়েতের আলোকে বিষয়গুলো তুলে ধরেছি। আজকাল অনেকেই কারবালার ঘটনাকে শুধু শিয়াদের বানানো বলে ভাবে এবং মনে করে যে, এসব বর্ণনা শিয়া বর্ণনাকারী আবু মিখনাফ কর্তৃক বর্ণিত। এবং তার মনগড়া কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা শুধুই সেই সহিহ বর্ণনাগুলোর আলোকে বিষয়টা উপস্থাপন করেছি, যেগুলো তাদের বিশ্বাসকে বদলানোর জন্য যথেষ্ট। তবে এমন সহিহ বর্ণনা অল্প হলেও নির্ভরযোগ্য। যাদের বিস্তারিত পড়ার ইচ্ছা আছে তারা যেন আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া পড়ে নেন।

পুত্র আবদুল্লাহর ইনতেকাল এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের সূচনা

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবদুল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন ছিলেন। একজন কুফি সৈন্য দেখে তাকে বলল, "আমি তো তাকে অবশ্যই কতল করব।"

অনেকেই তাকে বুঝালো যে, তাকে হত্যা করে তোমার কী লাভ! কিন্তু সে কারো কথাই শুনলো না। বরং অস্ত্র উঁচিয়ে ছুটলো তার দিকে। যখন সে কাছাকাছি পৌঁছে গেলো তখন আবদুল্লাহ চিৎকার করে বলতে লাগল—চাচা!

হজরত হুসাইন রা. আওয়াজ শুনে বললেন, "এমন ব্যক্তির আওয়াজে লাব্বাইক বলে সহযোগিতা করার মানুষের চেয়ে শত্রুসংখ্যাই বেশি।" একথা বলে তিনি সেই ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার হাত কেটে ফেললেন। এরপর দ্বিতীয়বারের আঘাতে তাকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় করে দিলেন। এরপরেই মূলত ব্যাপকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।[৭৮]

কুফার অধিবাসীদের ভীরুতা

কুফার অধিবাসীদের অনেকেই যুদ্ধের এ দৃশ্য দেখার জন্য সেখানকার টিলাগুলোর কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। তারা খুব ভারাক্রান্ত হয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিল এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যের জন্য দোয়া করছিল; কিন্তু তাদের ভেতরে এতটাই ভয় ছিল যে, তারা সেখান থেকে এসে হজরত হুসাইন রা. কে সহযোগিতা করার সাহস পাচ্ছিল না। কেউ কেউ তাদেরকে বলেওছিল, হে আল্লাহর দুশমন, তোমরা ওখান থেকে এসে কেন হজরত হুসাইন রা. কে সাহায্য করছো না? কিন্তু তারা এর কোনো প্রতিক্রিয়া বা উত্তর কিছুই জানাল না।[৭৯]

---

[৭৮] আল-মিহান : ১৫৪; ইমাম কাসেম ইবনে সালাম থেকে, আর তিনি ইমাম সুহনুন থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, কুফিরাই মূলত লড়াই প্রথমে শুরু করেছিল। প্রথমে তারা পেছন থেকে হজরত হুসাইন রা.-এর উপর তির নিক্ষেপ করল। তারপর তার ছোট ভাতিজাকে আক্রমণ করল। এরপর মূলত তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু মাহমুদ আব্বাসির অনুসারী প্রাচ্যবিদরা একথা দাবি করে যে, হজরত হুসাইন রা. এবং তার সাথিগণ প্রথমে হাতিয়ার রেখে দিতে অস্বীকার করে তারাই মূলত যুদ্ধের সূচনা করেছিল। আমাদের উল্লিখিত এই সহিহ বর্ণনা তাদের মনগড়া মন্তব্য ধূলিসাৎ করার জন্য যথেষ্ট।

[৭৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯২

সে-সময় হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে শ'খানেক লোক ছিল। তাদের মধ্যে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাঁচ ছেলে এবং বনু হাশেমের ষোলো সদস্য ছাড়াও বনু সুলাইম ও বনু কেনানার মিত্ররা ছিল। ইবনে উমর ইবনে জিয়াদ নামেও এক ব্যক্তি তাদের সাথে শামিল ছিল।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত

প্রচণ্ড যুদ্ধে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সকল সাথিই শহিদ হয়ে যান। তাদের মধ্যে দশজনের বেশি যুবকই ছিল তার পরিবারভুক্ত। একটি তির এসে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোলে থাকা নিষ্পাপ সন্তানটিকেও আঘাত করল। হজরত হুসাইন রা. রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, "হে আল্লাহ, আমাদের এবং এদের মাঝে তুমিই ইনসাফের ফয়সালা করে দাও। এরা তো আমাদেরকে এজন্য ডেকেছিল যে, আমাকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু এখন সেই তারাই আমাদের হত্যা করছে।"[৮০]

হজরত হুসাইন রা. একথা দৃঢ়ভাবেই বুঝতে পারছিলেন যে, এরা শুধু আমাকে হত্যাই নয়; বরং আমার লাশ থেকে কাপড় খুলে নিতেও সামান্য কুণ্ঠাবোধ করবে না। তাই তিনি স্ত্রীকে বললেন, আমাকে এমন কোনো সাধারণ কাপড় দাও, যা মানুষ খুলে নিতে অপছন্দ করবে। আমি তা আমার কাপড়ের নিচে পরে নিব, যেন আমি উলঙ্গ না হয়ে যাই।

স্ত্রী তার কথামতো একটি পুরাতন চাদর এগিয়ে দিলে তিনি সেটি আবার ছিঁড়ে কাপড়ের নিচে পরে নিলেন। এরপর তলোয়ার নিয়ে বের হয়ে গেলেন।[৮১]

এরপর খুব জোরদার হামলা হলো। অবশেষে লড়াই করতে করতে হজরত হুসাইন রা. শহিদ হয়ে গেলেন।[৮২]

---

[৮০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৭

[৮১] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/১১৭ তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৯

[৮২] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/১১৭ তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৭

হত্যাকারীরা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহ মোবারক থেকে মাথা আলাদা করে ফেলে এবং সেই পুরাতন ছেঁড়া চাদরটা ছাড়া বাকিসব খুলে নিয়ে যায়।[৮৩] ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কারবালার শহিদগণ

কারবালার যুদ্ধে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আবু তালেব পরিবারের ১৮ জন সদস্য শহিদ হয়েছিলেন।

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছয় ভাই : ১. আব্বাস, ২. জাফর, ৩. উবাইদুল্লাহ, ৪. উসমান, ৫. মুহাম্মদ ও ৬. আবু বকর।

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই সন্তান : ১. আবদুল্লাহ ও ২. আলি আকবার।

হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর তিনজন সন্তান : ১. কাসেম, ২. আবু বকর ও ৩. আবদুল্লাহ।

আকিল ইবনে আবি তালিবের তিন সন্তান : ১. জাফর, ২. আবদুর রহমান ও ৩. আবদুল্লাহ।

এবং হজরত আকিল রহ.-এর দুই পৌত্রী : ১. আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ও ২. মুহাম্মদ ইবনে আবু সাঈদ ইবনে আকিল।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই সন্তান : ১. আউন ও ২. মুহাম্মদ।

আর উমর ইবনে সা'দের সৈন্য মারা গিয়েছিল ৮৮ জন।[৮৪] হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর আরেক সন্তান যাইনুল আবেদিন সেইসময় অসুস্থ ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ২৩ বছর। উমর ইবনে সাঈদ সৈন্যদেরকে বলল, 'এই অসুস্থ ছেলেটাকে কিছু করো না।'

হত্যাকারীদের হঠকারী কবিতা

হত্যাকারীরা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা নিয়ে কুফার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল এবং ইবনে জিয়াদকে সুসংবাদ জানিয়ে এই

---

[৮৩] তারিখে খলিফা : ২৩৪, ২৩৫ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৫৫১, ৫৫২

[৮৪] তারিখে খলিফা : ২৩৪, ২৩৫ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৫৫১, ৫৫২

কবিতা আবৃত্তি করল :

আমাকে দাও ভরে দাও স্বর্ণ চাঁদি রূপা
কারণ আমি হত্যা করি নামকরা সব নেতা,
শ্রেষ্ঠ বাবা মায়ের আমি সন্তান করি বধ
বংশে শৌর্যে শ্রেষ্ঠ শুমার করে যাদের ওয়াক্ত।[৮৫]

ইবনে জিয়াদের সামনে হজরত হুসাইন রা. এর মাথা

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মোবারক একটি পাত্রে রেখে ইবনে জিয়াদের সামনে পেশ করা হলো। তখন তার চুলে খেযাব লাগানো ছিল।[৮৬]

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের অন্তর পাথরের মতো শক্ত ছিল। কাটা-মাথা দেখে তার ভেতর কোনো প্রভাব পড়ল না। উলটো সে তার হাতের দণ্ড দিয়ে নাকে খোঁচা দিয়ে বলল, দেখো, আবু আবদুল্লাহর চুল-দাড়ি সাদা হতে শুরু করেছিল।[৮৭] এরপর সে দণ্ডটি ঠোঁটের উপর রেখে বলল, তার নাকটা তো ভারি সুন্দর!

তখন সেই মজলিসে কুফার অনেক বড় বড় বুজুর্গ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-ও ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, শোনো, আমি রাসুলুল্লাহকে এখানে চুমু দিতে দেখেছি, যেখানে তুমি দণ্ডটি রেখেছো।[৮৮]

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ

উমর ইবনে সা'দ যুদ্ধশেষে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের নারীদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে কুফায় পাঠিয়ে

---

[৮৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯৭ ইমাম আবু নুয়াইম যুবাইর ইবনে বাক্কার থেকে এটি বর্ণনা করে বলেন যে, কারবালার শহিদদের লক্ষ করে সিনান ইবনে আনাস নাখায়ি সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিল। আর খাওলা বিন ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা.-এর মাথা আলাদ করেছিল এবং সেই মাথা ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই পঙক্তি শুনিয়েছিল। মা'রিফাতুস সাহাবা : ১৭৭৮; অথচ আবু মিখনাফের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এই শে'রটি আবৃত্তি করেছিল সিনান ইবনে আনাস নাখায়ি। তারিখুত তাবারি : ৫/৪৫৪

[৮৬] সহিহুল বুখারি : ৩৭৪৮; কিতাবুল মানাকিব।

[৮৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯৩

[৮৮] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/১২৫

দিলো।[৮৯] উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ পাথর মনের হওয়া সত্ত্বেও নবীপরিবারের নারীদের সাথে কোনো খারাপ আচরণ করেনি। বরং সে তাদেরকে আলাদা একটি ঘরে পাঠিয়ে খাবারদাবার ও প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের ব্যবস্থা করে দিলো।[৯০]

ইবনে জিয়াদ আসলে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিটি নড়াচড়াকে বিদ্রোহ হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। তার দর্শন অনুযায়ী হজরত হুসাইন রা. তার সকল পুরুষ সাথি-সঙ্গী বিদ্রোহীদের কাতারেই শামিল ছিল। ঘরের ছোট ছোট শিশু ও নারীরা ছিল এই আওতার বাইরে। এজন্য সে তাদেরকে শাস্তির উপযুক্ত মনে করেনি।

হজরত যাইনুল আবেদিন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারভুক্ত সকল পুরুষই শহিদ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার ছেলে আলি বিন হুসাইন, যিনি যাইনুল আবেদিন উপাধিতে প্রসিদ্ধ, শুধু তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। কারণ সেসময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। ফলে যুদ্ধের জন্য তাঁবু থেকে বের হতে পারেননি।

তিনি যখন নারীদের সাথে কুফায় ইবনে জিয়াদের কাছে এলেন তখন তাকেও বিদ্রোহী মনে করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তখন তার ফুফু যায়নাব বিনতে আলি, যিনি অত্যন্ত সাহসী ও সংগ্রামী ছিলেন, এসে আলি ইবনে হুসাইনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তোমরা হত্যা না করবে ততক্ষণ একে হত্যা করতে পারবে না।

এই অবস্থা দেখে ইবনে জিয়াদের দয়া উথলে উঠল এবং তাকে ছেড়ে দিলো। এরপর পুনরায় সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে তাদেরকে ইয়াজিদের কাছে দামেশকে পাঠিয়ে দিলো।[৯১]

আবু মিখনাফ এবং কারো কারো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইবনে জিয়াদ এবং ইয়াজিদ তাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। উদাহরণত, তাদেরকে কুফা থেকে দামেশক প্রেরণের সময় অপরাধীদের

---

[৮৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯০
[৯০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯৩
[৯১] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯০

মতো করে উটে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল এবং ইয়াজিদ তাদেরকে দরবারে এনে খুব অপমান করেছিল। কিন্তু এসব খারাপ আচরণের কথাটা নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

ইয়াজিদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ

নবীপরিবারের নারীগণ যখন দামেশকে ইয়াজিদের কাছে পৌঁছলেন তখন ইয়াজিদও এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য খুব আফসোস প্রকাশ করেছিল। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হজরত যাইনুল আবেদিন রহ.-এর বর্ণনা হলো, আমাদেরকে ইয়াজিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমাদের দেখে তার চোখ ছলছল করতে থাকল। আমরা তার কাছে যেভাবে যা চেয়েছি, সে সেভাবেই তা দিয়েছিল।

ইয়াজিদের দরবারে তখন এক নীলচোখা লোক ছিল। সে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কমবয়সি এক মেয়েকে দেখে বলল, আমিরুল মুমিনিন, এই মেয়েটাকে আমার কাছে দিয়ে দিন!

একথা শুনে যায়নাব বিনতে আলি বলে উঠলেন, আল্লাহর শপথ, এই অধিকার না তোমার আছে আর না ইয়াজিদের। তবে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে তো কোনো কথাই নেই, যে দীন অস্বীকার করে।

কিন্তু নীল চোখা লোকটা পুনরায় সেকথাই বললে ইয়াজিদ বলল, চুপ থাকো।[৯২]

এরপর হজরত ফাতেমা বিনতে হুসাইন বললেন, হে ইয়াজিদ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের কি তুমি বন্দি বানিয়ে রাখবে?

একথা শুনে ইয়াজিদ কাঁদতে শুরু করল। সেইসাথে উপস্থিত অনেকেই এতো বেশি পরিমাণে কাঁদল যে, আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো।

সেখানে হজরত নুমান ইবনে বাশির রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইয়াজিদকে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই অবস্থায় দেখে যা যা করতেন, আপনি তাদের সাথে ঠিক তেমনটাই করুন।

---

[৯২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩২০

একথা শুনে ইয়াজিদ নির্দেশ দিলো যে, তাদেরকে গোসলের ব্যবস্থা করো এবং বড় করে তাঁবু টানিয়ে দাও। লোকেরা এমনটাই করল। ইয়াজিদ তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিলো। পোশাক-পরিচ্ছদ দিলো। মোটকথা, প্রয়োজনীয় সব দিয়ে বলল, যদি ইবনে জিয়াদের সাথে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতো তাহলে সে তাকে হত্যা করতো না।[৯৩]

নবীপরিবারের নারীদের সাথে ইয়াজিদের উত্তম আচরণের ব্যাপারে আবু মিখনাফ কিছু বর্ণনায় স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এবং হজরত ফাতেমা বিনতে আলি, যিনি হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্রী ছিলেন, থেকে কিছু ঘটনাও বর্ণনা করেছেন– ইয়াজিদ নুমান ইবনে বাশির রা. কে বলল, নুমান, তাদেরকে উত্তম ও উপযুক্ত সময় দেখে রওনা করানোর প্রস্তুতি নিন। তাদের সাথে শামের অধিবাসীদের থেকে এমন কাউকে পাঠাবেন, যে খুব বিশ্বস্ত, নেককার ও আমানতদার। সাথে কিছু অশ্বারোহী ও খাদেমও পাঠাবেন, যারা তাদের সকলকে নিরাপদে মদিনায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। এরপর সে সকলের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করল, যেখানে সবধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস উপস্থিত ছিল। আর হজরত যাইনুল আবেদিনও তাদের সাথে থাকলেন। তারা যখন ইয়াজিদের ঘরে গেলেন তখন মুয়াবিয়া-পরিবারের এমন কোনো নারী ছিল না, যে অঝোরধারায় কাঁদেনি। তারা সেখানে তিনদিন অবস্থান করলেন। ইয়াজিদ তার সকাল-সন্ধ্যার খাবারে হজরত আলি ইবনে হুসাইন (যাইনুল আবেদিন) কে অবশ্যই ডাকতেন।[৯৪]

এরপর তারা যখন সকলেই মদিনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন তখন হজরত আলি ইবনে হুসাইনকে ডেকে বলল, ইবনে মারজানা (উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ)-এর উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। আল্লাহর শপথ, হজরত হুসাইন রা. যদি আমার কাছে আসতেন তাহলে তিনি আমাকে যাই বলতেন আমি তা মাথা পেতে মেনে নিতাম। তাকে

---

[৯৩] আল-মিহান : ১৩৪, ১৩৫

[৯৪] তারিখুত তাবারি : ৫/২৬২

যথাসম্ভব নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করতাম। সেজন্য যদি আমার কোনো সন্তানও নিহত হতো তাহলেও তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত তাই ছিল, যা আপনি দেখছেন। আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে, আমাকে শুধু লিখে পাঠিয়ে দেবেন।[৯৫]

ইয়াজিদ বনু হাশেমের প্রত্যেক সদস্যকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করল, যুদ্ধের সময় কি আপনাদের কিছু হারিয়েছে?

তখন যারা যা হারানোর কথা বলেছিলেন ইয়াজিদ তাদের প্রত্যেককেই দ্বিগুণ করে দিয়ে দিলো।[৯৬]

ইয়াজিদ বনু হাশেমের কাফেলাকে মদিনায় নিরাপদে পৌঁছানোর জন্যও খুব বিশ্বস্ত এক ব্যক্তিকে নির্ধারণ করল। তাকে সকলের সাথে উত্তম আচরণের অসিয়ত করল। এরপর তারা সেখান থেকে মদিনার উদ্দেশে বের হয়ে গেলো। সে তাদেরকে নিয়ে রাতে সফর করতো এবং সামনে বাড়তো, যাতে একমুহূর্তের জন্যও কেউ দৃষ্টির আড়াল না হয়ে যায়। যখন তারা কোথাও নামতেন তখন খাদেমরা কিছুটা দূরে অবস্থান করতো এবং তাদের আশপাশে থেকে পাহারা দিতো। তাদেরকে নিয়ে এমন স্থানে দাঁড়াতো, যেখানে অজু ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের সুব্যবস্থা আছে। সকলেই তাদের প্রয়োজনের দিকে খুব খেয়াল রেখে পথ চলতে চলতে অবশেষে মদিনায় এসে পৌঁছলেন। তাদের এমন সুন্দর আচরণের কারণে হজরত ফাতেমা বিনতে আলি কাফেলাপ্রধানকে তার গয়নাগাটি খুলে দিয়ে দিলেন আর বললেন, তেমন কিছু আপনাকে উপহার দিতে পারছি না বলে ওজর প্রকাশ করছি। উত্তরে কাফেলাপ্রধান বলল, যদি শুধুই দুনিয়ার কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই উত্তম ব্যবহার হতো, তা হলে এই অলংকারের চেয়েও স্বল্প মূল্যের কোনো জিনিস আমাকে খুশি করবার জন্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আমি শুধু আল্লাহর জন্য এবং তার রাসুলের আত্মীয়তার কারণে এমনটা করেছি।[৯৭]

---

[৯৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৬৩

[৯৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৬৪

[৯৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৬২, ৪৬৩

যদি নবীজি জিজ্ঞেস করেন তাহলে কী উত্তর দেবে?

এই কাফেলা যখন মদিনায় প্রবেশ করল তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অনেকেই এলো। তাদের মধ্যে হজরত যায়নাব বিনতে আকিলও ছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে এই পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করছিলেন, (অর্থ) হে লোকসকল, তখন তোমরা কী উত্তর দেবে, যদি পয়গাম্বর সা. তোমাদেরকে জিজ্ঞাস করেন যে, আখেরি উম্মত হয়ে তোমরা এ কী করলে? আমার পর আমার সন্তান ও পরিবারের সাথে কেমন আচরণ করেছো, যখন তাদের মধ্য থেকে কেউ বন্দি হয়েছে, কেউ শহিদ হয়ে ধুলো-মাটিতে গড়াগড়ি করেছে? আমি তোমাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছি, তার প্রতিদান তো এই ছিল না যে, আমার পর আমার আত্মীয়দের সাথে অপ্রত্যাশিত বা মন্দ কোনো আচরণ করবে![৯৮]

হজরত আবুল আসআদ দুওয়ালির (মৃত্যু : ৬৯ হিজরি) কাছে যখন এই পঙ্‌ক্তিগুলো পৌঁছল তখন তিনি বললেন, আমরা এটাই বলবো যে, হে আমাদের রব, আমরা নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা এবং দয়া না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।[৯৯]

---

[৯৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৯০ আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/১২৫

[৯৯] সুরা আ'রাফ, আয়াত ২৩

কারবালার দুর্ঘটনার দায় কার?

সবশেষে এই প্রশ্নটা থেকেই যায় যে, কারবালায় যেই দুর্ঘটনা ঘটলো এর দায়িত্ব আসলে কার? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার মাত্র ৫০ বছরের মাথায় তার বংশধরদের রক্তরঞ্জিত করল কে?

কারবালার ঘটনা নেড়েচেড়ে দেখলে যা বুঝা যায়, আসলে কোনো একক ব্যক্তির উপর এর দায় চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে একাধিক দল ও ব্যক্তি। এর মধ্য থেকে কারো ষড়যন্ত্র, কারো অজ্ঞতা, কারো হিংসা এবং কারো প্রতিশোধস্পৃহা মূলত বিষয়টিকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে যে, আপন নবীর সন্তানদের রক্তেই রঞ্জিত হয়েছে উম্মতের হাত। সামনে আমরা সেই দায়ী দল ও ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করব।

কুফার অধিবাসী

যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে কারবালার দুর্ঘটনার গোড়ায় রয়েছে কুফার অধিবাসীরা, যারা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে অসংখ্যবার ওয়াদা করে আহ্বান করেছে এবং পরবর্তীতে ধোঁকা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলেমদের আলোচনা ঘাঁটলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের যত ক্রোধ, সব ওই কুফাবাসীদের প্রতিই–

হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে যখন হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বললেন, আল্লাহ যেন সেসব লোককে ধ্বংস করে দেন, যারা হজরত হুসাইনকে ধোঁকা দিয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।[১০০]

---

[১০০] ফাযাইলুস সাহাবা লি আহমাদ ইবনে হামবল : ১৩৯২ আল মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/১০৮

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একবার ইরাকিরা ইহরাম অবস্থায় মশা মারার বিধান জানতে চাইলে তিনি উপস্থিত সকলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, দেখো দেখো এদের অবস্থা! আমাকে মশা মারার মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে; অথচ এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের হত্যা করেছে! আমি নিজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এই দুজন (হাসান ও হুসাইন) দুনিয়াতে আমার দুইটি ফুল।[১০১]

যুদ্ধ চলাকালীন উচ্চারিত হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই বাণীটিও বিশেষ চিন্তার দাবিদার যে, "হে আল্লাহ, তুমিই তাদের এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে দাও। এই এরাই আমাদেরকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আহ্বান করেছে; কিন্তু এখন তারাই আমাদের হত্যা করছে।"[১০২]

এই বাক্যের উদ্দেশ্য কখনো উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, আমর ইবনে সা'দ প্রমুখ হতে পারে না। কারণ তারা কখনোই হজরত হুসাইন রা. কে আহ্বান করেনি। সুতরাং তার স্বচ্ছ ইঙ্গিত হলো কুফার সেনাপতি এবং সৈন্যদের মধ্যে হজরত আলি-ভক্ত শিয়াদের এমন কিছু লোক, যারা হজরত হুসাইন রা. কে চিঠি লিখেছিল; কিন্তু এখন ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধেই তলোয়ার হাতে নিয়েছে।

আলি-ভক্ত শিয়াদের মধ্যে যারা হুসাইন রা. এর হত্যায় শরিক ছিল

ঐতিহাসিক-বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, আলি-ভক্ত শিয়ারা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে শরিক ছিল।

১. আমর ইবনে হাজ্জাজ : এ হচ্ছে সেই লোক, যে হানি বিন উরওয়ার গ্রেফতারের সময় প্রাসাদের দরজায় গিয়ে আক্রমণ করেছিল।[১০৩] এই আমর ইবনে হাজ্জাজই কারবালায় ইবনে জিয়াদের সৈন্যদের মধ্যে শামিল ছিল এবং চিৎকার করে বলছিল, হে লোকসকল, এই লোকটাকে (হজরত হুসাইন রা.) হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করো না।

---

[১০১] সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৩ কিতাবুল আদাব

[১০২] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৯

[১০৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৬৭

কারণ সে দীনধর্ম ছেড়ে দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে।”[১০৪]

২. শাম্মার বিন যিল জাওশান : সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিল এবং সেই যুদ্ধে সে কিছুটা আহতও হয়েছিল।[১০৫] পরবর্তীতে সে ইবনে জিয়াদের সৈন্যদের নায়েব হয়েছিল। এই লোকই হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিল।[১০৬]

৩. আবদুল্লাহ ইবনে জহির ইবনে সালিম : কুফার সৈন্যদের একটা অংশ ছিল তার নেতৃত্বে।[১০৭] সে ছিল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু মিখনাফের নানার বাবা।[১০৮]

৪. কায়েস ইবনুল আশআস : সেনাবাহিনীর একটি অংশ ছিল তার অধীনে।[১০৯] তার পিতা হজরত আশআস ইবনে কায়েস রা. সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেনাপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন।[১১০]

৫. সিনান ইবনে আনাস নাখায়ি : সে শাম্মারের আদেশে বর্শা নিক্ষেপ করেছিল। আর সে ছিল নাখাআ গোত্রের লোক, যাদের ভেতর শিয়ানে আলির প্রাধান্য ছিল।

৬. খাওলা বিন ইয়াজিদ আলআসবাহী : সে-ই হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা শরীর থেকে আলাদা করেছিল।[১১১] হিময়ার

---

[১০৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৩৫

[১০৫] তারিখুত তাবারি : ৫/২৮; আলআ'লাম লিযযিরিকলি : ৩/১৭৫

[১০৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৫৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/৪৬

[১০৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৪২২

[১০৮] তাহযিবুল কামাল : ১৩/২১৯

[১০৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৪২২

[১১০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৪০

[১১১] হজরত হুসাইন রা.-এর রক্তে সিনান এবং খাওলার হাত রঞ্জিত হওয়ার বিষয়টা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং বিশুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত-আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/১৭; মাজমাউয যাওয়াইদ : ৫১৪৪; সিনান হজরত হুসাইন রা. কে শহিদ করে তার মাথা হাতে নিয়ে ইবনে যিয়াদের দরবারে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসছিল- 'আমাকে দাও ভরে দাও সোনা-চাঁদি-রুপা...।' আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ১১৭৩; অবশ্য এই দুজনের শিয়া হওয়ার ব্যাপারে তেমন শক্ত কোনো মত পাওয়া যায় না। সিনানকে নাখায়ি হওয়ার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, সে আসলে শিয়ানে আলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঠিক

গোত্রের সাথে তার বেশ সখ্য ছিল। যারা মূলত ইয়েমেনের গোত্রভুক্ত ছিল এবং সেখান থেকেই আবদুল্লাহ ইবনে সাবার জন্ম হয়েছিল এবং শিয়া ধর্মমতের আধিক্য ছিল।

এখন এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে, এরা কেন হজরত হুসাইন রা. কে হত্যার ইচ্ছা করেছিল? তারা তো চাইলে হজরত হুসাইন রা. এবং তার পরিবারকে আহত করে বেঁধে কুফায় নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তাকে হত্যা করে তাদের কী লাভ হলো? যদি চিন্তা করা হয় তাহলে মনে হয়, আসলে তাদের ভেতরে ভয় কাজ করছিল। যদি হজরত হুসাইন রা. জীবিত থাকেন তাহলে সকল রহস্য আবার ফাঁস না হয়ে যায়! কারণ তাদের লিখিত চিঠিও হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিল। যদি এই চিঠি ইবনে জিয়াদের কাছে পৌঁছে যেত তাহলে তাদের বেঁচে থাকা অনেক কঠিন হয়ে পড়তো। তাদেরকে অনেক কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো। সম্ভবত সেজন্য তাদের ইচ্ছা ছিল যে, মারধর ও হত্যা করে সেই চিঠিগুলো নষ্ট করে দেবে। এমনটাই করেছিল তারা। সে-কারণেই ইতিহাসে এমন কোনো বর্ণনা নেই, যেখানে যুদ্ধশেষে সেই চিঠিগুলি সামনে আসার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করা হয়। এমনিভাবে হজরত হুসাইন রা. কে ডেকে এনে ধোঁকা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট থাকেনি। তাই ফেতনাবাজরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্তি পেয়ে যায় এবং হজরত হুসাইন রা. ও তার পরিবারের লোকদের ধোঁকা দিয়ে শহিদ করে দেয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তেমনই খাওলা বিন ইয়াজিদের গোত্র হিময়ারের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, সেও শিয়ানে আলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ এই উভয় গোত্রেই শিয়াধর্মাবলম্বীদের প্রভাব অনেক বেশি ছিল। জরুরি নোট : সৈন্যদের সাথে শামিল হওয়া এই শিয়াদের নাম স্বয়ং শিয়া ধর্মাবলম্বী একাধিক ঐতিহাসিক বলেছেন। আমরা এখানকার সবক'টি নাম আবু মিখনাফের বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছি, যা তারিখুত তাবারিতেও বর্ণিত হয়েছে। (শাবাস ইবনে রিবয়িকে) ... আবু মিখনাফ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে ধরেছেন। (ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ এই লোক থেকে একটি একটি করে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। জরাহ এবং তাদিলের ইমামগণ সেগুলোকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়াও শিয়াদের লিখিত কিতাব, উদাহরণস্বরূপ: জালাউল উয়ুন এবং ইহতিজাজে তাবারিতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখন যদি সেখানে এমন কারো নাম থাকে, যাকে আমাদের জরাহ-তাদিলের ইমামগণ সিকাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন তাহলে বুঝতে হবে তার প্রতি হজরত হুসাইন রা.-এর হত্যার অভিযোগ শিয়ারা ইচ্ছাকৃতভাবে বানিয়ে বলেছে।

আমর ইবনে সা'দ

আমর ইবনে সা'দকেও কারবালার ঘটনার দায়ভার বহন থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না।[১১২] কারণ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর হামলা এবং সৈন্যদের নেতৃত্ব তার হাতেই হয়েছিল। যদিও শুরুর দিকে সে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ধমকি এবং গভর্নর বানানোর স্বপ্ন তাকে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে ফেলে। সম্ভবত সে মনে করেছিল বিষয়টি রক্তপাত পর্যন্ত না গড়িয়ে সমাধান করে ফেলবে। আবু মিখনাফের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আমর ইবনে সা'দ শেষ পর্যন্ত রক্তপাত ঘটানোর বিপক্ষেই ছিল এবং এর সহজ সমাধান খুঁজছিল।[১১৩] সে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব মেনে ইবনে জিয়াদের কাছে এই চিঠিও লিখেছিল যে, "আল্লাহ তায়ালা আগুনের লাভা নির্বাপিত করে দিয়েছেন। মতানৈক্য দূর করে দিয়েছেন এবং উম্মতের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।" তখন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তার এ কথা মেনেও নিয়েছিল; কিন্তু শাম্মারের

---

[১১২] তার নাম হলো আমর ইবনে সাঈদ। তার পিতা প্রখ্যাত সাহাবি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন। আমর ইবনে সা'দের জন্ম হয়েছিল ২৪ হিজরিতে। ... তিনি তার পিতা থেকে বেশকিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকেও অন্যরা হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে ছিল হুসাইন রা.-এর হত্যাকারীদের একজন। ...কিন্তু অধিকাংশই তাকে কারবালায় অংশগ্রহণের কারণে গাইরে সিকাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। একবার ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান তার থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করলে এক লোক দাঁড়িয়ে তাকে বলল-আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না! আমর ইবনে সা'দ থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন? একথা শুনে তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আমি আর কখনোই তার থেকে হাদিস বর্ণনা করব না। তাহযিবুল কামাল : ২১/৩৫৭, ৩৫৮

ইবনে আবি খাইসামা বলেন- ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. কে একবার আমি জিজ্ঞাস করলাম- আমর ইবনে সা'দ কি সিকাহ? তিনি বললেন, এটা কীভাবে হতে পারে, যে হজরত হুসাইন রা. কে হত্যা করেছে সে সিকাহ! আততারিখুল কাবির, ইবনে আবি খাইসামা, আসসাফারুস সানি : ২/৯৪৫

অনেকেই আমর ইবনে সা'দ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রা. কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন- তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করা উচিত নয়। কারণ সে ছিল হত্যাকারী দলের নেতা এবং রক্তপাতকারী। তা ছাড়া সে ছিল হজরত হুসাইন রা.-এর হত্যাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের একজন। আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খিলাল, ইবনে কুদামা আল মুকাদ্দাসি, ২৩৭

[১১৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৪১০-৪১২

বোঝানোর কারণে পুনরায় যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেলো।[১১৪] আবু মিখনাফের বর্ণনায় আছে, আমর ইবনে সা'দ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কারণে এতো বেশি কষ্ট পেয়েছিল যে, কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে উঠল।[১১৫] মোটকথা, আমর ইবনে সা'দ আসলে এ কাজ খুশিমনে করেনি। কিন্তু এরপরও তো সে সেখানে শরিক ছিল বরং আক্রমণ এবং সৈন্যদের নেতৃত্বও তো তার হাতেই ছিল। তাই বলে শুধু তার উপর হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার সব ভার চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না।

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ব্যাপারে অনেক শুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সে আসলে হজরত হুসাইন রা. কে বিদ্রোহী মনে করতো এবং কোনো প্রকার খেয়াল ও সুযোগের প্রতি লক্ষ না করে তার বিরুদ্ধে হামলা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল।[১১৬] হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত মাথা দেখেও তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হয়নি; বরং তার ভেতরের অবস্থা তখন এমন ছিল, যেন এটি নিত্যকার কোনো স্বাভাবিক ঘটনা। তাই তাকেই আমরা সেই দুঃখজনক ঘটনার মূল হোতা হিসেবে ধরতে পারি। এখানটায় এসে এই প্রশ্নও জাগে যে, যদি ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা. কে হত্যার নির্দেশ বা ইঙ্গিত না দিতো তাহলে ইবনে জিয়াদ বা আমর ইবনে সা'দ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এমন ব্যক্তিত্বের হত্যার সাহস করল কীভাবে? অন্তত ইবনে জিয়াদ তো একথা ভালো করেই জানতো যে, তার এমন পদক্ষেপের কারণে প্রশাসন খুশি হবে, না অসন্তুষ্ট হবে। সে কি ইচ্ছা করেই ইয়াজিদের অসন্তুষ্টিকে নিজের জন্য টেনে আনবে? যদি ভালোভাবে পূর্বাপর চিন্তা করা হয় তাহলে একথা পরিষ্কার যে, ইবনে জিয়াদের জানা ছিল তার এই সিদ্ধান্তের কারণে ইয়াজিদ সামান্য কষ্টও পাবে না। কারণ ইয়াজিদ নুমান ইবনে বাশির রা.

---

[১১৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৪১৪

[১১৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৫২

[১১৬] উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর ভাতিজা এবং হজরত আবু সুফিয়ান রা.-এর নাতি ছিল। হজরত মুয়াবিয়া ৫৫ হিজরিতে যখন তার বয়স ২২ বছর ছিল তখন তাকে বসরার বিচারক বানিয়েছিলেন। তুর্কিস্তানেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজেও তার ভূমিকা ছিল অনেক। তার মা মারজানা ইরানি বংশোদ্ভূত ছিলেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৫৪৫

কে অপসারণ করে ইবনে জিয়াদকে নিয়োগ করেছিল একারণেই যে, ইয়াজিদের ধারণায় হজরত নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর নম্রতার কারণে ইরাকের অধিবাসীদেরকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা যাবে না। সুতরাং ইবনে জিয়াদের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য এ ছাড়া কী হবে যে, কুফা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইয়াজিদের ঠিকঠাক শক্ত-সমর্থ একজন গভর্নর প্রয়োজন। সেজন্য ইবনে জিয়াদ পরবর্তীতে তেমন কঠোরতাই প্রকাশ করল যেমন করাটা ছিল ইয়াজিদের চাওয়া, যেন তার ক্ষমতা টিকে থাকে এবং আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, ইয়াজিদ তাকে এমন সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল, যার জন্য ইবনে জিয়াদ এসব করার দুঃসাহস পেয়েছে এবং সেখান থেকে ফিরে আসাও ছিল অনেকটা অসম্ভব। ইবনে জিয়াদের ধারণা অনুযায়ী রাজধানীতে বসে তার ভুল শুধরাতে যাওয়া বিদ্রোহের নামান্তর। সেকারণে তাকে হত্যা করাও বৈধ। অবশ্য ইবনে জিয়াদের জুলুম-অন্যায় পদক্ষেপ দেখে ইয়াজিদ খুশি প্রকাশ করেনি। বরং বলেছে, ইবনে জিয়াদ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা খুব দ্রুতই নিয়ে ফেলেছে এবং হত্যা করেছে। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন।[১১৭]

কারবালার ঘটনা এবং ইয়াজিদের কীর্তি

প্রসিদ্ধ এটাই যে, ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা. কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল অর্থাৎ উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে ইয়াজিদই আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু কোনো বর্ণনায় স্পষ্টভাবে একথা নেই যে, হত্যার নির্দেশটা ইয়াজিদ দিয়েছিল। প্রমাণ যতটুকু পাওয়া যায় তা হলো, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিজের ইচ্ছাতেই তা করেছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, সকল বর্ণনাকারী এব্যাপারে একমত যে, ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা. কে হত্যার নির্দেশ দেয়নি।[১১৮]

ইবনে সালাহ বলেছেন, আমাদের কাছে এই কথা সঠিক মনে হয় না যে, ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা. কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। প্রসিদ্ধ কথা হলো- হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে এই যুদ্ধের নির্দেশই

---

[১১৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৪২৫

[১১৮] মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৫৫৭

তার শাহাদাতের কারণ হয়েছিল, যা দিয়েছিল ইরাকের গভর্নর ইবনে জিয়াদ।[১১৯]

তাই বলে একথা থেকে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কারবালার ঘটনা থেকে ইয়াজিদ পূর্ণরূপে মুক্ত ও সম্পর্কহীন। যদি দুনিয়ার কোনো আদালতে কারবালায় নিহতদের নিয়ে কোনো মামলা দায়ের করা হতো তাহলে প্রমাণের অভাবে ইয়াজিদ মুক্তি পেয়ে যেতো ঠিকই; কিন্তু চারিত্রিক দিক বিবেচনায় এবং প্রচলিত সমাজনীতিতে সাধারণ মানুষের আদালতে সে কখনোই মুক্তি পেতো না (আর আখেরাতের ফয়সালার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই জানেন)। যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে, ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা. কে হত্যা করতে চায়নি তাহলে একথা মানতে হবে যে, ইয়াজিদ জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং অপরিপক্ব ছিল। কারণ সে এই পুরো ব্যাপারটায় খুবই বড় বড় ভুল করেছে। যদি ইয়াজিদ উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় এই নির্দেশ দিতো যে, বনু হাশেমের সকলকে সসম্মানে দামেশক পাঠিয়ে দেবে, তাহলে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এমন ঘটনা ঘটার পরিবেশ সৃষ্টি হতো না। কারণ ইবনে জিয়াদ শাসকের প্রতি খুব বিশ্বস্ত ছিল। সে জেনে-বুঝে ইয়াজিদের নির্দেশ উপেক্ষা করতো না।

একজন শাসককে দেশের সব ভালো-খারাপের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হিসেবে ধরা হয়। যদিও আইনের দৃষ্টিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বা এলাকায় কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে শাসককে ফাঁসি দেওয়া হয় না। কিংবা কারো আমলের সাওয়াব শাসক পেয়ে যায় না; কিন্তু যখন দেশের লোকজনের জীবন ও ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতেই থাকে, তখন সেজন্য শাসককেই দায়ী করা হয় এবং এটা অনৈতিকও কিছু নয়। কারণ একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকও নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করতে থাকবে। আর আখেরাতে জবাবের ভয়ে কাঁপতে থাকবে এবং বলবে যদি ফুরাত নদীর তীরে কোনো উটও পিপাসার্ত হয়ে মারা যায় তাহলে তার দায় আমার উপরই বর্তাবে।

---

[১১৯] ফাতাওয়ায়ে ইবনে সালাহ : ২১৬

ইয়াজিদ সেই ঘটনার সময়কালেও মজবুত অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল। মুসলমানগণ তাকে সে হিসেবেই শাসক মেনে নিয়েছিল; কিন্তু ইয়াজিদ দুঃখজনকভাবে এই ভয়ংকর ঘটনার জন্য শুধু একটু শোকপ্রকাশ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে একটু তিরস্কার ও গালমন্দ ছাড়া কিছুই করেনি। যদি মেনে নেওয়া হয় উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের উপর অপরাধ এজন্য চাপিয়ে দেওয়া যায়নি যে, সে মূলত দেশ ও শাসকের কল্যাণ ভেবে একজন আপাত-বিদ্রোহীকে আটকাচ্ছিল। সেইসাথে যদি এদিক থেকেও দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হয় যে, বিষয়টা নবীজির নাতি হজরত হুসাইন রা. কে নিয়ে ছিল, তাহলেও এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, বিদ্রোহীদের সাথে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেই আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সরকারিভাবেও যে নিয়ম-নীতি প্রচলিত আছে, সেগুলোর প্রতি কি সামান্যও ভ্রুক্ষেপ করা হয়েছিল? সামান্যও করা হয়নি। কারণ হজরত হুসাইন রা. সমঝোতায় রাজি ছিলেন। তার এ প্রস্তাব শুনে সেনা-অফিসার হুর বিন ইয়াজিদ চিৎকার করে বলেছিল, "তোমরা কি হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব গ্রহণ করবে না? আল্লাহর শপথ, তুর্কি কিংবা দায়লামির কাফেররাও যদি তোমাদেরকে এই প্রস্তাব দিতো তাহলেও তোমাদের জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হতো না।" কিন্তু তার সাথে এমনই করা হলো, যা কাফেরদের সাথেও করা বৈধ ছিল না। সুতরাং কারবালাতে যা যা হয়েছে, তা স্পষ্ট জুলুম ও অন্যায় ছিল, শরিয়তে যার কোনো সুযোগই নেই। এমন অপরাধীকে কিছু না করলেও অন্তত ক্ষমতা থেকে অবশ্যই অপসারণ করা উচিত ছিল, যেন মজলুমদের আত্মীয়স্বজন এবং শোকে-কষ্টে নির্বাক সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পায় এবং জালেমেরও শিক্ষা হয়। কিন্তু সত্য হলো, ইয়াজিদ এতটুকুও করেনি।

এতকিছুর পরেও ইয়াজিদের প্রতি মানুষের যেই ঘৃণা জন্মেছিল তা খুব কমই ছিল। কারণ সাধারণ মানুষ এটাই মনে করেছিল যে, সে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতে সন্তুষ্ট। একারণেই ইসলামি দেশগুলোতে বনু উমাইয়া খলিফাদের প্রতি চরম ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনগণ বারবার তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসছিল। ইয়াজিদ নিজেও এই ঘটনার পরিণতিতে এমন অসন্তোষের শিকার হয়েছিল, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ছিল অসম্ভব।

এই সমস্যার সমাধান কী?

এতক্ষণের আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, উভয়ের মাঝে রাজনৈতিক বৈপরীত্য বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশাসনের যেই ভুল বুঝ ছিল, তার সমাধান কেবল সামনা-সামনি কথা বলার দ্বারাই সম্ভব ছিল। হজরত হুসাইন রা. নিজেও যখন কারবালায় দেখলেন সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে পূর্ণ ব্যাপারটাই গুলিয়ে গেছে তখন তিনি ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়াজিদ নিজেও সবশেষ হয়ে যাওয়ার পর বারবার এই আফসোস প্রকাশ করেছে, হায়! যদি আমি আগেই হজরত হুসাইন রা. কে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আলোচনা করতাম এবং তার চাওয়া মেনে নিতাম! ইয়াজিদ যদি সত্যিই হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান বোঝা ও তার কথা শোনার জন্য আদব ও সম্মানের সাথে নিজের কাছে ডেকে নিতো অথবা তার সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য সে নিজেই হিজাজ সফর করতো এবং হৃদয় প্রশস্ত করে কাজ করতো তাহলে এই সমস্যাটা সমাধানের শতভাগ সম্ভাবনা ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা.-এরও আমল এমনই ছিল। কোনো সমস্যা হলে তিনি নিজেই গিয়ে সামনা-সামনি কথা বলতেন কিংবা কাউকে তার পক্ষ থেকে পাঠাতেন। অথবা তাকে সসম্মানে ডেকে নিতেন। কিন্তু ইয়াজিদ এটুকুও করতে পারেনি। পরবর্তীতে ইয়াজিদ লজ্জিত হয়ে বলতো, "আমার কী এমন হয়ে যেতো, যদি আমি কিছু কষ্ট সহ্য করে নিতাম এবং হজরত হুসাইন রা. কে নিজের ঘরেই থাকতে দিতাম। আর তিনি যা বলতেন, তাকে তার উপরই ছেড়ে দিতাম তাহলে এটাই ভালো হতো। তা ছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান এবং তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনের দাবিও এটাই ছিল। হয়তো তাতে আমার ক্ষমতা ও রাজত্ব কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়তো। কিন্তু তাতে তেমন কী হতো! আল্লাহ যেন ইবনে মারজানা (উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ)-এর উপর লানত বর্ষণ করেন। কারণ সে হজরত হুসাইন রা. কে লড়াই করতে বাধ্য করেছে। অথচ হজরত হুসাইন তার কাছে সমঝোতার প্রস্তাবও পেশ করেছিল। সে যদি তাকে ছেড়ে দিতো তাহলে তিনি তার পূর্ব পথ ধরেই চলে যেতেন। কিন্তু ইবনে জিয়াদ সেই সুযোগটুকু তাকে দেয়নি। অথবা তিনি নিজের হাত আমার হাতে রাখতে চাচ্ছিলেন ইবনে জিয়াদ তাও উপেক্ষা করল। তিনি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ইবনে

জিয়াদ সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল। শেষপর্যন্ত তাকে হত্যাই করে ফেলল। সে তাকে হত্যা করে মুসলমানদের কাছে আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করল। মুসলমানদের মনে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বুনে দিলো। এখন তো ভালো-খারাপ সকলেই আমাকে ঘৃণা করছে। কারণ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত মানুষের কাছে অনেক কষ্টের ছিল। ইবনে জিয়াদের সাথে তো আমার কোনো শত্রুতা ছিল না। আল্লাহ তায়ালাই যেন তার উপর লানত বর্ষণ করেন এবং গজব নাজিল করেন।"[১২০]

মোটকথা, ইয়াজিদের এই আফসোস ও অনুশোচনা তার ভেতরেই রয়ে গেলো। সে ইবনে জিয়াদ, আমর ইবনে সা'দ, শাম্মারসহ অনেকের বিরুদ্ধে কিছুই করার সাহস করল না। বরং ভেতরে ভেতরেই সেই আফসোস পুষতে থাকল।[১২১] তাই বলে এই অনুশোচনা তাকে মুক্তি দিতে পারল না। বরং এরপর থেকে একের পর এক সে অমার্জনীয় সব অন্যায় করে যাচ্ছিল। মদিনা ও মক্কায় সৈন্য নিয়োগ করল। সেই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে সৈন্যরা যা যা করল তাতে ইয়াজিদের বদনাম আরো বেড়ে গেলো এবং দিন দিন তা বোরাকগতিতে বাড়তে থাকল।

---

[১২০] তারিখুত তাবারি : ৫/৫০৬

[১২১] ইয়াজিদের অবস্থা তখন এমন ছিল যে, সে একজন সামর্থ্যবান যুবক ও শক্তিধর শাসক হওয়া সত্ত্বেও দামেশক এবং নিজের অবস্থানস্থল হাওয়ারিন ছাড়া কোথাও বের হতে পারছিল না। না কখনো হজ ও উমরার জন্য সফর করেছে আর না জিহাদের উদ্দেশ্যে কখনো বাইরে গিয়েছে। জনসাধারণের সাথে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। দরবারের লোকদের ছাড়া তার সাথে আরো কারোরই তেমন ভালো সম্পর্ক ছিল না। এসব মূলত আরামপ্রিয় ও সুযোগসন্ধানী শাসকদের অভিনয়।

কারবালার ঘটনা... ইতিহাসের শিক্ষা

আমাদের আকিদা-বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শক্তি ও ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। সবকিছুই তার একক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়। কোনো কিছুই তার আদেশ ছাড়া হয় না আর তার আদেশে কোনো না কোনো কল্যাণ অবশ্যই থাকে। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনায় যখন আমাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তখনও ভাগ্যের উপর বিশ্বাস আমাদের ধৈর্য ধরতে শেখায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পেছন পর্দায় আসলে কী হেকমত ছিল? আল্লাহ তায়ালাই তা সবচেয়ে ভালো জানেন। আমাদের মতো দুর্বলদের দ্বারা সেসবের কাছেধারেও যাওয়া সম্ভব নয়। তবে বহু ভেবেচিন্তে আমাদের কাছে সেই ঘটনার কিছু হেকমত ধরা দেয় :

১. আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, দুর্বল ঈমানের অধিকারীগণ হজরত হুসাইন রা. এবং তার পরিবার-পরিজনকে মনুষ্য-স্বভাবের ঊর্ধ্বে ধারণা করতে শুরু করেছিল। তাদেরকে অদৃশ্য জান্তা, প্রয়োজন পূরণকারী এবং সমস্যা সমাধানকারী বলে মনে করছিল। কারবালার ঘটনার পর যারা সত্যান্বেষী তাদের চোখ খোলার মতো একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ সামনে এসে গেলো। যদি হজরত হুসাইন রা. আসলেই অদৃশ্যের বিষয়াবলি জানতেন তাহলে তিনি কুফার পথ ধরতেন না। যদি তিনি আসলেই সকল সমস্যা সমাধানকারীই হতেন তাহলে তিনি এমন মজলুম অবস্থায় শহিদ হতেন না। বরং সামান্য এক ইশারায় সকল অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে পারতেন।

২. এই ঘটনা মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত ও ফয়সালার উপর রাজি ও সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেয়। আল্লাহ এমন না করুক, যেকোনো সময় যেকারো উপর মারাত্মক বিপদ আসতে পারে, ব্যর্থতা বারবার আঁচল আঁকড়ে ধরতে পারে, ঋণও বোরাকগতিতে বেড়ে যেতে পারে, বাড়িঘরে আগুন লেগে যেতে পারে, নিজের খুব কাছের

কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হতে পারে, অসুস্থতা পিছু ধাওয়া করতে পারে মোটকথা এমন যেকোনো বিপদ যে-কারো উপর যখন-তখন আসতে পারে। কিন্তু তাই বলে সাহস হারালে চলবে না। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মানুষকে যখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে শহিদ হতে হয়েছে, তাহলে আমরা কোন ছার!

৩. রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে অনেক দিকের সম্ভাবনা থাকে। বান্দা শরিয়তের সীমায় থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পদস্খলন হয়ে যেতে পারে। অসংখ্য মানুষের হক আদায়ের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। পদে-পদে ভুলের কারণে আল্লাহ তায়ালার কাছে পাকড়াও হবার আশংকা থাকে। এমন শাসক খুব কমই আছে, যারা নিজেদেরকে অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। বদনামের আশংকা তো থাকেই। শাসক বা বিচারকগণ বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিক পথে চললেও কখনো কখনো সাধারণ জনগণ তা বুঝতে পারে না। ফলে দুর্নাম ছড়াতে থাকে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল যে, সাইয়েদগণ সবসময় সম্মানিত এবং প্রিয় থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি বাকি থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ সাইয়েদকেই রাজনৈতিক অরাজকতার সময় পৃথক করে দিলেন।

৪. সাইয়েদদের থেকে উম্মতকে ইলমি ও আত্মিকভাবে তরবিয়তের জন্য আল্লাহ তায়ালা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরে বনি ফাতেমার বেশ ক'জন বুজুর্গকে বের করলেন এবং তাদেরকে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখলেন। ফলে ধীরে ধীরে তারা পূর্ণ ইলম ও আধ্যাত্মিক তরবিয়তের কাজে মশগুল হয়ে গেলেন, যা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর ইরশাদ

এখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা স্মরণযোগ্য– বনু হাশেমের মাধ্যমেই এই দীনের সূচনা হয়েছিল এবং বনু হাশেমের হুকুমতের উপরই তা শেষ হবে। (যেমন হাদিসে নবীজি ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা

করেছেন) সুতরাং তোমরা যখন দেখবে যে, বনু হাশেম পুনরায় নেতৃত্বে এসে গেছেন, বুঝবে সময় শেষ হয়ে এসেছে[১২২] (কেয়ামত চলে এসেছে)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর সত্য উচ্চারণ এবং ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি

অধিকাংশ সাহাবি সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে মানুষকে সঠিক বিষয় জানিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে রাসুলের হাদিসের আলোকে সঠিক বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করাই উত্তম মনে করেছেন। সেই সাথে উত্তম মনে করেছেন যে, এই রকম অবস্থায় রাসুলের শিক্ষা কী, লোকদের তা জানিয়ে দেবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন এই মহান সাহাবি-কাফেলারই একজন। তিনি শামে থাকতেন এবং নিজ মহল্লার মসজিদে হাদিসের দরস দিতেন। কখনো কখনো দরস চলাকালীন আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন শাসকদের অপতৎপরতার কথাও বলতেন। একবার তিনি বললেন, কেয়ামতের একটি আলামত হলো, মন্দ লোকদের পদোন্নতি দেওয়া হবে এবং ভালো মানুষদের দাবিয়ে রাখা হবে।[১২৩]

ইয়াজিদ তাকে সবসময়ই খুব কড়াভাবে পর্যবেক্ষণ করতো। কিন্তু তিনি হাদিস পড়ানো চালিয়ে যান। একবার তিনি হাদিস শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় ইয়াজিদের একজন সিপাহি এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে গেলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হাদিসের ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, দেখো, সে এই কারণেই এসেছে, যেন আমি নবীজির হাদিস শোনানো বন্ধ করে দিই।[১২৪]

---

[১২২] তারিখে দিমাশক : ১৪/২০৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৯৭; এখানে ক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকলের ঐকমত্যের খেলাফত, যা পুরো মুসলিমবিশ্বকে বেষ্টন করে নেবে। নয়তো বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলে বনু হাশেমের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাগদাদের আব্বাসি খলিফাগণও হাশেমি ছিলেন। এমনিভাবে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের সিংহাসনেও ফাতেমি বংশধর হাশেমি ছিল। ইয়ামানে গত শতক পর্যন্তও বনু হাশেমের রাজত্ব কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

[১২৩] সুনানে দারেমি : ৪৯৩

[১২৪] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুযাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে একজন শায়েখ বর্ণনা করেছেন যে, আমি একদিন শামের এক মসজিদে প্রবেশ করলাম। তারপর

ইয়াজিদের সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

কারবালার ঘটনা ইয়াজিদের শাসনামলকে এমনভাবে কলঙ্কিত করেছে যে, তার সময়কার অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমও মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে। অথচ সেই সময়ও আফ্রিকা, খোরাসান ও তুর্কিস্তানে সামরিক তৎপরতা অব্যাহত ছিল। ওখানকার মিশনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে অধিকাংশ সময় সেই জেনারেলরাই ছিলেন, যারা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগ থেকে ইসলামপ্রচারের এই মহান মিশনে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ, জুনাদা ইবনে উমাইয়া, মুনযির ইবনে জারুদ, সিনান ইবনে সালামা, উকবা ইবনে নাফে, জহির ইবনুল কায়েস, আবুল মুহাজির দিনার উল্লেখযোগ্য ছিলেন। অভ্যন্তরীণভাবে সরকারি সৈন্যরা যেই বাড়াবাড়ি করেছিল তা তো অবশ্যই আপন জায়গায় নিন্দাযোগ্য; কিন্তু বাইরের মিশনগুলোতে খানিক ব্যর্থতা মাঝেমধ্যে দেখা দিলেও বেশকিছু সাফল্যও অর্জন করেছিল। নিম্নে আমরা সেগুলোই উল্লেখ করছি।

ইউরোপে আক্রমণের অবসান

আমির মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে অসিয়ত করেছিলেন যে, সবসময় রোমীয়দের গলা চেপে রাখবে।[১২৫] কিন্তু ইয়াজিদ তার পিতার এই

সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলাম এবং সেখানেই বসে থাকলাম। অতঃপর একজন শায়েখ এসে একটা খুঁটির কাছে নামাজ আদায় করলেন। এরপর যখন চলে গেলেন মানুষ তার থেকে ফিরে এলো। আমি তখন তাদেরকে জিজ্ঞাস করলাম উনি কে? তারা বলল, আবদুল্লাহ ইবনে আমর। এরপর ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার একজন দূত এলে তিনি বললেন, এই লোক নিশ্চয় চায় তোমাদেরকে হাদিস পড়ানো থেকে আমাকে বিরত রাখবে। অথচ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করছি এমন নফস থেকে, যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না; এমন অন্তর থেকে, যা আল্লাহকে ভয় করে না; এমন ইলম থেকে, যা উপকারে আসে না এবং এমন দোয়া থেকে, যা শোনা হয় না। মুসনাদে আহমাদ : ৬২৬১, ৬২৬৫

[১২৫] তারিখে খলিফা : ২৩০

অসিয়ত উপেক্ষা করে রোমীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে বিলম্বিত করল। সে খলিফা হয়ে প্রথম খুতবায় বলেছিল, হজরত মুয়াবিয়া রা. তোমাদেরকে সমুদ্রপথে বিভিন্ন যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করতেন। কিন্তু আমি তেমনটা করব না। তিনি শীতকালেও রোম-সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে রাখতেন। কিন্তু আমি শীতের মৌসুমে সেখানে কাউকে পাঠাবো না।[১২৬]

আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে জুনাদা ইবনে উমাইয়া রা. মুজাহিদদের নিয়ে গ্রিস দ্বীপে শিবির স্থাপন করেছিলেন। দ্বীপটি ৫৩ হিজরিতে বিজিত হয়েছিল। মুসলমানগণ এখানকার অনেক বড় একটি দুর্গে আত্মরক্ষাব্যূহ তৈরি করে রেখেছিল। তারা সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করে ইউরোপের নৌ-সেনাদের ধাওয়া করে পরাজিত করতো। তাদের প্রতিটি নড়াচড়ার প্রতি খেয়াল রাখতো এবং রিজার্ভ ফৌজের অস্ত্রপাতি লুট করতো। সেখানকার মুসলমানগণ অনেক সম্পদশালী ও সামর্থ্যবানও হয়ে উঠেছিল। মুয়াবিয়া রা. সেই দ্বীপকে অনেক গুরুত্ব দিতেন এবং সেখানকার মুজাহিদদের পেছনে অনেক খরচও করতেন। তাদেরকে খাবার, পোশাক, অস্ত্র, টাকাপয়সাসহ সবকিছুই পাঠাতেন।[১২৭] হজরত মুয়াবিয়া রা. তার জীবনের শেষদিকে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা শীতকালটাও সেখানে কাটাবে এবং খোরাকিসহ সমস্ত ব্যবস্থাপনা আগেই করে নিয়ে যাবে। তখন কারো ফিরে আসার আর সম্ভাবনা ছিল না। কা'ব ইবনে আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৎছেলে তুবইয়া ইবনে আমের সেই সৈন্যদলে ছিল। তার কথা ছিল শীত আসার পূর্বেই তারা সেখান থেকে ফিরে আসবে। কিন্তু তার কথায় কারো বিশ্বাস ছিল না। একদিন একটি নৌকায় করে সেই দ্বীপে একজন এলো। সে ছিল ইয়াজিদের প্রতিনিধি। সে এসে বলল, হজরত মুয়াবিয়া ইনতেকাল করেছেন। তখন সেই প্রতিনিধি নতুন খলিফার বাইয়াত নিলো এবং তাদেরকে জানাল যে, খলিফা সৈন্যদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ফলে মুসলমানগণ সেই অঞ্চল সম্পূর্ণ খালি করে চলে

---

[১২৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৬০
[১২৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৫৯

এলো।[১২৮] রোমের নৌ-সেনাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দ্বিতীয় জায়গা ছিল সাইপ্রাস দ্বীপ, যা প্রশস্ততা এবং উন্নতিতে রোডস দ্বীপ থেকেও বেশি উপযোগী ছিল। সেখানে মুসলমানদের ঘনবসতিও ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. সেই অঞ্চলটা ৩৩ হিজরিতে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পদানত করেছিলেন। কিন্তু ইয়াজিদ খলিফা হওয়ার পরপরই এই অঞ্চলকেও সম্পূর্ণ খালি করে দিলো।[১২৯] ঐতিহাসিকগণ রোডস এবং সাইপ্রাস থেকে সৈন্য ফিরিয়ে আনার কোনো কারণ উল্লেখ করেননি। তবে সম্ভবত তাতে দুইটি কারণ ছিল:

১. ইয়াজিদের খেলাফত বিবাদী অবস্থায় ছিল। জনগণ মনের দিক থেকে পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। ইরাক এবং হিজাজ ছিল তার আয়ত্তের বাইরে। এ সময় খেলাফত প্রতিষ্ঠায় একমাত্র শক্তিই তার সম্বল ছিল। এজন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন ছিল, যেন বিরোধীদের উপর জয়ী হতে পারে।
২. ইয়াজিদ আসলে সৈন্যদের কষ্ট কমিয়ে দিয়ে সেনা-অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যদের মন জয় করতে চাচ্ছিল।

আফ্রিকায় উকবা ইবনে নাফে-এর বিজয়ধারা

ইয়াজিদের সময়কালে প্রসিদ্ধ তাবেয়ি উকবা ইবনে নাফে রহ. আফ্রিকাতেই বহাল থাকলেন। আফ্রিকার গোত্রগুলো বড় অবাধ্য ও ধোঁকাবাজ ছিল। তারা সেখানে বারবার বিদ্রোহ করছিল। হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় উকবা ইবনে নাফে আফ্রিকার

---

[১২৮] আলমা'রিফাহ ওয়াততারিখ : ৩/৩২৪

[১২৯] ফুতুহুল বুলদান : ১৫৪

রোডস এবং সাইপ্রাস থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষতি ডেকে এনেছিল। কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটি ছিল। সৈন্য প্রত্যাহারের পর সাইপ্রাসের সাথে যদিও একটি সন্ধিচুক্তির কারণে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু রোডস থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সাথে সাথে গ্রিকরা তা দখল করে নেয়। এরপর থেকে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত অনেক মুসলিম শাসক সেটা দখল করার জন্য আন্দোলন করেছেন; কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তবে অনেক পরে এসে যদিও একবার হাতে এসেছিল; কিন্তু আবার তা হাতছাড়া হয়ে যায়। ইয়াজিদ যদি তার বাবার প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা ধরে রাখতো এবং এখানে সৈন্য রেখে দিতো তাহলে হিজরি প্রথম শতকেই এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত বলে ঘোষিত হতো। এবং এখান থেকে ইউরোপের বিজয়ের ধারাও অনেক সহজ হয়ে যেতো।

অধিকাংশ অঞ্চল জয় করে নিয়েছিল। মিসর ও আফ্রিকা তখন একই প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত হতো। আফ্রিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল মিসর, যেখানে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ রা. গভর্নর ছিলেন এবং উকবা ইবনে নাফে তারই অধীনে থেকে জিহাদ করছিলেন।

৫৫ হিজরিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. মিসরে মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজের স্থানে মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ রা. কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদের নিজের আজাদকৃত গোলাম আবু মুহাজির দিনার রহ.-এর উপর খুব আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। এজন্য উকবা ইবনে নাফে-এর স্থলে আবু মুহাজিরকে আফ্রিকার রণাঙ্গনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। উকবা ইবনে নাফে' জয় করতে করতে আরো সামনে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলেন। উকবা ইবনে নাফে' এই সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু পর্যন্ত আফ্রিকার এলাকাগুলো আবু মুহাজিরের নেতৃত্বাধীনই ছিল। কিন্তু এসময় বারবার বিদ্রোহীদের আক্রমণের কারণে বেশ কিছু বিজিত অঞ্চলও হাতছাড়া হয়ে যায়। ইয়াজিদ যখন ক্ষমতা কিছুটা গুছিয়ে উঠল তখন উকবা ইবনে নাফে'-এর অতীত কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করে ৬২ হিজরিতে তাকে পুনরায় আফ্রিকার দায়িত্ব দিলো এবং আরো বেশি অঞ্চল বিজয়ের অনুপ্রেরণা ও অনুমতি দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। যখন তিনি ইয়াজিদের পক্ষ থেকে আফ্রিকায় দ্বিতীয়বার গভর্নর হওয়ার পত্র নিয়ে রওনা হলেন তখন মিসরে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, হয়তো আপনি এমন সৈন্যদের মধ্যে আছেন, যাদের জন্য জান্নাতের আশা করা যায়।[১৩০] হজরত উকবা ইবনে নাফে রা. উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের প্রধান কেন্দ্র কাইরাওয়ানকে পরিত্যক্ত ও জনমানবহীন অবস্থায় পেলেন। তিনি পুনরায় তা আবাদ করে তুললেন। তার আশপাশে ঘুরে এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, এই অঞ্চল ইবাদতগুজার ও অনুগতদের দ্বারা ভরে দাও এবং একে তোমার দীনের ইজ্জত এবং কাফেরদের জন্য যিল্লতি ও লাঞ্ছনার কারণ বানিয়ে দাও।

---

[১৩০] মুখতাসার তারিখে দিমাশক : ১৭/১১১, ১১২; সম্ভবত তিনি এই বাক্য দ্বারা বুঝিয়েছিলেন যে, আপনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন।

অতঃপর সৈন্যদের একটি অংশকে এখানে রেখে যুহাইর ইবনে কায়েসকে আমির নিযুক্ত করলেন এবং নিজ সন্তানদের একত্র করে বললেন, আমি আমার জীবনকে আল্লাহর দীনের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি। আমি শপথ করেছি যে, আমার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আমি জিহাদে মশগুল থাকব। জানি না তোমাদের সাথে দ্বিতীয়বার দেখা হবে কি না।[১৩১] তিনি এই প্রতিজ্ঞা এজন্য করেছিলেন যে, বিদ্রোহীদের ঔদ্ধত্য ও অহংকার কোনোভাবেই থামছিল না।

উকবা ইবনে আমের সন্তানদের অসিয়ত করেছিলেন, শোনো, আল্লাহর রাসুলের হাদিস শুধু সিকাহ রাবিদের থেকেই গ্রহণ করবে। কখনো ঋণ করবে না। পুরাতন কাপড় পরিধান করবে। এমন কোনো লেখায় লিপ্ত হবে না, যা কুরআন মাজিদ থেকে উদাসীন করে দেয়।[১৩২]

হজরত উকবা ইবনে নাফে প্রথমে লামিস দুর্গ, এরপর কুহ এবং তারপর বাগানা শহর জয় করলেন। এরপর আলজারাদ বা দক্ষিণ-পশ্চিম তিউনিসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল কবজা করতে করতে 'যাব' পর্যন্ত শত্রুদের দমন করে 'তাহেরাত' পৌঁছে গেলেন। সেখানে ছিল রোমান ও আফ্রিকান বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি। এখানে কাফের এবং মুজাহিদদের মাঝে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। মুসলমানগণ প্রথম দিকে পরাজিত হচ্ছিলেন; কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য সহায় হলো। মুসলমানগণ বিজয়ী হলেন এবং অসংখ্য গনিমতের সম্পদ অর্জন করলেন। তখন 'গামারা'র খ্রিষ্টান প্রশাসক মুসলমানদের সাথে সন্ধিবদ্ধ হলো।

উকবা ইবনে নাফে' এখান থেকে মরক্কোর প্রসিদ্ধ নগরী তানজাতে পৌঁছলেন, যা রোমসমুদ্রের তীরে উত্তর আফ্রিকার সর্বশেষ শহর এবং সেখানকার বাদশাহ ইয়ালইয়ানের অধীনে ছিল। মরক্কোর সকল প্রশাসক তাকে খেরাজ দিতো। হজরত উকবা ইবনে নাফে' প্রথমে এদেরকে ঘেরাও করলেন। তারপর সন্ধির মাধ্যমে নিজেদের কবজায় আনলেন। ইয়ালইয়ান তাকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন দিলো।

---

[১৩১] আল-বায়ানুল মাগরিব বা মুগরিব ফি বায়ানিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব বা মুগরিব : ১/২৩

[১৩২] মুখতাসার তারিখে দিমাশক : ১৭/১১১

উকবা ইবনে নাফে এখন সমুদ্র অতিক্রম করে আন্দালুসে প্রবেশের ইচ্ছা করলেন এবং প্রথম আক্রমণ খাযরা দ্বীপে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়ালইয়ান তার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে বলল, দেখুন শত্রুদের অবস্থানকালে এভাবে সমুদ্র অতিক্রম করে ফিরিঙ্গিদের সাথে যুদ্ধ করা মনে হয় ঠিক হবে না। কারণ এতে রিজার্ভ সৈন্যদের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। হজরত উকবা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে আর কোন কোন কাফের সম্প্রদায় আছে? ইয়ালইয়ান বলল, সুস-এর অঞ্চলগুলোতে শক্তিশালী গোত্র বিদ্যমান রয়েছে, যাদের কোনো ধর্মই নেই। তারা আসলে পশুদের মতো জীবনযাপন করে। অবশ্য তাদের বিশ্বাস অনেকটা অগ্নিপূজকদের মতো। তারা আল্লাহকে মানে না।

একথা শুনে হজরত উকবা তার সিদ্ধান্ত বদলালেন। আসলে সুস-এর অঞ্চল অনেক বিস্তৃত ছিল। সেখানে যারহুন পাহাড়ের কাছে সাবু এবং দারআ নামের দুটি নদীর মাঝামাঝিতে মরক্কোর সবচেয়ে বড় শহর 'ওয়ালিলি' ছিল, যাকে আজকাল কাসরে ফেরাউন বলা হয়। হজরত উকবা বিন নাফে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে সেই অঞ্চলও জয় করে নিলেন। এরপর হজরত উকবা রহ. দারআ এবং সুসের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে বিদ্রোহীরা অনিরাপদভাবে ছিল। সেখানে তুমুল যুদ্ধ এবং জীবনপণ লড়াই করে তাদেরকে পিছু ধাওয়া করলেন। মুসলমানরা তাদের লাশের স্তূপ গড়তে গড়তে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং সাহারায়ে লামতুনা পর্যন্ত পৌঁছে যান। পথে ভিড়ের কারণে দেয়ালগুলো ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগুলেন। হজরত উকবা ইবনে নাফে রহ. আফ্রিকার পশ্চিম দিকে লোহিতসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল আসাফি (মালিয়ানে) পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সেখানে সমুদ্রে নয়নাভিরাম ঢেউ উথাল-পাথাল করছিল। হজরত উকবা ইবনে নাফে সেখানে ঘোড়া বেঁধে নিজের মৃত্যুঞ্জয়ী সাথিদের নিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সাথিদের বললেন, "দোয়ার জন্য হাত ওঠাও।" তখন একপর্যায়ে এই মুসতাজাবুদ-দাওয়াহ মুজাহিদ হঠৎ বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ, যদি এই সমুদ্র বাধা হয়ে না দাঁড়াতো তাহলে যেখান পর্যন্ত জমিন পাওয়া যেতো সেখানে যুদ্ধ করতে করতে চলে যেতাম। হে আল্লাহ, আপনি ভালো করেই জানেন যে, আমরা এখানে ধোঁকা ও বিদ্রোহের জন্য আসিনি।

আমরা এখানে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি, যা আপনার বান্দা যুলকারনাইনের ছিল। তা হলো সবখানে শুধুই আপনার ইবাদত করা হবে এবং আপনার সাথে কাউকে শরিক করা হবে না। হে আল্লাহ, আমরা কুফর-বিরোধী এবং ইসলামের প্রতিরক্ষাকর্মী। সুতরাং আপনি আমাদের সাথি ও সাহায্যকারী হয়ে যান।" এই দোয়া করতে করতে তিনি ফিরে এলেন।[১৩৩]

এক সফর থেকে ফেরার পথে তারা সবাই একটি বিজন ও সংকীর্ণ মরুভূমি দিয়ে আসছিলেন। মুসলমানগণ পানি-স্বল্পতায় পড়ে গেলেন। আশংকা ছিল অচিরেই সকল সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। হজরত উকবা দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানির জন্য দোয়া করলেন। হঠাৎ করেই তখন তাদের ঘোড়া এক জায়গায় গিয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতেই সেখান থেকে মিঠা পানির একটি ঝরনা বেরিয়ে এলো। হজরত উকবা সকলকে ডেকে জমা করলেন। মুজাহিদগণ পানি পান করলেন এবং থলে ভরে পানি নিয়ে নিলেন। এই জায়গা এখনো 'মাউল ফারাস' নামে প্রসিদ্ধ।[১৩৪]

যেহেতু মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত পুরো উত্তর আফ্রিকা পদানত হয়ে গেছিল সেজন্য বাহ্যত কোনো বিপদের আশংকা ছিল না; তাই কাইরাওয়ান থেকে আট মঞ্জিল দূরে 'তিবনা' পর্যন্ত এসে হজরত উকবা সেনাবাহিনী সামনে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি কিছু সৈন্য এবং খাদেম নিয়ে পেছনে রয়ে গেলেন। এইসময় কুসাইলা নামের এক খ্রিষ্টান সরদার, যে উকবা ইবনে নাফে-এর অনুগত হয়ে চলছিল, গাদ্দারি করে বসল এবং স্থানীয় লোকদের নিয়ে আচমকা আক্রমণ করল। বেঁচে ফেরার কোনো পথই তখন খোলা ছিল না। উকবা বিন নাফে রহ. আবুল মুহাজির রহ. কে বললেন, "তুমি এখান থেকে চলে যাও এবং কাইরাওয়ানে গিয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব দাও। আমি শহিদ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে থাকব।" আবু মুহাজির তখন বললেন, "আমারও শাহাদাত উদ্দেশ্য।"

---

[১৩৩] আল কামেল ফিত তারিখ, ৬২ হি আল-ইসতিকসা লিআখবারি দুআলিল মাগরিব ওয়াল আকসা : ১/১৩৮

[১৩৪] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৬২ হিজরি, আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ : ৫৯

তারপর উভয়ে তরবারির খাপ খুলে সামনে বাড়লেন এবং শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সবশেষে এভাবেই লড়াই করতে করতে তারা উভয়ে শাহাদাতের অমীয় শুধা পান করলেন। তাদের সাথে তখন প্রায় ৩০০ বড় বড় তাবেয়ি ছিলেন।[১৩৫] দুজন ছিলেন সাহাবি : ১. মুহাম্মদ ইবনে আউস আল আনসারি রা.। ২. ইয়াজিদ ইবনে খালফ আবসি রা.। এবং আরো কয়েকজন গ্রেফতার হন। তারপর মুসলমানরা ফিদিয়া দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনেন। এই সকল ঘটনা ৬২ এবং ৬৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।[১৩৬]

আফ্রিকায় বিদ্রোহ

৬৩ হিজরির শেষসময়ে একদিকে ইয়াজিদের সিপাহসালার মুসলিম ইবনে উকবা মদিনায় সৈন্যপ্রহরা দিচ্ছিল। অপরদিকে আফ্রিকায় আবার বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। উকবা ইবনে নাফের হত্যাকারী খ্রিষ্টান সরদার কুসাইলা সেখানকার স্থানীয় বারবার গোত্রগুলো একত্র করে তাদের দখলীকৃত মুসলিমদের বহু জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিল এবং অগ্রসর হতে হতে কাইরাওয়ান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। এখানকার আমির যুবাইর ইবনে কায়েসের কাছে রিজার্ভ বাহিনী আসতে পারছিল না। ফলে সে শহর খালি করে বারকা নামক স্থানে চলে গেলো। এতে কাইরাওয়ান ৬৪ হিজরিতে খ্রিষ্টানদের হাতে চলে গেলো।[১৩৭]

খোরাসান এবং মধ্যএশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

পূর্বদিকের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ অব্যাহত রইল। তবে নিয়ম এই ছিল যে, গ্রীষ্মকালে মুসলিমরা আমুদরিয়া অতিক্রম করে সেখানে যেতেন এবং শীতকালে ফিরে এসে মার্ভে অবস্থান করতেন। একবার খাওয়ারিজম শহরের আশপাশের লোকজনকে তৎকালীন সরদার একত্র করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত করতে শুরু করে।

তাদের ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন করার জন্য মুসলিম ইবনে জিয়াদ, ইয়াজিদ যাকে ৬১ হিজরিতে খোরাসান ও সিজিস্তানের গভর্নর নির্ধারণ করেছিল,

---

[১৩৫] আল-ইসতিকসা লিআখবারি দুয়ালিল মাগরিব বা মুগরিব আলআকসা : ১/১৩৫-১৩৯

[১৩৬] আল-ইসতিকসা লিআখবারি দুয়ালিল মাগরিব বা মুগরিব আলআকসা : ১/১৩৯

[১৩৭] আল-ইসতিকসা লিআখবারি দুয়ালিল মাগরিব বা মুগরিব আলআকসা : ১/১৪০

শীতকালে আরবের বাছাইকৃত কয়েকজন জেনারেলকে সাথে নিয়ে ওদের উপর আক্রমণ করলেন। সেই ৬ হাজার সৈন্যের মধ্যে ইমরান ইবনে ফুজাইল, মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরা, আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম, তালহা ইবনে আবদুল্লাহ খুযায়ি, সিলাহ ইবনে হিশাম, হানজালা ইবনে উরাদা, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামারদের মতো ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম সৈন্যরা সেই শহর অবরুদ্ধ করে ফেলল, যেখানে স্থানীয় সরদাররা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সাজাচ্ছিল। তারা অবস্থা বেগতিক দেখে মুসলমানদের কাছে মাফ চাইলো এবং ৫০ কোটি টাকা সমমূল্যের দ্রব্যাদি দিয়ে মুক্তি পেলো। এরপর মুসলিম ইবনে জিয়াদ গাদ্দারদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমরকন্দে হামলা করলেন। এখানকার স্থানীয় লোকেরা সন্ধি করে নিলো। মুসলিম ইবনে জিয়াদ খুজান্দা নামক এক সৈন্যের কাছে গেলেন, যে শত্রুদের পরাজয়ের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। এরপর মুসলিম ইবনে জিয়াদ তার ভাই ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদকে ৬২ হিজরিতে মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের শাসক নিযুক্ত করলেন। এখানে কাবুলের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে বসল এবং আবু উবাইদা ইবনে জিয়াদকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো। এই সংবাদ শুনেই ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে তারা পরাজিত হলেন। মুসলমানদের এক বিশাল সংখ্যক সৈন্য শহিদ হলেন, যাদের মধ্যে স্বয়ং ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ, আমর ইবনে কুতাইবা, বুদাইল ইবনে নুআইম, উসমান ইবনে আদম, ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা, সিলাহ ইবনে আকিমও ছিলেন। এরপর মুসলিম ইবনে জিয়াদ যখন এই সংবাদ শুনলেন তখন তিনি তালহা ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি তালহাতুত তালাহাত উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাকে কাবুলে পাঠালেন। তিনি ৫ লাখ দিরহাম দিয়ে আবু উবাইদা ইবনে জিয়াদকে মুক্ত করলেন।[১৩৮]

৬২ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনে আসাদ ইবনে কুরয কাইসারিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই বছরই গ্রীষ্মকালে হুসাইন ইবনে নুমাইর আক্রমণ করলেন সুরিয়াদের উপর এবং সে-বছরেই উবাইদুল্লাহ ইবনে

---

[১৩৮] আল-কামিল ফিত তারিখ : ৬১ হিজরি তারিখে খলিফা : ২৩৬

জিয়াদ মুসলিম ইবনে জারুদকে কান্দাবিলে নিয়োগ দেন। মুনযির এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে মৃত্যুবরণ করলেন। তার ছেলে তবু এই অভিযান অব্যাহত রাখল এবং কান্দাবিল বিজয় করে নিলো। এরপর উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ সিনান ইবনে সালামাকে মাওকানের অভিযানে পাঠালেন। কিছুদিন পরেই ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া সেখানে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ হেলালিকে নিযুক্ত করে।[১৩৯] সামগ্রিকভাবে ইয়াজিদের সময়কালে ইসলামি খেলাফতের উন্নতি কম হয়েছিল। কারণ সে রোডস ও সাইপ্রাসকে সম্পূর্ণ সৈন্যমুক্ত করে দিয়েছিল, যা জয় করে নিয়েছিলেন উকবা ইবনে নাফে। কিন্তু সেগুলোও ইয়াজিদের শাসনের শেষদিকে শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

একটি চিন্তার বিষয়

কেউ কেউ মনে করেন ইয়াজিদের সময়কালে যেসব বিজয় হয়েছিল সেগুলোর কারণে ইয়াজিদ সাধুবাদ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ সেই বিজয়গুলো মূলত উকবা ইবনে নাফের মতো বীর মুজাহিদদের কারণেই হয়েছিল।

আমরা আসলে এ বিষয়টার সাথে একমত নই। কারণ দূরদূরান্তের রণাঙ্গনের জেনারেলগণও সবসময় কেন্দ্র থেকে দিকনির্দেশনা এবং খরচাদি গ্রহণ করতেন। সেইসাথে গভর্নরদের নিয়োগদান এবং যুদ্ধের অনুমতি প্রদান খলিফার পক্ষ থেকেই হতো। এই কারণে এসব বিজয় অভিযানে ইয়াজিদের উল্লেখযোগ্য অবদান অবশ্যই আছে। আর এই বাস্তবতার দ্বিতীয় দিক হলো, কারবালার ঘটনার পর থেকে হাররার ঘটনা পর্যন্ত দেশে দেশে সৈন্যদের হাতে যেসব অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্ম নিয়েছে, সেই ব্যাপারে একথা বলাও ভুল যে, এর পেছনে শুধু গভর্নর ও সৈন্যদেরই হাত ছিল। ইয়াজিদ একেবারে পবিত্র। কেননা জিহাদ ও বিজয়ের ধারা শুধু সৈন্যদের অর্জন এবং তাদের সাথে বাদশাহর কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই, তাহলে এমন ভাবনা নিতান্তই বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। সেসব সৈন্যের হাতে যেসব লোক জুলুমের শিকার হয়েছেন, সেক্ষেত্রে শাসক একেবারে নির্দোষ কীভাবে হতে পারে?

[১৩৯] তারিখে খলিফা : ২৩৫, ২৩৬ আল-কামিল ফিততারিখ : ৬১ হিজরি

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ

ইয়াজিদের নির্মাণের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। সে তার সময়কালে কিছু উন্নয়নমূলক কাজও করেছিল। কাসিয়ুন পাহাড়ের উপত্যকায় একটি ছোট নদী ছিল, যেখান থেকে অল্পকিছু জমিন সিক্ত হতো। ইয়াজিদ তা প্রশস্ত করে সাড়ে চার ফুট প্রস্থ ও সাড়ে চার ফুট গভীর করে দেয়। যার কারণে পূর্ণ এলাকাই সেখান থেকে খুব উপকৃত হতে পারতো। তখন সেই নদীর নাম হয়ে গিয়েছিল 'নাহরে ইয়াজিদ'।[১৪০]

---

[১৪০] তারিখে দিমাশক : ২/৩৬৯

নোট : বলা হয় যে, ইয়াজিদই সর্বপ্রথম কাবাকে রেশমি কাপড়ের গিলাফ পরিয়েছিল। (তারিখুল খুলাফা : ১৫৯; কিন্তু এটা মূলত বর্ণিত হয়েছে ওয়াকিদি থেকে এবং পর্যালোচিত ফলের বিপরীত। আসাহ মা ফিল বাবের বর্ণনামতে কাবার গায়ে রেশমি কাপড়ের গিলাফ সর্বপ্রথম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. পরিয়েছিলেন। তিনি ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানআনির সনদে বর্ণনা করেছেন। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৯০৮৭ এভাবেই হাফেজ জাহাবি রহ. লিখেছেন। তারিখুল ইসলাম : ৫/৪৪৩; এব্যাপারে দ্বিতীয় বর্ণনা এমনও পাওয়া যায় যে, এই কাজ মূলত সর্বপ্রথম করেছেন হজরত মুয়াবিয়া রা.। আখবারু মাক্কা : ১/৫৩; এই আলোচনা শুধু রেশমি কাপড়ের গিলাফ নিয়ে। অন্যথায় কাবার গায়ে গিলাফ লাগানোর প্রচলন তো জাহিলিয়্যাতের যুগেও ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদিনও সেই আমল অব্যাহত রেখেছেন। আখবারি মাক্কা : ১/২৫৩

ইয়াজিদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর বিদ্রোহ

কারবালার ঘটনার পর মুসলিমবিশ্বে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে বেশি ছিল হিজাজে, যেখানে একদিকে মক্কায় ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সমরনায়ক, যিনি তখনো ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করেননি। অপরদিকে মদিনার অধিবাসী, যারা নবীপরিবারের পাগল প্রেমিক ছিলেন; এই হিজাজের প্রায় অধিকাংশই শুরু থেকে ছিলেন ইয়াজিদের বিরোধী। মন থেকে তাকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না তারা। আর এখন তো কারবালার ঘটনা তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দিলো।

যদিও ইয়াজিদ কারবালায় বেঁচে-যাওয়া-সাইয়েদদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছিল এবং হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আলি ইবনে হুসাইন রহ.-কে খুব সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিল; কিন্তু মদিনাবাসীরা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের ব্যাপারে ইয়াজিদের নীরবতা দেখে এটা ভাবতে বাধ্য হচ্ছিল যে, এই ঘটনার মূল হোতা ইয়াজিদই। তা ছাড়া ইয়াজিদের এসব আচরণের কারণে মদিনাবাসীদের মনে নবী-পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনেক আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠেছিল। যার কারণে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. আলি ইবনে হুসাইনকে বলেছিলেন, "যদি আমাকে আপনার কোনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই বলবেন।" তখন উত্তরে তিনি বলেন, "আসলে তেমন কোনো প্রয়োজন আপাতত নেই।" এরপর মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. বলেন, আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারটা আমাকে দিয়ে দিন। নয়তো আশংকা আছে জালেমরা আপনার থেকে তা নিয়ে নেবে। আল্লাহর শপথ, আমার জীবন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি তার কাছেধারেই কাউকে পৌঁছতে দেবো না।[১৪১]

[১৪১] সহিহ মুসলিম : ৬৪৬২ ফাযাইলুস সাহাবা

ইয়াজিদের কাছে মদিনার প্রবীণ ব্যক্তিদের আগমন

৬১ হিজরির মহররম মাসে কারবালার ঘটনা ঘটেছিল। এরপর সাইয়েদ বংশের বাকি সদস্যদের কাফেলা ইয়াজিদের কাছে পৌঁছেন। ইয়াজিদ তাদেরকে নিরাপদে ও সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দিলো। এরপর ৬১ হিজরির বাকি দিন এবং ৬২ হিজরির পূর্ণ বছর সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথেই পার হলো। এসময় কোথাও কোনো বিদ্রোহ ছিল না। আফ্রিকা, খোরাসান ও বেলুচিস্তানে জেনারেলদের আধিপত্য চলতে থাকল। ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কিছু গভর্নরও পরিবর্তন হলো এবং মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সমঝোতা তৈরি অথবা তার উপর অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করল।[১৪২]

সেইসাথে ইয়াজিদ কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনায় নিজেকে ভারাক্রান্ত হিসেবে উপস্থাপন ও বিশ্বাস করানোর সবরকম চেষ্টাই চালু রাখল। সেজন্য ইয়াজিদ হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে দাওয়াত দিলো, রাজনীতির প্রতি যার সামান্য আগ্রহও ছিল না। ইয়াজিদের আহ্বানে তিনি সাড়া দিলেন। যদিও তার ছেলে আবদুল্লাহ আশংকার কারণে নিষেধ করেছিলেন। ইয়াজিদ মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে পেয়ে খুব সম্মান করল এবং তাকে প্রভাবিত করার জন্য তার কাছে কখনো ফিকাহ, কখনো কুরআনের বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতো।[১৪৩]

কারবালার ওই ঘটনার প্রায় ২ বছর পর ৬৩ হিজরির শুরুর দিকে ইয়াজিদ মদিনার গভর্নর উসমান ইবনে মুহাম্মদকে এই নির্দেশ দিলো যে, সে যেন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একটি দল শামে পাঠায়।[১৪৪] উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইয়াজিদের হুকুম অনুযায়ী কাজ করল। মদিনার নেতৃস্থানীয়দের একটি দল ইয়াজিদের মেহমান হলো। এই কাফেলায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা, মাআকিল ইবনে সিনান, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিযাম, মুনযির ইবনে যুবাইর (ইবনে আওয়াম), আব্বাস ইবনে সাহাল (ইবনে

---

[১৪২] বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

[১৪৩] আনসাবুল আশরাফ : ৩/২৭৭, ২৭৮

[১৪৪] তারিখে খলিফা : ২৩৬

সা'দ) এবং উসমান ইবনে আতা প্রমুখ (সাহাবি ও তাবেয়ি) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইয়াজিদ তাদের সাথে দশদিন পর দেখা করতে এলো এবং এসে তার বিলম্ব হওয়ার ওজর পেশ করল, আসলে আমার পায়ের ব্যথা দিন-দিন বেড়েই চলছে। একটা সামান্য মাছি বসলেও মনে হয় পায়ে পাহাড় উঠেছে।

এরপর সে তাদের সাথে খুব সম্মানজনক আচরণ করল এবং প্রচুর হাদিয়া-তোহফা দিয়ে বিদায় জানাল।[১৪৫]

ইয়াজিদ আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ১ লাখ দিরহাম হাদিয়া পেশ করল এবং তার আটজন ছেলেকে ১০ হাজার দিরহাম করে হাদিয়া দিলো।[১৪৬] মুনযির ইবনে জুবায়ের ইবনে আওয়ামকে হাদিয়া দিলো ১ লাখ দিরহাম।[১৪৭] আর অন্যদের যে যা চাইলো তৎক্ষণাৎ তাকে তা দিয়ে দিলো।[১৪৮]

কিন্তু তাই বলে তারা থেমে যাননি। বরং সেখান থেকে একরাশ ঘৃণা নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন এবং এসেই ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দিলেন। তারা শাম থেকে এটা জেনে এলেন যে, ইয়াজিদ নামাজ পরিত্যাগ করে এবং অনেক কবিরা গুনাহে লিপ্ত।[১৪৯]

এইসকল ব্যক্তির অবস্থানের কথা যেসব বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেটা সনদের দিক থেকে তুলনামূলক দুর্বল হওয়ার কারণে কিছুটা আপেক্ষিক। তবে সহিহ বর্ণনা এবং মুতাওয়াতিরভাবে একথা প্রমাণিত যে, তারা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং ইয়াজিদের হুকুমত ধ্বংসের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এ থেকে একথাই বুঝা যায়, যেসকল সাহাবি এবং তাবেয়ি বিদ্রোহ করেছিলেন, তাদের কাছে মূলত ইয়াজিদের কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকার বিষয়টা স্পষ্ট ছিল।[১৫০]

---

[১৪৫] তারিখে দিমাশক : ২৬/২৫৯

[১৪৬] তারিখে খলিফা : ২৩৬, ২৩৭

[১৪৭] আনসাবুল আশরাফ : ৫/২৩০; তারিখুত তাবারি : ৫/৪৮০

[১৪৮] তারিখে দিমাশক : ২৬/২৫৯

[১৪৯] দালাইলুন নবুওয়াহ লিলবাইহাকি : ৬/৪৭৪

[১৫০] ইয়াজিদের প্রতি যারা ভালো ধারণা রাখেন, তাদের মতে, ইয়াজিদের কাছে মদিনার যেই নেতৃবৃন্দ গিয়েছিলেন, তারা কোনো ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছেন অথবা বনু উমাইয়ার বিপক্ষীয় দলের প্রোপাগান্ডার শিকার হয়েছেন। কিন্তু এটা প্রকাশ্যই যে, সাহাবায়ে কেরামের

মদিনাবাসীগণ কেন বিদ্রোহ করলেন এবং অধিকাংশই কেন এই আন্দোলনে শরিক হলেন না?

আসলে মদিনার সেসকল সাহাবি ও তাবেয়ির মতে ফাসেকের রাজত্ব মেনে নেওয়া ছিল অবৈধ ও নাজায়েজ এবং এর বিরুদ্ধে জিহাদ করা জরুরি, তাদের সামনে ছিল নবীজির এই হাদিস—তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কারো অন্যায় দেখে তখন সে যেন হাত দ্বারা প্রতিরোধ বা প্রতিহত করে।[১৫১] কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ইয়াজিদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ গ্রহণ করতেন না। কারণ, তিনি যখন শামে গিয়েছিলেন তখন ইয়াজিদের মধ্যে এমন কিছু দেখেননি। এজন্যই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি' রা. যখন তাকে বললেন "ইয়াজিদ মদ পান করে। ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দেয়" তখন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া তাকে বলেছিলেন "আপনি যা বর্ণনা করছেন, আমি সেগুলো তার মধ্যে দেখিনি। আমি তার সাথে কিছুদিন ছিলাম। তখন আমি তাকে নামাজের প্রতি যত্নবান এবং নেককাজ ও শরয়ি মাসআলার প্রতি অনেক আগ্রহ লক্ষ করেছি।"[১৫২]

কিন্তু শুধু মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রহ.-এর একক মত অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ির মতকে বাতিল করে দিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এটাও বাস্তব যে, সাহাবি ও তাবেয়িদের অনেক বড় একটি অংশ ইয়াজিদের বিরোধিতা থেকে দূরে সরে রইলেন। এটা তারা কোনো লোভ বা ইয়াজিদের ভয়ে করেছেন এমন নয়। কারণ যারা কাইসার ও কিসরার মতো পরাশক্তিকে দেখেও থেমে থাকেননি, তারা এই ইয়াজিদের ভয়ে থমকে যাবেন! আসলে তাদের নীরবতার কারণ ছিল নবীজির হাদিস, যেখানে শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং বিদ্রোহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, হোক সে নেককার বা সৎকর্মশীল কিংবা হোক ফাসেক-ফাজের বা জালেম।[১৫৩]

মতো বিজ্ঞ জামাতের বিশ্বাসের উপর এই চৌদ্দশত বছর পরের লোকজন নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেওয়াটা বাতুলতা ছাড়া কিছুই না।

[১৫১] সহিহ মুসলিম : ১৮৬ কিতাবুল ঈমান। মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১০০৯ সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০১৩

[১৫২] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/২৭৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৫৩

[১৫৩] এমন হাদিস সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই জানতেন। তাই তো তারা কোনো মুসলিম শাসকেরই বিরোধিতায় যাননি। দুইটি হাদিস নিম্নরূপ: আউফ ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক সেই হবে, যাকে তোমরা ঘৃণা করো আর সেও তোমাদেরকে। সে তোমাদের উপর লানত করবে আর তোমরা তার উপর। তখন কেউ একজন বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমরা কি তার সাথে তলোয়ার দিয়ে বিরোধিতা করবো না? নবীজি তখন বললেন, সে যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়েম রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এমনটা করবে না। যখন তোমরা তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনো খারাপ বা মন্দ কাজ প্রত্যক্ষ করবে তখন তার সেই কাজকে খারাপ মনে করো। কিন্তু তার আনুগত্য থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নিয়ো না। সহিহ মুসলিম : কিতাবুল ইমারাহ। মুসনাদে আহমাদ : ২৩৯৮১

হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তার হাতে বাইয়াত হলাম। তখন তিনি আমাদের থেকে যেসব বিষয়ের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে এটাও ছিল যে, আমরা শুনবো এবং মানবো, আমরা সন্তুষ্ট থাকি বা অসন্তুষ্ট, সহজ হোক বা কঠিন, কিংবা আমাদের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হোক; আমরা কখনো শাসকের বিরোধিতা করবো না। তবে হ্যাঁ, যদি তার মধ্যে কুফরে বাওয়াহ তথা স্পষ্ট কুফর দেখো, যে তার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট দলিল বা প্রমাণ থাকে। সহিহ বুখারি : কিতাবুল ফিতান। সহিহ মুসলিম : কিতাবুল ইমারাহ। আল্লামা শাওকানি কুফরে বাওয়াহর ব্যাখ্যায় বলেন, উদ্দেশ্য হলো, যতক্ষণ শাসকের কাজে ভিন্ন ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরোধিতা করা বৈধ নয়। নাইলুল আওতার : ৭/২০৭

শায়েখ মুহাম্মদ সালেহ আল উসাইমিন রহ. কুফরে বাওয়াহর ব্যাখ্যায় বলেন, শাসকের যেই কাজে দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা নেই। যেমন, সে কোনো মূর্তিকে সেজদা দেয় অথবা আল্লাহ এবং তার রাসুল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে ইত্যাদি। শারহুল আরবাইন আন নাবাবিয়্যাহ : ১২২

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যদি কোনো বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন ও ফেতনা সৃষ্টি না করে জালিম শাসককে হটানো যায়, তাহলে তার বিরোধিতা করা ও তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। আর যদি এমন না হয় তাহলে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব।

আর কতিপয় আলেম বলেছেন, ফাসেক ব্যক্তিকে শাসক বানানো বৈধ নয়। কিন্তু যদি ন্যায়প্রতিষ্ঠার পর তার থেকে অন্যায় ও জুলুম প্রকাশ পায় তাহলে তখন তার বিরোধিতা করার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, শাসক কুফুরি না করা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। ফাতহুল বারি : ১৩/৮; ঠিক এই বিধানটাই যে-জোর করে শাসক হয়েছে তার ব্যাপারেও। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, জোর করে হওয়া শাসকের আনুগত্য করা, তার নেতৃত্বে জিহাদ ওয়াজিব হওয়া এবং বিদ্রোহের পরিবর্তে তার আনুগত্য স্বীকার করা কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণ একমত হয়েছেন। কারণ এতে অনেক জীবন বেঁচে যায় এবং অযথা অনেক রক্তপাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। এই হাদিসটিই ছিল সেসকল সাহাবি ও তাবেয়ির সামনে। তবে ফকিহগণ শুধু এই সুরতটা পৃথক করেছেন যে, যখন শাসক থেকে স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায় তখন তার আনুগত্য জায়েজ নেই। বরং যার শক্তি-সামর্থ্য আছে, তার জন্য এমন শাসকের বিরোধিতা করা ওয়াজিব। ফাতহুল বারি : ১৩/৭

বিরোধিতার ব্যাপারে জমহুরের মতাদর্শ

নবীজির এসব হাদিসের উপর ভিত্তি করে উম্মতের অধিকাংশের মতাদর্শ এই ছিল যে, শাসক ফাসেক ও ফাজের হোক কিন্তু যতক্ষণ তার থেকে স্পষ্ট কুফুর প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ বাইয়াত ভঙ্গ করা যাবে না। ইয়াজিদের অপকর্ম ও পাপাচার প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় উম্মতের মাঝে এই প্রথম সংকট তৈরি হলো। তখন মুসলমানদের জন্য বিষয়টি মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ল। হয়তো এখানে আল্লাহ তায়ালার এই হেকমত ছিল যে, এই মাসআলার মাধ্যমে উম্মতের প্রবীণ ও শুদ্ধতম ব্যক্তিদের কর্মপন্থা সামনে এসে যায় এবং পরবর্তীদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত পথ দেখাতে পারে। সুতরাং ইয়াজিদের বাইয়াত বাকি রাখা এবং ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহাবি ও তাবেয়িদের মাঝে দুটি দল তৈরি হয়ে গেলো। অধিকাংশের সামনেই নবীজির সেই হাদিস ছিল, যেখানে তিনি নামাজ, জিহাদ ও সকল কল্যাণকাজে শাসকের অনুসরণ ও আনুগত্যের কথা বলেছেন, সেই শাসক ভালো হোক বা মন্দ। তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত তলোয়ার উত্তোলন করা বৈধ ছিল না, যতক্ষণ সে প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত না হয়।[১৫৪]

ইবনে উমর রা. এর সাবধানী অবস্থান

এই মতাদর্শের অনুসারীদের নেতৃস্থানীয় যারা ছিলেন, তাদের একজন হলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, যিনি ছিলেন ইলম ও ফিকহের দিক থেকে সেসময়কার পুরো ইসলামিবিশ্বে সবচেয়ে বড় অবস্থানে। তার কর্মপদ্ধতি সারাবিশ্বের মুসলিমদের জন্য দলিল ছিল। এজন্য অধিকাংশই

---

[১৫৪] এই মাসআলায় এসে আলিমগণ অনেক কল্যাণকর দিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, ফেতনা-ফাসাদ থেকে হেফাজত। যা শাসকের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্নভাবে করা হয়। স্বয়ং মুসলিমসমাজও অনেকের অপরাধ প্রকাশ করে না। সুতরাং কারো অপরাধ নিশ্চিতভাবে দেখে জানার বিষয়টা তেমন সহজ নয়। তা ছাড়া কারো দিকে ফিসকের বিষয়টা আরোপ করা মিথ্যা ও অপবাদও হতে পারে। তা ছাড়া শাসকদের বিরোধিতা করার মতো মানুষ প্রত্যেক সমাজেই কমবেশি রয়েছে। সেজন্য শাসক অনেক অপপ্রচার ও অপবাদের সম্মুখীন হন। এখন জনগণের সেই আরোপিত কথা বা বিষয় সত্যও হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে। কারণ বিরোধীশক্তির জন্য শাসকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা খুব কঠিন কিছু নয়। সুতরাং শরিয়ত যদি শাসকের ব্যক্তিগত পাপাচারের প্রসিদ্ধির কারণে বিদ্রোহ ও বিরোধিতার রাস্তা খুলে দিতো তাহলে প্রতিটা শাসকই সবসময় শংকায় থাকতো এবং ইসলামি হুকুমতে কারো রাজত্ব প্রতিষ্ঠিতই হতে পারতো না।

ইয়াজিদের পাপাচার এবং অপকর্ম উপেক্ষা করাকেই ভালো মনে করছিলেন।[১৫৫] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ইয়াজিদের বিরোধীদলের নেতা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি' রা. কে নিষেধও করেছিলেন। তার কাছে গিয়ে বলেছেন, আমি আপনাকে শুধু একটি হাদিস শোনাতে এসেছি। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তায়ালার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে, তার কাছে (নিজেকে বাঁচানোর জন্য) কোনো প্রমাণ বা দলিল থাকবে না। এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ইনতেকাল করবে যে, তার গর্দানে (সমকালীল খলিফার) বাইয়াত থাকবে না, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।[১৫৬]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নিজ সন্তান এবং খাদেমদেরকে একত্র করলেন। এই আন্দোলন ও বিরোধিতা থেকে নিষেধ করে বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য একটি ঝান্ডা স্থাপন করা হবে। আমরা এই ব্যক্তির (ইয়াজিদের) বাইয়াত গ্রহণ করেছি আল্লাহ এবং তার রাসুলের হুকুম পালন করার জন্য। আমার জানা নেই যে, কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশ পালনার্থে খলিফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং পুনরায় তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তোমাদের কেউ যদি ইয়াজিদের বাইয়াত ভেঙে দেয় এবং সেই খেলাফতের (নতুন হুকুমতের) বাইয়াত গ্রহণ করে তাহলে আমার এবং তার মাঝে যুদ্ধের সব কারণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।[১৫৭]

এই মতাদর্শই অধিকাংশ সাহাবির ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি মদিনাবাসীদের সাথে দামেশক সফরের সময়

---

[১৫৫] নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত নয় যে, ইয়াজিদ কোনো হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে অথবা শরিয়ত অস্বীকার করেছে। এইকারণে তার ব্যক্তিত্বের উপর আঙুল ওঠানো গেলেও সেটা কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফুরি হিসেবে প্রমাণ করা সম্ভবপর ছিল না। এজন্য তার বিরোধিতা করা জমহুরের মতে বৈধ ছিল না। আর যেহেতু বিরোধী সাহাবি ও তাবেয়িগণ মুখলিস ও মুজতাহিদ ছিলেন; সেকারণে তাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই।

[১৫৬] সহিহ মুসলিম : ৪৮৯৯ কিতাবুল ইমারাহ।

[১৫৭] সহিহ বুখারি : ৭১১১ কিতাবুল ফিতান।

সেখানেই ইয়াজিদের কাছে থেকে গিয়েছিলেন, সে-কারণেই তিনি বিরোধিতায় লিপ্ত হননি।[১৫৮]

হজরত নুমান ইবনে বাশির, আবদুল্লাহ ইবনে মাসআদা ফাযারি এবং যাহ্হাক ইবনে কায়েস রা. এ কারণেই প্রশাসনের অঙ্গীকারের উপর অটল ছিলেন।[১৫৯]

এ ছাড়াও যেসকল সাহাবি ও তাবেয়ি জিহাদে লিপ্ত ছিলেন, তারা এসব রাজনীতিতে না জড়িয়ে নিজেদের কাজেই ব্যস্ত থাকলেন। তাদের মধ্যে হজরত মুনযির ইবনে জারুদ, সিনান ইবনে সালামা, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ হেলালি, সিলাহ ইবনে আশইয়াম, আমর ইবনে কুতাইবা, বুদাইল ইবনে নুয়াইম, উসমান ইবনে আদম, আবদুল্লাহ ইবনে আসাদ রহ.-এর মতো ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন।[১৬০]

আর যারা একেবারেই নীরব ছিলেন, তাদের মধ্যে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে যাইনুল আবেদিনও শামিল ছিলেন, যিনি মদিনায় থাকা সত্ত্বেও ইয়াজিদের বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেননি।[১৬১]

---

[১৫৮] তারিখে দিমাশক : ২৬/২৫৯

[১৫৯] উসদুল গাবাহ, আলইসতিয়াব, আল-ইসাবাহ

[১৬০] তারিখে খলিফা লিইবনে খাইয়াত: ২৩৬, ২৫১

[১৬১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩৮৬-৩৯০ এখানে এরও সম্ভাবনা আছে, অনেকেই বিরোধিতায় একারণে যোগ দেননি যে, ইয়াজিদের পাপাচারের বিষয়টি তাদের কাছে প্রমাণিত ছিল না। যেমন: ধারণা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার ছিল। আর শিয়া মতবাদে মত্ত কিছু বিশ্লেষকের মতে ইয়াজিদের ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হওয়া ইসলামের মূলভিত্তির মতোই বিশ্বাস করে নিয়েছে। কারণ তাদের মতে যদি একে অস্বীকার করা হয় তাহলে সেই সকল সাহাবির ন্যায়পরায়ণতাই অস্বীকার করা হবে, যারা ইয়াজিদের শাসনকালে চুপ ছিলেন এবং অন্যদেরকেও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছিলেন। এই গবেষকরা বলেন ইয়াজিদকে ফাসেক মানলে এই সাহাবিদেরকে বেদীন মানা আবশ্যক হয়ে যায়। এখন আমরা যদি নবীজির সেসব হাদিস আমাদের সামনে থেকে সরিয়ে দিই, যেগুলোতে তিনি ফাসেক শাসকের বাইয়াত বাকি রাখা এবং তার অধীনে থেকে জিহাদ করা, সেই সাথে তার বিরোধিতা করা থেকে নিষেধ করেছেন তাহলে তাদের এই মন্তব্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। এক্ষেত্রে ইয়াজিদকে ফাসেক হিসেবে প্রমাণ করারও তেমন আর গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু যারা নবীজির এইসব সহিহ হাদিস মানে (আলেমগণ যেগুলোকে অস্বীকার করেন না) তারা তো এটা অবশ্যই মানবে যে, সাহাবায়ে কেরাম নবীজির হাদিস উপেক্ষা করবেন না। তারা তো এটাও দেখবেন না যে, শাসক কে? ফাসেক না সালেহ? তারা তো আল্লাহ এবং নবীজির ইরশাদেরই অনুসরণ করবেন। এবং সর্বাবস্থায় শাসকের অনুগত থাকবেন। এই কারণেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছিলেন যে, আমরা তাকে মানি মূলত আল্লাহ ও রাসুলের আদেশের কারণে। সুতরাং

অবশ্য হজরত মা'কিল ইবনে সিনান, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি-সহ মদিনার অন্য মনীষীগণ স্ব স্ব স্থানে সঠিকই ছিলেন। কারণ তাদের ইজতিহাদ ও চিন্তা অনুযায়ী শাসক তার সত্তাগত পাপাচার ও অপকর্মের কারণে ক্ষমতা থেকে অপসারণের উপযুক্ত হয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তোলা আবশ্যক হয়ে পড়ে।[১৬২]

যেহেতু ইয়াজিদের ব্যাপারে মদিনার এই সকল মনীষী নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, সে পাপাচারে মত্ত; তাই তারা এই আন্দোলনে অনড় ছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের শতভাগ নেক নিয়ত ছিল এবং এই যুদ্ধ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই ছিল।

আন্দোলনের সূচনা

মদিনার নেতৃস্থানীয় লোকজন এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই হুকুমতকে তারা খেলাফতে রাশেদার আদলে গড়ে তুলবেন। এবং পৈত্রিক ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে পুনরায় শুরাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেমতে তারা কেন্দ্রীয় হুকুমত প্রতিষ্ঠার বিষয়াবলি বিন্যস্ত করলেন, যাতে সকল মুহাজিরের কমান্ডার বানানো হলো মা'কিল ইবনে সিনান রা. কে। কুরাইশদের জন্য আলাদা আমির নিযুক্ত করা হলো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি' রা. কে। আর আনসারগণ সমবেত হলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে।[১৬৩]

তারা সকলে মিলে ইয়াজিদের গভর্নর উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু সুফিয়ান এবং বনু উমাইয়ার অন্যান্য সদস্যকে মদিনা থেকে বের করে দিলেন।[১৬৪]

কোনো কালেই শাসকের কোনো বিরোধিতা করা বা তার আনুগত্য থেকে সরার কোনো সুযোগ আর থাকে না।

[১৬২] অবশ্য পরবর্তীতে একশ্রেণির আলেমের কাছে ফাসেক শাসকের শাসন জায়েজ এবং আরেক শ্রেণির কাছে ওয়াজিব ছিল। শরহে আকাইদে নাসাফি : ৩৬৭ আহকামুল কুরআন লিলইমাম আল জাসসাস আর রাযি : ১/৮৫

[১৬৩] তারিখে খলিফা লি ইবনে খাইয়াত : ২৩৬

[১৬৪] তারিখে খলিফা : ২৩৬

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর-সহ অনেকেই এই আন্দোলন কোনো ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করেননি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তায়েফে অবস্থান করতেন। তিনিও তাদের সাথে একমত ছিলেন না। মোটকথা, মদিনাবাসীদের সরদার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রা. অনেক কঠিনভাবে লোকজনকে শামবাসীদের সাথে লড়াই করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। সকলের কাছ থেকে মৃত্যুর বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যাবো; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করব না। এভাবেই শুরু হলো যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি।[১৬৫]

---

[১৬৫] তারিখে খলিফা : ২৩৬

হাররার যুদ্ধ

ইয়াজিদের মধ্যে সিপাহিসুলভ উদ্যম ও উৎসাহের কমতি ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে ছিল একজন শাসক, যার জোশের চেয়ে হুঁশের অনেক বেশি প্রয়োজন। ধৈর্য এবং দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। তবে ইয়াজিদের সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ এটাই প্রমাণ করে যে, এসব গুণ ছিল তার ভেতরে অনুপস্থিত। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারেও তার থেকে তেমনই ভুল এবং ভারসাম্যহীন আচরণই প্রকাশ পেয়েছিল। যার ফল ছিল কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা। উচিত তো এটাই ছিল যে, সে কারবালার ঘটনার পর অনেক সতর্ক হবে এবং ভবিষ্যতে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শতবার ভাববে। কিন্তু আফসোস, যখন সে মদিনাবাসীদের বিরোধিতার কথা জানতে পারল তখন সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। সিদ্ধান্ত নিলো মদিনাবাসী এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে শাস্তি দেওয়ার জন্য। একই সাথে মক্কা ও মদিনায় আক্রমণ করবে। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনেই দামেশকের সাহাবিরা তাকে অনেক বোঝালেন এবং আবেদন করলেন যে, আপনি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুন।[১৬৬]

সাহাবি ও তাবেয়িদের পরামর্শ ও ইয়াজিদের উপেক্ষা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা. এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য একথাও বলেছেন যে, "এমন করে তুমি তোমার জীবনটাই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।"[১৬৭] কিন্তু কে শোনে কার কথা! ইয়াজিদ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায় একদম ভ্রুক্ষেপ করল না। হজরত সখর ইবনে উবায়েদ মাদানি রহ. অনেক বোঝালেন; কিন্তু

---

[১৬৬] তবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/১৪৫ তারিখে দিমাশক : ২৩/৪৭৪

[১৬৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/১৪৫

ইয়াজিদ তার নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলো।[১৬৮] হজরত নুমান ইবনে বাশির ইয়াজিদকে শত চেষ্টা করেও যখন বোঝাতে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি কোনো পথ না দেখে বললেন– "আচ্ছা, এই যুদ্ধের জন্য আমাকে পাঠান। আমিই যথেষ্ট।"[১৬৯] কিন্তু ইয়াজিদ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ধৈর্যশীল বা নম্র কাউকে নয়; বরং সে খুঁজছিল একজন পাথরদিল ও কঠোর মনের মানুষ, যে নির্ভয়ে আক্রমণ করে মক্কা-মদিনা তছনছ করে ফেলবে।

আক্রমণের প্রতি আমিরদের অনাগ্রহ এবং ইবনে জিয়াদের পরিষ্কার উত্তর

মক্কা ও মদিনা আক্রমণের কথা শুনে যে-কারো মন কেঁপে ওঠে। এজন্য ইয়াজিদের নির্দেশ সত্ত্বেও সেই আমিররাও রাজি হচ্ছিল না, যারা কঠোরতায় ছিল প্রসিদ্ধ। আমর ইবনে সাঈদের মতো ব্যক্তি, যে কি না দুই বছর আগেও মক্কায় সৈন্য পাঠিয়েছিল আক্রমণের জন্য, সেও সায় দেওয়ার সাহস করল না। সে সরাসরি না করে দিলো।[১৭০] সবশেষে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাঁধে এই দায়িত্ব অর্পণের চিন্তা করল ইয়াজিদ; কিন্তু কারবালার ঘটনার পর থেকে সে নিজের অসম্মান ও অপমানের জন্য ইয়াজিদকেই দায়ী করছিল। কারণ তাকে খুশি করার জন্যই এই দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটাতে হয়েছে। তাই এখন ইবনে জিয়াদ আবার সেই ইয়াজিদের কারণে আরো অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা নিজের

---

[১৬৮] তারিখে দিমাশক : ২৩/৪৭৪

[১৬৯] তারিখে দিমাশক : ২৩/৪৭৪

[১৭০] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৮৬; আন হুমাইদ আন জারির আন মুগিরা :

আহওয়ালুর রুয়াত : মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ রাযি; ২৪৮ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেছেন। তিনি ছিলেন ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর উসতাদ। যদিও তাকে যয়িফ বলা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ রহ. তাকে সিকাহ বলতেন। হাফেজ জাহাবি রহ. বলেছেন, তিনি সনদে এদিক-সেদিক করে ফেলতেন। কিন্তু মতনে কোনো এদিক-সেদিক হতো না। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৫০৪

জারির ইবনে আবদুল হুমাইদ আবু আবদুল্লাহ: তিনি ১৮৮ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন। বুখারি এবং মুসলিমের বিশ্বস্ত রাবি। মিযানুল ইতিদাল : ১/৩৯৪

মুগিরা ইবনে মিকসাম : ১৩৬ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন। বুখারি এবং মুসলিমের রাবি। ইবরাহিম নাখায়ি এবং ইমাম শা'বির শাগরেদ। তারিখুল ইসলাম : ৩/৭৭৮

কাঁধে নিতে চাইলো না। সেজন্য ইয়াজিদকে স্পষ্ট জানিয়ে বলল, "এই ফাসেকের (ইয়াজিদের) কারণে আমি এই দুই কাজ কখনোই একসাথে হতে দেবো না যে, আমার উপরই নবীজির নাতির শহিদ হওয়ার দায় বর্তাবে আবার বাইতুল্লাহ আক্রমণের দায়ভারও।"[১৭১]

---

[১৭১] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৮৪, ৩৮৫

ওয়াকিদির বর্ণনামতে মুসলিম ইবনে উকবার বয়স তখন ৯০ বছর ছিল। তারিখে দিমাশক : ৫৮/১০৫

কিন্তু ওয়াকিদির এই বর্ণনায় আপত্তি আছে। প্রথমত, সনদ খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়ত এমন একজন বৃদ্ধ মানুষকে এতো কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের দায়িত্ব দেওয়াটাও যুক্তিবিবর্জিত। তা ছাড়া বনু উমাইয়ার এক বিশেষ নীতি এই ছিল যে, তারা যুবকদেরকে বড় বড় দায়িত্ব দিতো। সুতরাং তাকে এই দায়িত্ব দেওয়ার কোনো কারণ আর থাকছে না। এখানে আরো আশ্চর্য হওয়ার মতো একটি বিষয় হলো, কেউ কেউ ওয়াকিদির এই বর্ণনাকে নসের পর্যায়ে মেনে নিয়েছে। এবং এখান থেকে 'ইশারাতুন নস'-এর মাধ্যমে মুসলিম ইবনে উকবাকে সাহাবি হিসেবে গণ্য করে; শুধু এজন্য যে, ইয়াজিদের এই জেনারেলকে রাজনীতিবিদদের মন্তব্য বৈধ করা যায়। একজন যয়িফ রাবির বর্ণনাকে পুঁজি করে তার উপর কল্পনার দুর্গ নির্মাণ করা এবং একজন খারাপ মানুষকে সাহাবি বানিয়ে তার জুলুম ও অন্যায়কে জায়েজ প্রমাণিত করা চরম ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই না।

রিজালশাস্ত্রজ্ঞ আলেমগণ ওয়াকিদির সনদের দুর্বলতার দিকে লক্ষ করে শুধু এতটুকু মেনে নিয়েছেন যে, মুসলিম ইবনে উকবার 'ইদরাক' অর্জন হয়েছিল। আর রিজালশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী 'ইদরাক' মানে শুধু নবীজির যুগকে পাওয়া বুঝায়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যকোনো দলিল না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সাহাবি হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। তাবাকাতে সাহাবা অনেক পুরাতন এক কিতাব; তাবাকাতে ইবনে সা'দ, মু'জামুস সাহাবা, আল-ইসতিয়াব এবং উসদুল গাবাহ। সেইসাথে আসমাউর রিজালের কিতাব যেমন: আসসিকাত, আলজারহু ওয়াত তাদিল এসব কিতাবের কোথাও মুসলিম ইবনে উকবাকে সাহাবিদের কাতারে জায়গা দেওয়া হয়নি। ইবনে আসাকির ইতিবাচক কথা বলেছেন; কিন্তু সেই রেওয়ায়েতকে আবার নাকচও করেছেন, সে নবীজিকে পেয়েছিল; কিন্তু দেখেনি। তারিখে দিমাশক : ৫৮/১০২; অনেকে তো এই মুসলিম ইবনে উকবাকে এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে, তাকে মুসলিমের বদলে মুসরিফ ইবনে উকবা বলতেন। তারিখুল ইসলাম : ৫/২৩৪; সাহাবি হওয়ার দাবি হাফেজ জাহাবিও করেননি। হাফেজ ইবনে হাজার 'আল-ইসাবাহতে' মুসলিম ইবনে উকবার আলোচনা এজন্য করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপগুলো যেন সামনে এসে যায়। তিনি মুসলিমকে কখনোই সাহাবি আখ্যা দেননি। আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। কারণ যারা ইমাম যুহরিকে পর্যন্ত শিয়া আখ্যা দেয় এবং তার বর্ণনাকে গ্রহণের অনুপযুক্ত গণ্য করে, সেখানে তারা ওয়াকিদির মতো একজন রাবির বর্ণনাকে বিশ্বাস করে এবং তার উপর ভিত্তি করে মুসলিম ইবনে উকবাকে সাহাবি বানিয়ে দেয়। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের সাথে এরচেয়ে বড় বেয়াদবি কী হতে পারে যে, একজন জালিমকে তারা সাহাবিদের কাতারে শামিল করে দেয়।

ইয়াজিদ সকলের অবস্থা দেখে সর্বশেষ এই দায়িত্ব দিলো মুসলিম ইবনে উকবার মতো ভয়ংকর ও পাথরদিল মানুষকে।[১৭২] সেইসাথে গুরুত্ব দিয়ে জানিয়ে দিলো যে, মদিনার সম্প্রদায়কে তুমি তিনবার আহ্বান করবে। যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে তাহলে তুমি তাদের থেকে আনুগত্য গ্রহণ করবে এবং তাদের থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় তুমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি তাদের উপর জয় লাভ করো তাহলে মদিনাকে তিনদিন হালাল ঘোষণা করবে। এতে টাকাপয়সা, অস্ত্রশস্ত্র মোটকথা যা পাবে সেগুলো হবে সৈন্যদের। তারপর লোকজন থেকে বিরত থাকবে। আর আলি ইবনে হুসাইন (যাইনুল আবেদিন)-এর প্রতি খেয়াল রাখবে এবং তার থেকে বিরত থাকবে। তার কল্যাণ কামনা করবে। কেননা, তিনি ঐসবে প্রবেশ করেননি, যাতে অন্যরা প্রবেশ করেছে।[১৭৩]

এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। এইসমস্ত সৈন্য মদিনার সংখ্যা থেকে অনেক বেশি ছিল। কারণ মদিনায় লড়াই করার মতো লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ হাজার।[১৭৪]

মদিনার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে জ্বলে যাওয়া সারিবদ্ধ কিছু টিলা ছিল, যেগুলোকে হাররা বলে ডাকতো সবাই। কারণ এক সময় এখানে আগুন লেগে সব পুড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই এই স্থানটা হাররা নামেই পরিচিত।[১৭৫] মদিনাবাসীগণ খন্দকযুদ্ধের মতো খনন করে শহর আগলে রেখেছিল, যেন যুদ্ধটা এভাবেই পরিচালনা করা যায়। তবে পূর্বদিকে হাররা অঞ্চলের দিকটা খোলা ছিল। মদিনাবাসীরা শামের সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য এখানেই এসে সমবেত হয়েছিলেন। শামের সৈন্যরাও এদিক দিয়ে এসে মদিনাবাসীদের মুখোমুখি হলো।[১৭৬]

---

[১৭২] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩২২, ৩২৩ তারিখুল ইসলাম : ৫/২৫; এই বর্ণনা যদিও যয়িফ; কিন্তু ইমামগণ এব্যাপারে একমত যে, ইয়াজিদই এই নির্দেশ দিয়েছিল। সেই হিসেবেই এখানে ইয়াজিদের দিকে লক্ষ করেই এই শব্দ বলা হয়েছে।

[১৭৩] তারিখে খলিফা : ২৩৭, ২৩৮

[১৭৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/১৪৬

[১৭৫] মু'জামুল বুলদান : ২/২৪৯

[১৭৬] তারিখে খলিফা : ২৩৮

তুমুল যুদ্ধ; ইবনে হানজালা রা. এর সাহসিকতা

মদিনাবাসীদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত দেখে তারা নিজেরাই ঘাবড়ে গেলো। তা ছাড়া মদিনার সম্মানের কারণেও তারা কিছুটা শংকিত ছিল। এটা দেখে মুসলিম ইবনে উকবা নিজের সিংহাসন সৈন্যদের সারির মাঝামাঝিতে নিয়ে গেলো এবং চিৎকার করে বলল, "এখন আমাকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করো।" তখন শামের সৈন্যরা জোরদার হামলা শুরু করল এবং উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেলো।[১৭৭]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রা. এই অবস্থায় নিজের সাত ছেলেকে এক এক করে পাঠালেন এবং তাদের সকলেই যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলো।[১৭৮]

এই সময় মদিনার বনু হারিসা গোত্র শামের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিলো এবং তাদেরকে মদিনার ভেতরে প্রবেশের সুযোগ করে দিলো। যখন মদিনার স্বাধীনতাকামী জনতা শহরের অভ্যন্তর থেকে তাকবিরধ্বনি শুনলো তখন তারা বুঝতে পারল যে, শত্রুরা শহর দখল করে নিয়েছে। ফলে সবাই সটকে পড়তে থাকল। শুধু কিছু সাহাবি এবং তাদের সন্তানরা ময়দানে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।[১৭৯] পেছনে পলায়নের সময় প্রচুর লোক সেই খন্দকে পড়ে গেলো, যা শহরের সুরক্ষার জন্য খনন করা হয়েছিল। যারা খন্দকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল, তাদের সংখ্যা নিহতদের থেকে অনেক বেশি ছিল।[১৮০] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দলে শুধু পাঁচজন বাকি ছিলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহর শপথ, এখন আমাদের কেউই আর বেঁচে থাকতে পারবে না। এখন কীসের উপর ভরসা করে লড়াই করব?

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রা. উত্তর দিলেন, "এখনো তির অবশিষ্ট আছে। আর আমরা তো মৃত্যুর অঙ্গীকার করেই বের হয়েছি।" এই কথা বলে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লড়াই করতে করতে

---

[১৭৭] তারিখে খলিফা : ২৩৮

[১৭৮] তারিখে খলিফা : ২৩৮

[১৭৯] তারিখে খলিফা : ২৩৮

[১৮০] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৯৫

শহিদ হয়ে গেলেন।[১৮১] এই মর্মন্তুদ ঘটনা ২৭ জিলহজ ৬৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।[১৮২]

মদিনাবাসী শহিদের সংখ্যা

হাররার ঘটনা একটি লেলিহান অগ্নিশিখার মতো এসে মুহাজির এবং আনসারদের সুশোভিত ফুলবাগান মুহূর্তেই উজাড় করে দিলো। ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে হাররায় শহিদের সংখ্যা ৭০০ ছিল, যারা ছিলেন কুরআন মাজিদের হাফেজ ও কারি।[১৮৩]

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম

হাররার যুদ্ধে কমপক্ষে পাঁচজন মাদানি সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজন শহিদ হয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে। একজনকে বন্দি করে শহিদ করে দেওয়া হলো। আরেক সাহাবি তখন যুদ্ধে শরিক হননি। পরবর্তীতে তাকে ঘর থেকে ডেকে এনে শহিদ করে দেওয়া হয়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের নাম নিম্নে দেওয়া হলা :

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রা.। আনসারদের সরদার। তিনি এই যুদ্ধেই শহিদ হন।[১৮৪]
২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম রা.। এই সাহাবি একসময় ওয়াহশি রা. এর সাথে মিলে মুসাইলামা কাজ্জাবকে

---

[১৮১] তারিখে দিমাশক : ২৭/৪৩০; তারিখে খলিফা : ২৩৮

[১৮২] তারিখে খলিফা : ২৪৫-২৫০

[১৮৩] আল মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ : ৩/৩২৫; তারিখে দিমাশক: ৫৪/১৮৩; তারিখু ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৩০; এই বর্ণনার সনদ সহিহ এবং মুত্তাসিল। ইমাম মালেক রহ.-এর পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তবে অন্যান্য রাবির অবস্থা নিম্নরূপ :
মুহাম্মদ ইবনে যাহ্হাক : একজন সিকাহ রাবি: আস সিকাত লি-ইবনে হিব্বান : ১৫১৭৪
ইবরাহিম ইবনে মুনযির আল মাদানি : তিনি বুখারির একজন রাবি : সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৩/১৮০
এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, ওয়াকিদি মহিলা এবং বাচ্চাদের নিয়ে সর্বমোট সংখ্যা হিসেব করেছে দশ হাজার। আল-মিহান : ১৮৪; ওয়াফাউল ওয়াফা : ১০৭; তবে এই বর্ণনাটা ওয়াকিদির কারণে দুর্বল। এমনিভাবে রক্তের নদী বয়ে যাওয়ার যেই বর্ণনা প্রসিদ্ধ আছে, তা এতই দুর্বল যে, সেটাকে মাওযু বলে আখ্যায়িত করা হয়।

[১৮৪] তারিখে দিমাশক : ২৭/৪৩০

জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাফেজা হজরত উম্মে উমারার বংশধর। তার থেকে অজুর সুন্নাত তরিকা সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[১৮৫] তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রেই শহিদ হন।

৩. হজরত আবু হালিমা মুআয ইবনুল হারেস, হজরত উমর রা. অসাধারণ সুন্দর তেলাওয়াতের জন্য যাকে তারাবির ইমাম নিয়োগ দিয়েছিলেন।[১৮৬] তিনিও ময়দানে শহিদ হয়েছিলেন।
৪. হজরত মা'কিল ইবনে সিনান। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় বনু আসজার পতাকা উত্তোলনকারী ছিলেন। যুদ্ধের পর বন্দি হন। ইয়াজিদের সিপাহসালার মুসলিম ইবনে উকবা তাকে শহিদ করে।[১৮৭]
৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি। তিনিই একমাত্র সাহাবি, যিনি যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন।[১৮৮]
৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামার ভাগিনা। তাকে যুদ্ধের পর ঘর থেকে ডেকে এনে শহিদ করা হয়।[১৮৯]

প্রসিদ্ধ মুহাজির শহিদগণ

সাহাবায়ে কেরামের সন্তান এবং আত্মীয়স্বজন যারা সেই যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা শতেরও উপরে। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন–

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র আবদুল্লাহ।
২. হারেসের প্রপৌত্র ফজল।
৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হজরত জাফর ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবু বকর।

---

[১৮৫] রিজালু সহীহিল বুখারি : ১/৩৮৯
[১৮৬] তাকরিবুত তাহযিব : তরজমাহ নং, ৬৭২৭
[১৮৭] তারিখে খলিফা : ২৫০
[১৮৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/১৪৭
[১৮৯] তারিখে খলিফা : ২৩৯

৪. হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তিন পৌত্র, আবু বকর, আবদুল্লাহ, সুলাইমান।

৫. উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বৈপিত্রেয় ভাই মুসা ইবনুল হারেস।

৬. উম্মুল মুমিনিন হজরত সাওদা বিনতে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই আবদুর রহমান এবং তার তিন ভাতিজা। রবিয়া, আমর ও আবদুল্লাহ।

৭. উম্মুল মুমিনিন হজরত সাওদা বিনতে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা। হজরত আবদুর রহমান ইবনে হুয়াইতাব রা. এবং তার ছেলে আবদুল মালেক।

৮. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে যায়েদ এবং তার তিন ভাতিজা, আবান, ইয়ায ও মুহাম্মদ।

৯. হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই ছেলে, উমাইর ও আমর। তিনজন ভাতিজা, ইসহাক, ইমরান ও মুহাম্মদ।

১০. হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে উমর অথবা আমর এবং তার পৌত্র আবু বকর।

১১. হজরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র আবদুল্লাহ।

১২. হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে মুহাম্মদ।

১৩. হজরত উতবা ইবনে গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে উবাইদুল্লাহ।

১৪. বনু যামআর ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ, ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবু সালামা ইবনে আবদুল্লাহ, মিকদাদ বিন ওয়াহাব, খালেদ বিন আবদুল্লাহ। আর সামগ্রিকভাবে কুরাইশগোত্রের ৯৭ জন সদস্য শহিদ হয়েছেন।[১৯০] আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

---

[১৯০] তারিখে খলিফা : ২৪০-২৪৫ আলইবার লিযযাহাবি : হাওয়াদেস ৬৩ হিজরি। তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/২৯-৩০ হাওয়াদিস : ৬৩ হিজরি।

প্রসিদ্ধ আনসার শহিদগণ

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাত সন্তান, যাদের ছয়জনের নাম পাওয়া যায়। আবদুর রহমান, হারেস, হাকিম, আসেম, ইয়াহইয়া ও আবদুল্লাহ।

২. কারী কাসির ইবনে আফলা রহ.। তার মাধ্যমে হজরত উসমান রা. কুরআন মাজিদের আসল নোসখা তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[১৯১]

৩. হজরত সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবদুল্লাহ।

৪. হজরত উসমান ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই ছেলে সাহাল ও মুহাম্মদ।

৫. হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাঁচ সন্তান সাঈদ, সুলাইমান, যায়েদ, ইয়াহইয়া, আবদুল্লাহ।

৬. হজরত আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর চার সন্তান মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ, জাবের, মুয়াবিয়া, উমারাসহ পরিবারের সব মিলিয়ে ১০জন শহিদ হয়েছেন।

৭. হজরত আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর তিন পৌত্র আবদুর রহমান, উসমান, আবদুল মালেক।

৮. হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে মুহাম্মদ।

৯. হজরত হাসসান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র ইসমাইল।

১০. হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই ছেলে আবদুল্লাহ ও ইয়াহইয়া।

১১. হজরত সাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর তিন ছেলে মুহাম্মদ, ইয়াহইয়া ও আবদুল্লাহ।

১২. হজরত উবাদা ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র নাওফাল।

১৩. হজরত কা'ব ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে মুহাম্মদ।

১৪. হজরত রিফাআ ইবনে রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে হারেস।

১৫. বনু হারেসা ইবনে হারেসের আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাহাল, কেনানা ইবনে সাহাল, আবদুল্লাহ ইবনে আউলিস, সাহাল ইবনে আবি উমামা। আনসারদের মোট ১৭৬ জন শহিদ হয়েছেন। আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

---

[১৯১] আল ইবার : ১/৫০

হাররার ঘটনা ইসলামি ইতিহাসে সেই কালো অধ্যায়, যেখানে মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের সন্তানদের প্রায় অধিকাংশই শহিদ হয়েছিলেন। এজন্যই হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. বলতেন, প্রথম ফেতনা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মাধ্যমে এসেছিল। যার ফলে আসহাবে বদরের আর কেউ বেঁচে থাকল না। এর পরের ফেতনা হয়েছিল হাররায়। যার ফলে হুদাইবিয়ার সন্ধি-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কেউ বাকি থাকল না। এরপর তৃতীয় ফেতনা (হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আমিরদের বিদ্রোহ) যখন সংঘটিত হলো, তা আটকানোর পূর্বে লোকদের মাঝে তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট রইলো না।[১৯২]

মদিনাবাসীদের উপর শামের সৈন্যদের জুলুম

মদিনাবাসীদের পরাজিত করে মুসলিম ইবনে উকবা শহরে প্রবেশ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদের সম্মানে যা বলেছিলেন, তখন সে তা একেবারেই ভুলে গেলো। নবীজি মদিনাবাসীর ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের ভীতসন্ত্রস্ত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন এবং তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লানত বর্ষণ হবে। [১৯৩]

যদি শামের সৈন্যরা শুধু যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলেও একটা কথা ছিল। তা ছাড়া এটাও বলা সম্ভব ছিল যে, তারা মূলত একটি বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে এসেছিল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তারা যুদ্ধজয়ের পর মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে মদিনায় সৈন্যরা টানা তিনদিন লুটপাট চালালো।[১৯৪] এই তিনদিন মসজিদে নববিতে আজান ও ইকামত দেওয়ার কেউ ছিল না।

---

[১৯২] সহিহ বুখারি : ৪০২৫; কিতাবুল মাগাজি। বুখারির অনেক শরাহ যেমন, আল্লামা কিরমানি এবং আল্লাম কাওরানি রহ. তৃতীয় ফেতনার ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, এর দ্বারা হাজ্জা কর্তৃক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং তার সাথিদের হত্যা করাই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া বিভিন্ন আলামত দ্বারাও একথা বুঝে আসে। আল কাওয়াকিবুদ দুরারি : ১৫/১৯৬; আল কাউসারুল জারি ইলা রিয়াদি আহাদিসিল বুখারি : ৭/১৫৬

[১৯৩] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ৭/১৪৩

[১৯৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৩৮; আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২

শুধু হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. সারাদিন সেখানেই পড়ে থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো তখন তিনি রওজার কাছে গিয়ে হালকা আওয়াজে আজান দিতেন এবং নামাজ পড়ে নিতেন।[১৯৫] সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী যেসব সাহাবি যুদ্ধে শরিক হননি, তারাও শামের সৈন্যদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেলেন না। প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল আনসারি রা. তখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তার দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তিনি যুদ্ধেও শরিক হননি। কিন্তু তার ঘরেও শামি সৈন্যরা লুটপাট চালালো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে একটি উট কিনে মূল্য হিসেবে যেই দিরহামগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্য থেকে তিনি নবীজির স্মৃতি হিসেবে কিছু রেখে দিয়েছিলেন। শামি সৈন্যরা সেগুলোও লুট করে নিয়ে যায়।[১৯৬] সেই যুদ্ধের দিনই হজরত জাবের রা. তার দুই ছেলে মুহাম্মদ ও আবদুর রহমানের কাঁধে ভর করে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার পায়ে একটি পাথরের আঘাত লাগায় তিনি অনিচ্ছাতেই বলে উঠলেন, "সেই ব্যক্তি যেন ধ্বংস হয়ে যায়, যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভয় দেখিয়েছে।" তখন তার এক ছেলে বলল, আব্বাজান, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কি কেউ ভয় দেখাতে পারে? এই সাহাবি তখন বললেন, "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যেই ব্যক্তি আনসারদের এই গোত্রকে ভীতিপ্রদর্শন করবে সে যেন আমার এই অন্তরকেই ভীতিপ্রদর্শন করল।"[১৯৭] তখন মদিনার অবস্থা এমন ছিল যে, লোকজন ইজ্জত-সম্মান ও প্রাণনাশের ভয়ে পাহাড় ও জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল। শামের সৈন্যরা তাদের খুঁজে বের করতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফকিহ হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. ছিলেন। তিনি একটি গোহার আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু এক লোক তাকে দেখে এক শামি সৈন্যকে বলে দিলো। তারপর সৈন্য তলোয়ার নিয়ে গুহার মুখে এসে চিৎকার করে বলল, "কে আছো, বের

---

[১৯৫] সুনানুদ দারেমি : ১/২২৭

[১৯৬] সহিহ বুখারি : ২৬০৪ কিতাবুল হিবাহ।

[১৯৭] মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি : ১৮৬৭; এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ; তবে তালেব ইবনে হাবিবের ব্যাপারে কিছু কথা আছে। ইবনে হাজার বলেছেন, "সদুকুন বিহিম" তাকরিবুত তাহযিব : ৩০০৭; মুসনাদে আহমাদ : ১৪৮১৮

হয়ে আসো।” হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. নিজের তরবারি হাতে নিলেন এবং বললেন, “আমি বের হবো না। যদি তুমি ভেতরে আসো তাহলে তোমাকে আঘাত করব।” কিন্তু শামি সৈন্য যখন সত্যি সত্যিই ভেতরে প্রবেশ করল তখন তিনি আখেরাতের ফিকিরে মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তরবারি হাত থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, “এই নাও! তুমি আমার এবং তোমার গুনাহ মাথায় নিয়ে জাহান্নামি হয়ে যাও।” এই কথা শুনে সৈন্য খুব লজ্জা পেয়ে গেলো এবং বলল, “আপনি কি আবু সাঈদ খুদরি?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” তখন সৈন্য বলল, “আপনি আমার জন্য ইসতিগফার করুন।” হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. বললেন, “আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন।”[১৯৮]

---

[১৯৮] তারিখে খলিফা : ২৩৯; এখন এখানে যে বিষয়টা রয়ে যায়; সেটা হলো এই লুটতরাজের হুকুম নিজের পক্ষ থেকে দিয়েছিল নাকি ইয়াজিদের নির্দেশেই এমন ছিল? এব্যাপারে যতদূর খুঁজে পাওয়া যায়, ইয়াজিদের পক্ষ থেকে এই নির্দেশের বর্ণনা হয়তো আবু মিখনাফের থেকে পাওয়া যায়-তারিখুত তাবারি : ৫/৪৮৪-৪৮৭; আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩২২-৩২৩; অথবা ওয়াকিদির বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৬৪; তারিখে দিমাশক : ৫৮/১০৬; যেহেতু এসব বর্ণনায় সাহাবিদের উপর কোনো অপবাদ নেই; তাই এটাকে পূর্বসূরিদের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী নিশ্চিতভাবেই গ্রহণ করা যায়। তা ছাড়া চিন্তা করলেও বুঝা যায় যে, মুসলিম ইবনে উকবা ইয়াজিদের অনুমতি ছাড়া এতো বড় অন্যায় করা অনেক দূরের বিষয়। কারণ কারবালায় যা ঘটেছিল, সেটা যদি তার ইচ্ছার বিরোধী হতো তাহলে সে অবশ্যই প্রতিটি সৈন্যকে এক্ষেত্রেও খুব সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতো। বিশেষত মদিনার বিষয়ে সে যতই সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতো সেটাই অনেক কম হতো। কিন্তু মুসলিম ইবনে উকবা স্বাধীনতার সাথে অত্যাচার করেছে মদিনাবাসীর উপর। যদি সে শাসককে ভয়ই করতো এবং তার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত না পেতো তাহলে সে এমনটা কখনোই করতে পারতো না। যেমন ইবনে জিয়াদ পূর্বে তার ইঙ্গিত কিংবা আদেশ পেয়েই কারবালার ঘটনা ঘটিয়েছিল। এই কারণে ইয়াজিদকে যেমন হজরত হুসাইন রা.-এর শাহাদাতের ব্যাপারে মুক্ত করে দেওয়া যায় না তেমনই মদিনার এই বিষয়টাতে এসেও তাকে অপরাধমুক্ত বা পবিত্র বলাও চলে না। সেই কারণেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, সে-ই (ইয়াজিদই) মদিনায় এসব করেছে। তখন কেউ তাকে জিজ্ঞাস করল, ইয়াজিদ কী কী করেছে? তিনি বললেন, সে মদিনায় লুটতরাজ করেছে। আসসুন্নাতু লিলখাল্লাল : ৮৪৫; ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যথাসম্ভব ইয়াজিদের প্রতি রাফেজিদের পক্ষ থেকে আরোপিত অপবাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই তিনি নিজেও এখানটায় এসে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইয়াজিদ মদিনায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করল এবং তাদেরকে নির্দেশ দিল, যদি তারা তিনদিনের মধ্যে আনুগত্য প্রকাশ না করে তাহলে তলোয়ারের জোর দিয়ে মদিনায় প্রবেশ করবে এবং সেখানে তিনদিন পর্যন্ত লুটতরাজ চালাবে। মাজমুউল ফাতাওয়া : ৩/২১২

মোটকথা, মদিনার এমন কোনো ঘর ছিল না, যাতে শামি সৈন্যরা লুটপাট চালায়নি। তবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং হজরত আলি ইবনে হুসাইন (যাইনুল আবেদিন) সেই সাথে আরো কিছু বড় ব্যক্তিত্ব তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এসব লুটপাট ও যুদ্ধশেষে মদিনার এমন অবস্থা হলো যে, বেশ কিছুদিন দুর্ভিক্ষ চললো। এমনকি সাধারণ মানুষ সামান্য খাবারের জোগাড় করতে না পেরে মদিনা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছিল। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. তাদেরকে নবীজির শাফায়াতের সুসংবাদের কথা শোনালেন,[১৯৯] যেন তারা ধৈর্যধারণ করে এবং এখানেই থেকে যায়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কিছু লোক মদিনা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ চাইলে তিনি তাদেরকে মদিনায় অবস্থানের ফজিলত শোনালেন এবং চলে-যাওয়া থেকে বিরত রাখলেন।[২০০]

শামের সৈন্যরা কি কাফের ছিল?

একথা প্রকাশ্য সত্য যে, শামের সৈন্যরা কাফের ছিল না; বরং তারা মুসলমানই ছিল। তাদের মধ্যে এমনও নেককার লোক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, যারা এই যুদ্ধকে ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখার কথা মনে করে যুদ্ধে শরিক হয়েছে। যেমনঃ সাধারণ সিপাহিরা মূলত পুরস্কার এবং গনিমতের জন্য এসেছে। বাহ্যত যদিও তারা লুটপাট ও রক্ত ঝরিয়েছে। কারণ, তাদেরকে যখন এসব করার অনুমতি দেওয়া হলো তখন তারা সেই সুযোগ কাজে লাগালো। তা ছাড়া তারা অনেক পূর্ব থেকেই মদিনার লোকদের বিদ্রোহী হিসেবেই জানে।

মোটকথা, এই লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড খুবই দুঃখজনক এবং শরিয়তের দৃষ্টিতেও ছিল সম্পূর্ণ নাজায়েজ। কারণ, মদিনার আদব ও সম্মান বজায় রাখা ছিল ওয়াজিব।

মুসলিম ইবনে উকবার জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ

বিজয়ের নেশায় উন্মাদ মুসলিম ইবনে ইয়াজিদ মদিনায় প্রবেশ করল এবং জোরপূর্বক ইয়াজিদের বাইয়াত নিলো। এক্ষেত্রেও সে বেশ

---

[১৯৯] সহিহ মুসলিম : ৩৪০৫ কিতাবুল হজ্জ।
[২০০] সহিহ মুসলিম : ৩৪১১ কিতাবুল হজ্জ।

কঠোরতার পরিচয় দিয়েছিল। যাদের ব্যাপারে তার সামান্যও সন্দেহ হচ্ছিল, তাদেরকেই সে একত্র করে বলছিল, তোমরা এই কথার উপর বাইয়াত গ্রহণ করো যে, তোমরা ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার গোলাম। সে তোমাদের জীবন এবং যাবতীয় বিষয়ে যা ভালো মনে করবে, তাই সিদ্ধান্ত নেবে।[২০১]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ রা. ছিলেন হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা।[২০২] তিনিও মুসলিম ইবনে উকবার কাছে এলেন বাইয়াত গ্রহণের জন্য। যদিও তিনি ইয়াজিদের পুরোনো বন্ধু ছিলেন; কিন্তু তরপরেও মুসলিম ইবনে উকবা তার সাথে খুব রূঢ় আচরণ করল এবং বলল, "আপনি এ কথার বাইয়াত গ্রহণ করুন যে, আপনি আমিরুল মুমিনিনের গোলাম। তিনি আপনাদের রক্ত, জীবন, সম্পদ মোটকথা সব বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ রা. প্রতিউত্তরে বললেন, "আমি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণের উপর বাইয়াত গ্রহণ করছি।"

মুসলিম ইবনে উকবা একথা শুনে জ্বলে উঠল এবং তাকে হত্যার আদেশ দিলো। তখন মারওয়ান ইবনে হাকাম লাফ দিয়ে এসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ রা. কে জড়িয়ে ধরলেন এবং হত্যার নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু মুসলিম ইবনে উকবা কোনো কথাই কানে নিলো না। শেষ পর্যন্ত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ রা. কে শহিদ করেই ক্ষান্ত হলো।[২০৩]

মুসলিম ইবনে উকবা মদিনার মহান তাবেয়ি হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. কেও হত্যার ইচ্ছা করল। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে শপথ করে আশ্বস্ত করল যে, তিনি একজন পাগল মানুষ। এরপর মুসলিম ইবনে উকবা হত্যার সিদ্ধান্ত প্রত্যার করল।[২০৪]

---

[২০১] তারিখে খলিফা : ২৩৯ আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩৩৫ তারিখুত তাবারি : ৫/৪৯৫

[২০২] উসদুল গাবাহ : ৩/২৪৬ আল-ইসাবাহ : ৪/৮৩

[২০৩] তারিখে খলিফা : ২৩৯

[২০৪] তাযকিরাতুল হুফফাজ লিয যাহাবি : ১/৪৫

ইয়াজিদের বাইয়াতকে হজরত উম্মে সালামার 'ভ্রষ্ট বাইয়াত' হিসেবে আখ্যাদান

বাইয়াতের জন্য তাদেরকেও ডাকা হলো, যারা এই বিরোধিতায় বিন্দুমাত্র শরিক ছিল না। সে কারণে উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা-সহ মদিনার প্রবীণ সাহাবিগণও খুব বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এমন জোরপূর্বক বাইয়াতকে 'বাইয়াতে দলালা' হিসেবেই আখ্যা দিলেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, এই বয়ানটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং চিন্তার উপযুক্ত। তিনি বলেন, "মুসলিম ইবনে উকবা যখন মদিনায় এলো তখন সবার থেকেই জোরপূর্বক বাইয়াত নিলো। এই ঘটনা ছিল হাররার পরে। মুসলিম ইবনে উকবার কাছে বনু সালামাও এসেছিল। তিনি বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত জাবের না আসবে ততক্ষণ আমি কিছুতেই বাইয়াত হবো না।" হজরত জাবের বলেন, "আমি মূলত এই বিষয়ে পরামর্শের জন্য হজরত উম্মে সালামার কাছে গিয়েছিলাম। সব শুনে হজরত উম্মে সালামা রা. বললেন, "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বাইয়াতটা ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত বাইয়াত। কিন্তু আমি আমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াকে আদেশ দিয়েছি, সে যেন মুসলিম ইবনে উকবার কাছে যায় এবং বাইয়াত গ্রহণ করে নেয়।" হজরত জাবের রা. বলেন, আমি তারপর গিয়ে বাইয়াত হয়ে গেলাম।[২০৫]

বাস্তবে হাররার ঘটনায় মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্ব এমন দুঃখজনক ছিল, যাতে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল না। এজন্যই উম্মাহর আলেমগণ তাকে 'মুসরিফ ইবনে উকবা' বলেই স্মরণ করেছেন।[২০৬]

শামি সৈন্যরা কি মদিনার নারীদের ইজ্জত-আবরুও লুণ্ঠন করেছিল?

একথা প্রসিদ্ধ যে, শামি সৈন্যরা মদিনার নারীদের উপরও আক্রমণ করেছিল এবং তাদের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন করেছিল। কিন্তু ইতিহাসের পুরোনো উৎসগ্রন্থ, যেমন, তারিখে তাবারি, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, আনসাবুল আশরাফ, তারিখে খলিফা এসব গ্রন্থে এমন কোনো ঘটনার কথা উল্লেখ নেই। ওয়াকিদি এবং আবু মিখনাফও এমন কিছু বর্ণনা করেননি। এই

---

[২০৫] এটা বিশুদ্ধে সনদে ইবনে হাজার বর্ণনা করেছেন। আল-ইসাবাহ : ৪/১১

[২০৬] দালাইলুন নবুওয়াহ লিলবাইহাকি : ৬/৪৭৫ সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩২৩

বিষয়টা শুধু আলমাদায়েনির এক বর্ণনায় পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, হাররার ঘটনার পর প্রায় এক হাজার নারী বিবাহ ছাড়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ করেছিলেন।[২০৭]

দ্বিতীয়ত, ইমাম বাইহাকি রহ. মুগিরা ইবনে মাকসাম (মৃত্যু : ১৩৬ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেছেন, মুগিরার ধারণা হলো সেখানকার প্রায় এক লাখ কুমারীর সাথে জিনা করা হয়েছিল।[২০৮]

এখন যদি একটু চিন্তা করা হয় তাহলে ফল এটাই বের হবে যে, আসলে তখন এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়া ছিল খুবই দূরবর্তী বিষয়। কারণ মুসলিম. সৈন্যরা বারবার কাফেরদের সাথে লড়াই করে তাদেরকে পরাজিত করেও তাদের মহিলাদের সাথে এমন কিছু করার ইতিহাস নেই। তাহলে সেসব মুসলিম সৈন্য এবং ইসলামি শহর তার উপর মদিনার মতো পবিত্র শহর সেখানে এমন প্রকাশ্য গুনাহের ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে!! তবে হ্যাঁ, একেবারে যে কিছুই হয়নি তা নয়। অমন বিচ্ছিন্নভাবে দুয়েকটা ঘটনা ঘটেছে এটা সত্য। যেমন হজরত উম্মুল হাইসাম বিনতে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে একদিন এক মহিলা হাররার দিনে তার ইজ্জত লুণ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে বলেছে।[২০৯]

এক বর্ণনায় আছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি' এক ঘরে লুকিয়ে ছিলেন। সেখানে এক শামি সৈন্য প্রবেশ করে বাড়ির মহিলার সাথে খারাপ কাজের অনেক চেষ্টা করল। তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি' রা. তাকে হত্যা করে ফেললেন।[২১০] সম্ভবত এই কারণেই শুধু ইবনে হাজারই নয়; বরং ইমাম ইবনে তাইমিয়াও বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনা স্বীকার করেছেন।[২১১] তবে একথা সত্য যে, দুয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা

---

[২০৭] আল-মুনতাযিম লিইবনে জাওযি : ৬/১৫; তিনি আলমাদায়েনির কিতাব আল হাররাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনার সনদ দুর্বল এবং মুনকাতি।

[২০৮] দালাইলুন নবুওয়াহ : ৬/৪৭৫; এই বর্ণনার সনদ দুর্বল এবং মুনকাতি।

[২০৯] আল-মুনতাযিম : ৬/১৫ ওয়াফাউল ওয়াফা : ১/১৩৪

[২১০] আল-ইসাবাহ : ৫/২১-২২

[২১১] মাজমুউল ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়া : ৩/৪১২

বর্ণনাকারীদের অবস্থা

আবদুর রাযযাক : তিনি সর্বসম্মতিক্রমে একজন সিকাহ রাবি।

থাকলেও ব্যাপকভাবে এই ঘটনা ঘটার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া যদি এমনই হতো তাহলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান অবশ্যই পরিবর্তন হতো। অথচ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হাররার ঘটনার পরেও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতিকে মক্কায় যেতে নিষেধ করেন এবং ইয়াজিদের অনুগত থাকার পরামর্শ দেন।[২১২]

হাররার ঘটনা সম্পর্কে হজরত আবু হুরাইরার সতর্কবাণী

যখন হাররার ঘটনা ঘটলো তখন সাহাবায়ে কেরামের নবীজির কিছু সতর্কবাণীর কথা স্মরণ হলো। তাদের কাছে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া এই ধমকির উপযুক্ত ছিল। মদিনার বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী আবু আবদুল্লাহ কিরায থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইয়াজিদের ব্যাপারে হজরত আবু হুরাইরা রা. কে একথা বলতে শুনেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই মদিনার অধিবাসীদের সাথে কোনো মন্দের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে মিশিয়ে দেবেন যেমন লবণ পানিতে মিশে যায়।[২১৩]

হাররার ঘটনায় ইয়াজিদের প্রভাব

হাররার ঘটনার ব্যাপারে ইয়াজিদের পক্ষ থেকে মুসলিম ইবনে উকবার এই জুলুম ও অপকর্মের জন্য কোনো নিন্দা প্রকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়

আবু মা'শার নাজিহ ইবনে আবদুর রহমান : তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রহ.-এর মতে 'সদুক।' আর সাওরী রহ.-এর মতে 'সালেহ।' আর ইয়াহয়া ইবনে মাইন রহ.-এর মতে যয়িফ। তাহযিবুল কামাল : ২৯/৩২৬

আবু আবদুল্লাহ আল কিরায : তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সিকাহ। মুসলিম এবং নাসায়ির বর্ণনাকারী। যদি তার কোনো মুতাবে থাকতো তাহলে তা সহিহ লিগাইরিহি হতো। তবে দুর্বলতা শুধু আবু মা'শারের ক্ষেত্রে কিছু ছিল। তাও তা মুখস্থশক্তি কম থাকার কারণে। মিথ্যা বা ফিসকের কারণে নয়। সুনানুত তিরমিজি : ২১৩০; তা ছাড়া তার ভুলে যাওয়াটা সনদের ক্ষেত্রে হতো। মতনে হতো না। মাওসুআতু আকওয়াল ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল : ৩৩০৬; মোটকথা আবু মা'শার মুহাদ্দিসদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি এবং ইবনে মাজাহর বর্ণনাকারী। আর তার বর্ণনাকে হাসান ধরা হয়ে থাকে।

[২১২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/১৪৪

[২১৩] মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক: ১৭১৫৬

না। তবে এক বর্ণনায় আছে, ইয়াজিদ এই ঘটনা শুনে আফসোস ও দুঃখপ্রকাশ করেছিল। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন, ইয়াজিদের কাছে যখন হাররার এই সংবাদ পৌঁছল তখন সে বলল, হায়রে আমার জাতি! এরপর হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রা. কে ডেকে বলল, মদিনাবাসীদের উপর যা হয়েছে সেটা আপনি জানেন। এখন বলুন তো তার ক্ষতিপূরণের পন্থা বা পদ্ধতি কী হতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন, খাদ্য এবং অর্থ সাহায্য। ইয়াজিদ সেমতে মদিনাবাসীদের জন্য খাবার পাঠানোর নির্দেশ দিলো এবং তাদের জন্য সম্পদের সাহায্য অব্যাহত রাখল।[২১৪]

---

[২১৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৬৫৫; এই বর্ণনাটা পুরাতন কোনো উৎসগ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাফেজ ইবনে কাসিরও সনদ বর্ণনা করেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, এটা মাদায়েনি থেকে বর্ণিত। তার বর্ণনা সহিহ্ হওয়ার কোনো প্রমাণ আমাদের সামনে নেই। তবে এর সনদ যদি আরো অনেক উঁচুও হয় তাহলে বুঝমান কেউ এটা মেনে নিতে পারে না যে, ইয়াজিদ এভাবেই দায়মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বেশির থেকে বেশি এটা বলা যায় যে, সে আঘাত করার পর যখমি স্থানে মলম লাগানোর কিছুটা চেষ্টা করেছে। আর যদি এই রেওয়ায়েত সহিহ্ হয় তাহলেও হাফেজ ইবনে হাজারের উপর কোনো দোষ আরোপ করা হবে না। বা প্রশ্ন তোলা যায় না। কারণ তিনি এটা বর্ণনা করেছেন শুধু ইয়াজিদকে কুফরির আখ্যা থেকে বাঁচানোর জন্য। আসলে এক বর্ণনায় হাররার ঘটনার কারণে অনেকে তাকে ঈমানহারা বলতো। সেই বর্ণনায় আছে, ইয়াজিদ যখন হাররায় বিজয়ের কথা শুনলো তখন খুশিতে এই পঙক্তি আবৃত্তি করছিল, হায়! বদরের শহিদরা যদি আমার বর্শার আঘাতে খাযরাজের আহাজারি দেখতো। আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩৩৩; এই পঙক্তিটা গাজওয়ায়ে উহুদে মুসলমানদের পিছু হটে যাওয়ার কারণে ইবনুয যাবআরি পড়েছিল। তারিখুত তাবারি : ২/৪৩৬; অবশ্য পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বালাযুরি এটাকে 'কালু' বলে সংশয়পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। এবং বলেছেন যে, এই পঙক্তিটাই ইয়াজিদ হাররার ঘটনায় পুনরাবৃত্তি করেছিল। যদি এই বর্ণনাকে বিশ্বাস করা হয় তাহলে ইয়াজিদের ঈমান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। কারণ এর দ্বারা বুঝা যায়, সে মদিনার আনসার সাহাবিদের শহিদ করার মাধ্যমে বদরে নিহত কুরাইশি কাফেরদের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। অথচ এটা খুবই খারাপ চিন্তা, যা রাফেজি-চিন্তার প্রতীক। জমহুর মুসলিম কখনোই ইয়াজিদকে কাফের আখ্যা দেয়নি। এজন্য হাফেজ ইবনে হাজার, যারা কাফের বলে তাদেরকে রদ করা জরুরি মনে করতেন। এমন সময় তিনি হাররার বিষয়ে মাদায়েনি থেকে এমন এক বর্ণনা পেয়ে গেলেন, যেটা এর বিপরীত। তাই তিনি তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ভালোভাবে গ্রহণ করে পেশ করেছেন। কারণ তার বিপরীত বর্ণনাও অনেক দুর্বল। সেই কারণে হাফেজ ইবনে কাসির রহ. ইয়াজিদ এবং হজরত যাহ্হাক রা.-এর কথাবার্তার রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, "এটা আসলে রাফেজিদের বানানো কথা, যেখানে তারা বলেছে যে, আহলে মদিনার পরাজয়ে ইয়াজিদ খুশি হয়েছিল। এবং সে সেই পঙক্তি পড়েছিল। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৬৫৫

অত্যাচার, কুফুর না মুনাফিকি?

একথা প্রমাণিত নয় যে, ইয়াজিদের মক্কা বা মদিনায় সৈন্যদের আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া এবং মুসলিম ইবনে উকবার আক্রমণ করা কোনো কুফুরি বা নিফাকের উপর ভিত্তি করে ছিল। এইসব করেছিল মূলত ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। আসলে তারা কোনোভাবেই নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবের সামান্য ক্ষুণ্নতা সহ্য করতে পারছিল না। আর তাদের বিরোধিতায় যারা ছিলেন, তারা নিঃসন্দেহে বড় সাহাবি ও তাবেয়ি। কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তারা ছিলেন বিদ্রোহী, যাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালানো শাসকরা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য বলে ভাবতো। সেজন্য তারা এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন, তাই করতো, তা যত বড় জুলুম ও অন্যায়ই হোক না কেন। এই হাররায় যা ঘটেছিল সেজন্য মুমিনদের ভেতরে আগুন জ্বলে উঠবে এবং ওদের বিরোধিতা করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে এই ঘটনার জন্য শাসককে কাফের, বদদীন বা মুনাফিক হিসেবে প্রমাণ করাটা ঠিক হবে না।

মোটকথা, উম্মতের আলেমগণ ইয়াজিদ ও তার গভর্নরদের কর্মপন্থা কখনোই সঠিক বা ভালো ভাবেননি। বরং তাদের প্রতি যথাসম্ভব ঘৃণা প্রদর্শন এবং মন্দতা বর্ণনা করেছেন। যারা ইয়াজিদের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে সম্মানের উপযুক্ত। কারণ, তারা অনেক উঁচু উদ্দেশ্য সামনে রেখে একটি শরয়ি ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে লড়াই করেছিলেন। এজন্য আলেমগণ তাদের জন্য শাহাদাত অর্জন এবং আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি ও সাওয়াবের আশা পোষণ করেন।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ.-এর পূর্বে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. একথা রদ করেছেন যে, ইয়াজিদ মদিনায় আনসারদের শাহাদাতে সেই পঙক্তি পড়েছিলেন। মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৫৪৯, ৫৫০

হাফেজ ইবনে হাজার এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইয়াজিদের ব্যাপারে সে পর্যন্তই বলেছেন যতটুকু সে করেছে। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি এই ধারণা করে যে, তারা ইয়াজিদের প্রশংসাকারী ছিলেন তাহলে সেটা মূর্খতা ছাড়া কিছুই না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং ইয়াজিদ

এইসব ঘটনা চলাকালে নবীজির সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ছিলেন হারামের চার দেয়ালে আবদ্ধ। তার বিশ্বাস ছিল কমপক্ষে এখানে তিনি নিরাপদে থাকতে পারবেন। মক্কায় টানা চার মাস হাজিদের আনাগোনা এবং পরবর্তীতে উমরাকারীদের ভিড় লেগেই থাকে। সেকারণে প্রশাসন অন্ততপক্ষে এখানে এসে আক্রমণ করে দুর্নাম কুড়াবে না। সেইজন্য তার উপাধি হয়ে গিয়েছিল 'আলআয়েয বিল্লাহ' অথবা আয়েযে বাইতুল্লাহ।[২১৫] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবিচল অবস্থান, যা হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও ছিল, এখনও সে অবস্থানেই অনড় ছিলেন। তিনি আসলে সমাজে পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা নয়; বরং শুরার ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে ছিলেন। যার নেতৃত্বে থাকবেন মুহাজির ও আনসার সাহাবিসহ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। যদিও অধিকাংশ সাহাবি এই অবস্থার কারণে অনুত্তম দিকটিই গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার ইলমের তীক্ষ্ণতা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণে কারণে রাজনীতিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দসই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। ঠিক এমনই অবস্থান ছিল হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর। ইয়াজিদ খেলাফতের মসনদে বসে যখন হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তার বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করার চেষ্টা করল তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. রাতারাতিই মদিনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসেন।[২১৬] ইয়াজিদ এই সংবাদ পেয়ে ওয়ালিদ ইবনে উতবাকে তার জন্য দায়ী করে বরখাস্ত করল। আর

---

[২১৫] তারিখে দিমাশক : ২৮/২০৪-২০৫ আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩০৪

[২১৬] তারিখে খলিফা : ২৩৩

সেখানে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করল আমর ইবনে সাঈদকে।[২১৭]

বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মক্কায় আসার পরেও বনু উমাইয়াদের দ্বারা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা ছিল। সেকারণেই হজরত হুসাইন রা. মক্কাকে রক্তপাত মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন এবং এখানে অবস্থান না করে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন। সেসময় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হলে কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু আমার কারণে মক্কার এই পবিত্র জমিন রক্তরঞ্জিত হবে এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।[২১৮]

সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও হজরত হুসাইন রা. ইরাকবাসীদের সহযোগিতার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা সফল হবে ভেবে কুফায় রওনা করেছিলেন এবং সেখানে ভিন্ন এক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। তবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মক্কাতেই রয়ে গেলেন। তার বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং মক্কার সম্মানে শাসকগোষ্ঠী কিছুদিন নীরব রইলো। কিন্তু তখন তার আশংকা হলো যে, এখন হয়তো তাকেও বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করবে। তবু তিনি হারামে অবস্থান করেই ভালো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সারাদিন কাবা শরিফের তাওয়াফ করতেন। নফল আদায় করতেন এবং অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদতেই কাটাতেন। তিনি কারো বিরোধিতা করতেন না।[২১৯]

আমর ইবনে সাঈদের মক্কায় সৈন্য নিয়োগ

ইয়াজিদ শুরু থেকেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে নিজের আয়ত্তে আনার চিন্তায় ছিল। তার মক্কায় পৌঁছার মাত্র একমাস পর ৬০ হিজরিতে হিজাজের নতুন গভর্নর আমর ইবনে সাঈদ মসজিদে নববির মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রথম খুতবায় হজরত যুবাইর রা. কে বেশ কঠোরতার সাথে বলল, তিনি (হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর) মক্কায় অবস্থান করছেন তাতে কী হয়েছে! আল্লাহর শপথ,

---

[২১৭] তারিখে খলিফা : ২৩৩

[২১৮] আখবারু মাক্কা লিলফাকিহি : ২/২৪২

[২১৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৪৩ তারিখে দিমাশক : ২৮/২০৭

আমরা সেখানে গিয়েই তার উপর হামলা করব। যদি তিনি কাবাঘরেও প্রবেশ করেন তাহলে আমরা সেখান থেকে পাশে নিয়ে যাবো। এতে যদি কারো নাক কাটা যায় যাবে।[২২০]

মদিনা বা মক্কায় যেসব সৈন্য ছিল তাদের পক্ষে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এমন সমাদৃত, সম্মানিত ও বিশাল ব্যক্তিত্বকে ধরাটা এতো সহজসাধ্য ছিল না। সেজন্য প্রয়োজন ছিল অনেক বড় কোনো সৈন্যদলের। তা ছাড়া তখন যেহেতু ইয়াজিদের ক্ষমতাই ছিল নড়বড়ে, তাই সে আর এদিকে হাত বাড়ায়নি। যদি দামেশকেও সৈন্যসংখ্যা অনেক দাঁড়াতো তবু সেই দল প্রেরণ করাটাও সম্ভব ছিল না। সেজন্যও প্রয়োজন ছিল অনেক কিছুর। কিন্তু ইয়াজিদ নিজ ক্ষমতা যখন কিছুটা গুছিয়ে উঠল; সেইসাথে সৈন্যও প্রস্তুত করল, তখন সে ধীরে ধীরে মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তুতিতেও কিছুদিন চলে গেলো। এরপর পবিত্র হারামের সম্মান এবং কোনো ব্যক্তির অবস্থান ও মর্যাদার কথা চিন্তা না করেই ইয়াজিদের আদেশমতো আমর ইবনে সাঈদ কাজ করল। এক হাজার সৈন্যের একটি জামাত মক্কায় প্রেরণ করল। তখন হজরত আবু শুরাইহ রা. আমর ইবনে সাঈদকে অনেক বারণ করলেন এবং বললেন, “হে আমির, যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে একটি হাদিস শোনাব, যা আমি নিজ কানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। নিজ চোখে তা দেখেছি এবং নিজের অন্তরে তা সংরক্ষণ করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “মক্কাকে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত বানিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ ও আখেরাতে যে বিশ্বাস রাখে, তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, এখানে রক্তপাত করবে এবং এমনকি এখানকার একটা গাছ পর্যন্ত উপড়ে ফেলবে।”

এই হাদিস শুনে আমর ইবনে সাঈদ অনেক কঠোরতার সাথে বলল, “আবু শুরাইহ, আমি তোমার থেকে অনেক ভালোই জানি যে, মক্কা কোনো গুনাহগার এবং পলাতক হত্যাকারী ও পলাতক অপরাধীকে বাঁচায় না।”[২২১] আমর ইবনে সাঈদ সৈন্য নিয়ে যখন মক্কায় পৌঁছল তখন

---

[২২০] তারিখে খলিফা : ২৩৩

[২২১] সহিহ বুখারি : ৪২৯৫ কিতাবুল মাগাজি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ডান হাত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ানের নেতৃত্বে সৈন্যদল প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জোরদারভাবে মোকাবেলা করল। সর্বশেষ আমর ইবনে সাঈদ পরাজিত হয়ে সৈন্যসহ ফিরে এলো।[২২২]

এই পরাজয়ের পরেই আমর ইবনে সাঈদের বিরোধী আমিররা ইয়াজিদকে বোঝালো যে, এই পরাজয়ের কারণ মূলত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আমর ইবনে সাঈদের দুর্বলতা ও তার গাফলতি। সেইজন্য ইয়াজিদ আমর ইবনে সাঈদকে পদচ্যুত করে হিজাজের আমির হিসেবে ওয়ালিদকে নিয়োগ করল।[২২৩]

হজরত ইবনে যুবাইর রা. এর প্রতি বিরূপ ধারণা

ঐতিহাসিকগণ শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মাঝে পার্থক্য ও যাচাই না করেই এমন কিছু মূর্খতাপূর্ণ ও ভুল বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে একজন ক্ষমতালিপ্সু, ফেতনাবাজ এবং অপরিণামদর্শী নেতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে; অথচ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে

---

[২২২] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৩-৩৪৭; এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাতে একথাও রয়েছে যে, আমর ইবনে সাঈদ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর ভাই আমর ইবনে যুবাইরকে সাথে নিয়ে এই আক্রমণটা করেছিল। কিন্তু আমর ইবনে যুবাইর পরাজিত হয়ে বন্দি হলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর তখন আমর ইবনে যুবাইরকে তাদের অধীনস্থ করে দেন, যাদের উপর সে আক্রমণ করেছিল। ফলে তারা প্রতিশোধ এমনভাবে নিলো যে, আমর ইবনে যুবাইর শেষপর্যন্ত আর বেঁচে থাকতে পারলো না। ওয়াকিদির এই বর্ণনা বিভিন্ন দিক থেকেই সাহাবিদের উপর অপবাদ আরোপে পরিপূর্ণ। তাই এটাকে আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি না। তবে হ্যাঁ, আমর ইবনে সাঈদের আক্রমণ ও পিছে হটে যাওয়ার কথা প্রসিদ্ধ আছে। তা ছাড়া এটাও মাথায় রাখা উচিত যে, ওয়াকিদি এই হামলার সময়কাল হিসেবে উল্লেখ করেছে ৬০ হিজরি। অথচ এটা অসম্ভব বিষয়। কারণ, ৬০ হিজরির রমজান মাসে আমর ইবনে সাঈদকে হেজাজের গভর্নর বানানো হয়েছিল এবং শাওয়াল মাসে হজের মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন আমর ইবনে সাঈদ নিজেও হজের জন্য মক্কায় এসেছিলেন। আর তখনো সে কোনো সৈন্য নিয়োগ দেয়নি। আল-মিহান : ১৪৯; তা ছাড়া ৬০ হিজরির শেষপর্যন্ত এমন হজের মৌসুমে আক্রমণ করাটা ছিল অনেক কঠিন ব্যাপার। যদি এমনই হতো তাহলে তখন মক্কায় অনেক রক্তপাত হতো এবং এর সংবাদ অনেক প্রসিদ্ধি পেতো। আবার অন্যান্য দিকে খেয়াল করলেও দেখা যায় যে, ওয়াকিদির বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ এই হামলাটা ৬১ হিজরিতে হয়েছিল এবং সেখানে পরাজয়ের কারণে আমর ইবনে সাঈদকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়েছিল।

[২২৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৪৭৭

যুবাইর রা. না ফেতনা সৃষ্টিকারী ছিলেন আর না ক্ষমতালোভী। তিনি ইয়াজিদের মৃত্যু পর্যন্ত খেলাফত অথবা শাসক হওয়ার দাবিও কখনো তোলেননি।[২২৪]

হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো তারও উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক সংশোধন। তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, আমার ইচ্ছা সংশোধন এবং সত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছুই নয়।"[২২৫]

তিনি কখনো না নিজেকে আমির বা খলিফা হিসেবে দাবি করতেন আর না কখনো নিজের খেলাফতের দিকে কাউকে দাওয়াত দিতেন। বরং তিনি সাধারণদের মাঝে এই চিন্তাটা ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন যে, উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্বের মেরুদণ্ড যেন শুরাভিত্তিক হয়। সেইসাথে শুরার নিয়ম ও শৃঙ্খলা যেন রাষ্ট্রের মানবতা, উদারতা ও সহনশীল ভূমিকায় থাকতে পারে।[২২৬]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর প্রতি ইয়াজিদের প্রলোভন

মক্কায় ব্যর্থ অভিযানের পর ইয়াজিদ নমনীয়তাকেই নিজের জন্য বেছে নিলো। সে নুমান ইবনে বাশির রা. এবং হাম্মাম ইবনে কাবিসা রা. কে মক্কায় পাঠাল, যেন তারা গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে এই প্রস্তাব দেয় যে, যদি আপনি ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করেন তাহলে আপনাকে পূর্ণ হিজাজের গভর্নর বানানো হবে এবং আপনি আপনার বংশের যাকে যেখানে ইচ্ছা গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করতে পারবেন। যদি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ক্ষমতালাভই হতো তাহলে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি যেহেতু একটি উসুল বা নিয়মের উপর ভিত্তি করে ইয়াজিদের বিপক্ষে ছিলেন সেজন্য তিনি এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।[২২৭]

---

[২২৪] তারিখে খলিফা : ২৫৭, ২৫৮

[২২৫] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩১৫

[২২৬] তারিখে খলিফা : ২৫২

[২২৭] তারিখে খলিফা : ২৫২

কেউ কেউ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রত্যাখ্যানকে অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কারণ এখানে মূল বিষয় হলো, ইয়াজিদের হাতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর বাইয়াত হওয়াটা তার ইজতিহাদ ও ফতোয়ার আলোকে ঘটেছিল। কারণ তিনি চাচ্ছিলেন যেন এই উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভের অধ্যায়টির অবসান ঘটে। তা ছাড়া কারবালা ছাড়াও কিছু ঘটনায় যদিও ইয়াজিদকেই দোষী করা যায় না; তবু খুব নরম শব্দে ব্যক্ত করলেও একথাই বলতে হবে যে, ইয়াজিদের ক্ষমতা ব্যর্থতা ও লজ্জাজনক ঘটনা তৈরি ছাড়া তেমন কিছুই দিতে পারেনি। অপরদিকে ইয়াজিদের পাপপ্রবণতা এবং অপকর্মের খবর সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষত হিজাজে সেসবের সংবাদ নিশ্চিতভাবেই আসছিল (মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ সেই কারণেই হয়েছিল)। সেজন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সবদিক বিবেচনা করে এবং নিজের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ফাসেকের ক্ষমতা মেনে নেওয়া সহ্য করতে পারেননি।[২২৮]

ইয়াজিদের শপথ

ইয়াজিদ যেকোনোভাবে হোক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তার অনুগত করতে চাইছিল। সেজন্যই মূলত গভর্নর বানাবার প্রলোভনটা দিয়েছিল; কিন্তু তিনি যখন প্রত্যাখ্যান করলেন তখন ইয়াজিদের মাথা খারাপ হয়ে গেলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভীষণ ক্ষেপে গেলো। সেজন্য ইয়াজিদ সিদ্ধান্ত নিলো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে অপমান ও অপদস্থ করবে। সেইসাথে এই শপথও করল যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তখনই তার আনুগত্য স্বীকার করবে যখন তাকে হাতকড়া ও শৃঙ্খল পরিয়ে আনা হবে।[২২৯] ইয়াজিদের পরামর্শকরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এমন অপমানজনক আচরণ করতে ইয়াজিদকে অবশ্য নিষেধ করল; এমনকি তার ছেলে মুয়াবিয়া পর্যন্ত নিষেধ করে বলল, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এমন অপমান

---

[২২৮] তারিখে খলিফা : ২৫২

[২২৯] তারিখে খলিফা : ২৫২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১২০৮৩

কখনোই সহ্য করবেন না। কিন্তু মুয়াবিয়া যখন দেখল এতেও কাজ হচ্ছে না তখন সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে ইয়াজিদকে বোঝালো। কিন্তু যেই কথা সেই কাজ। ইয়াজিদ তার সিদ্ধান্ত থেকে সামান্য সরে এলো না।[২৩০] ইয়াজিদ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে চিঠি লিখলো, "আমি আপনার কাছে রুপার জিঞ্জির, স্বর্ণের শৃঙ্খল এবং রুপার হাতকড়া পাঠাচ্ছি। আমি শপথ করেছি যে, আপনি এগুলো পরে আমার কাছে আসবেন।"[২৩১]

ইয়াজিদের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসআদা ফাজারি এবং ইবনে ইযাহ আশআরি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বন্দি করার জন্য মক্কায় রওনা হলো। ইয়াজিদ তাদেরকে একটি মস্তকাবরণযুক্ত ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ (বুরনুস) দিয়েছিল, যেন জিঞ্জির ও শৃঙ্খল পরানোর পর তাকে উপর দিয়ে এটা পরিয়ে দেওয়া হয়। এতে সেগুলো আর দেখা যাবে না এবং তিনি পর্দাবৃত হয়ে যাবেন।[২৩২]

যদিও ইয়াজিদের পক্ষ থেকে এটা বলা হয়েছিল যে, এই আদেশ শুধু খলিফার শপথের কারণে। কিন্তু একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে গ্রেফতার এবং অপমানিত করা। নয়তো ইয়াজিদের জন্য কসমের কাফফারা দিয়ে দেওয়াটা কঠিন কিছু ছিল না।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর সাথে ইয়াজিদের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করল। এবং ইবনে ইযাহ বলল, মজলুম খলিফা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা করায় আপনার যে ভূমিকা, তা কারো কাছে গোপন নয়। কিন্তু আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদের রাগ এই বিষয়ের উপর যে, আপনি নুমান ইবনে বাশিরের মাধ্যমে ইয়াজিদের পাঠানো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এজন্য আমিরুল মুমিনিন শপথ করেছেন আপনাকে সামান্য এবং গোপনীয়ভাবে এই জিনিসগুলো পরিয়ে

---

[২৩০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৪৩, ৪৪

[২৩১] তারিখে দিমাশক : ২৮/২০৯

[২৩২] আখবারু মাক্কা : ২/৩৩ ৭ তারিখুত তাবারি : ৫/৪৭৬; মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৩৭; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১

তার কাছে যেন উপস্থিত করা হয়।[২৩৩] কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সরাসরি অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি তার শপথ পূর্ণ হতে দিয়ো না।" এরপর তিনি এই পঙ্‌ক্তিগুলো পড়লেন, (অর্থ) আমি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। আমি বধির অর্থাৎ অন্যান্য কথাবার্তা বা সংলাপ শুনি না। আমি তাদের প্রতিবেশী, যারা বাঁশঝাড় ও মাসের দশ তারিখে কোয়ার ঘাটে আগমনকারী উট নিয়ে অগ্রগতির পথে পরস্পর মোকাবেলা করে। আমি কোনোদিনও অন্যায়ের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করি না। অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য আমি সংগ্রাম করে থাকি যতক্ষণ না ভক্ষণকারী বন্য পাথর নরম হয়ে যায়। অর্থাৎ অসম্ভব পরিণতি হয়।

এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, সম্মানের সাথে তরবারির আঘাতে কুপোকাত হওয়া অপমানের সাথে সামান্য আঘাত খাওয়া থেকে অনেক উত্তম।[২৩৪]

সবশেষে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করব না এবং তার আনুগত্যের জামাতে শামিল হবো না।"[২৩৫]

ইবনে যুবাইর রা. সমঝোতা করা থেকে কেন বিরত রইলেন?

এখানে প্রশ্ন হয় যে, হজরত হুসাইন রা. তো সর্বশেষ ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন তাহলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কেন সমঝোতা করতে চাইলেন না?

মূলত এর কারণ ছিল, হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তখন ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ ব্যতীত রাষ্ট্রের সংশোধনের কোনো পথ খোলা ছিল না। এ ছাড়াও ইয়াজিদের পক্ষ থেকে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর কোনো অসন্তোষও প্রকাশ পায়নি। এজন্য ইয়াজিদের পক্ষ থেকে তার প্রতি উত্তম আচরণের আশাও ছিল। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ

---

[২৩৩] আখবারু মাক্কা : ২/৩৩ ৭; আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩০৮

[২৩৪] আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২

[২৩৫] খলিফা ইবনে খাইয়াত : ২৫১; তারিখুত তাবারি : ৫/৪৭২

ইবনে যুবাইর রা. ইয়াজিদের রোষানলে পড়ে গিয়েছিলেন।[২৩৬] তা ছাড়া কারবালার ঘটনার সময়ও ইয়াজিদের পাপাচারের কথা তেমন প্রসিদ্ধ ছিল না; পরে হয়েছে এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তা নিশ্চিতভাবে জানতেন। আর যেহেতু তার মূলনীতি ছিল, কোনো ফাসেক শাসক হওয়ার উপযুক্ততা রাখে না; তাই তিনি ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ ও তার সাথে সমঝোতা থেকে দূরে সরে থাকছিলেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ওদের হাতে ধরা না দেওয়ার পর মক্কার অবস্থা একদম পালটে গেলো। তার চিন্তা ও মতাদর্শের উপর লোক আসতে থাকল দলে দলে। আশপাশে জমা হয়ে গেলো জীবনোৎসর্গকারী অনেক বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। ফলে স্থানীয় আমিরগণ বেশ ভয় পেয়ে গেলো।

মক্কায় যখন এই অবস্থা, ওদিকে মদিনাবাসীরা তখন সেখানকার গভর্নর উসমান ইবনে মুহাম্মদকে শহর থেকে বের করে দিয়ে শুরায়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। ফলে মক্কার সাথে দামেশকের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দল শক্ত শেকড় গেড়ে বসল।[২৩৭] সেইসাথে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা, মুসআব ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান এবং জুবায়ের ইবনে শিবাহ শুরার অবস্থা গুছিয়ে নিলেন।[২৩৮] এরপর হিজাজবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ইয়াজিদ যখন সৈন্য প্রেরণ করল তখন হাররার ঘটনাটা ঘটলো। ফলত জনসাধারণ প্রশাসনের উপর ভীষণভাবে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল।

মক্কায় শামের সৈন্যদের আক্রমণ

হাররার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তিনদিন পর মুসলিম ইবনে উকবা সৈন্যদল নিয়ে মক্কার দিকে মোড় নিলো। কিন্তু তখন সে ছিল ভীষণ অসুস্থ। পথে

---

[২৩৬] আখবারু মাক্কা : ২/৩৩৭

[২৩৭] তারিখে খলিফা : ২৫১; তারিখুত তাবারি : ৫/৪৯৪

[২৩৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৪৯

অসুস্থতার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পেলো এবং বাঁচার আশাও নিঃশেষ হয়ে এলো। এরপর অবশেষে সে ৭ মহররম আবওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে ইনতেকাল করল।[২৩৯] মৃত্যুর পূর্বে সে ইয়াজিদের পরামর্শ অনুযায়ী হুসাইন ইবনে নুমাইরকে সৈন্যদের আমির নিযুক্ত করল এবং খুব কঠোরভাবে বলে দিলো, "কুরাইশদের ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং তাদের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করবে।"[২৪০] এরপর তাকে এই নির্দেশ দিলো যে, "মক্কায় পৌঁছে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে নেবে। এরপর আক্রমণ করবে এবং ফিরে যাবে। আর সাবধান! কুরাইশদের কোনো পরামর্শে কান দেবে না।"[২৪১] আসলে তার ভয় ছিল যে, কুরাইশ নেতারা হয়তো বুঝিয়ে-শুনিয়ে যুদ্ধটা থামিয়ে দেবে। এজন্যই মূলত এই পরামর্শ। হুসাইন ইবনে নুমাইর ২৬ হিজরিতে শামের সৈন্যদের নিয়ে মক্কায় পৌঁছে গেলো। এদিকে মক্কাবাসীরা পূর্ব থেকেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। এরপর কিছু ব্যর্থ কথা চালাচালির পর ৬৪ হিজরি ১৩ সফর রবিবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।[২৪২]

ইবনে যুবাইর রহ.-এর মক্কায় আগমন এবং সম্মানিত মাতার সাথে সাক্ষাৎ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই মুনযির ইবনে যুবাইর রহ. ইরাকে ছিলেন। ইয়াজিদ তার থেকেও ফাসাদ সৃষ্টির আশংকা করছিল। সেই কারণে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে তাকে গ্রেফতার করার আদেশ পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তখন নানা কারণে ইয়াজিদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হজরত মুনযির ইবনে যুবাইর রহ. কে পালানোর সুযোগ করে দিলো। ফলে তিনি খুব সহজে নিজ ভাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছে গেলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার আগমনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর হজরত

---

[২৩৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৬৭; তারিখুত তাবারি : ৫/৪৯৬
[২৪০] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ১৩/৯২
[২৪১] তারিখে খলিফা : ২৫৫
[২৪২] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩৩৭

মুনযির ইবনে যুবাইর রহ. গেলেন তার সম্মানিত জননী হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে। তার সামনে অনেক দামি কিছু পোশাক পেশ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন। তখন হজরত মুনযির ইবনে যুবাইর রহ. কিছু সাধারণ পোশাক দিলে হজরত আসমা রা. সেগুলো সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "আমি এমনই কাপড় পরিধান করি।"[২৪৩]

হজরত মুনযির ইবনে যুবাইর রহ.-এর বীরত্ব ও শাহাদাত

মক্কা যখন অবরোধ করা হলো তখন হজরত মুনযির ইবনে যুবাইর রহ. হুসাইন ইবনে নুমাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি অনেক দানশীল ও ধনবান মানুষ ছিলেন। তার বদান্যতা ও উদারতার সীমা এই ছিল যে, দিনে শামের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতেন এবং রাতে তাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করতেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই ৪০ বছর বয়সি নাতি জাবালে আবু কুবাইস এবং কুয়াইকাআনের সমৃদ্ধি ও সফলতার জন্য শামের সৈন্যদের বিরুদ্ধে তরবারি চালাতে চালাতে এই পঙ্ক্তি আওড়াতেন, (অর্থ) আমার দীন ও বংশীয় আভিজাত্য ছাড়া কিছুই বাকি নেই এবং আছে সেই ধারালো তলোয়ার, যা দ্বারা আমার ডান হাত পরিতৃপ্ত হয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মসজিদে হারাম থেকে চোখ উঠিয়ে যখন দেখলেন মুনযির চিতাবাঘের মতো লড়াই করছেন তখন তিনি অনিচ্ছাতেই বলে উঠলেন, "এ তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের দীন ও বংশীয় আভিজাত্য টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছে।" একদিন এক শামি সৈন্য মুনযির রহ. কে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করল। তখন তারা উভয়ে খচ্চরের উপর আরোহণ করে তলোয়ার দিয়ে একে অন্যের উপর আঘাত করছিল। একপর্যায়ে তলোয়ার উভয়ের শরীরই ছিন্নভিন্ন করে দিলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এতে খুব দুঃখ পেলেন; কিন্তু অন্তরকে দমিয়ে শুধু এতটুকু বললেন, "আবু উসমানও সফল হয়ে গেলো।"

---

[২৪৩] তারিখে দিমাশক : ৬০/২৯০

হজরত মুনযিরের মৃত্যুশোকে মক্কার এক নারী এই কবিতা আবৃত্তি করল, (অর্থ) আবু বকরকে তার সম্পর্কে বলে দাও, যিনি নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন এবং মুনযিরকেও, যিনি বন্যবাঘের মতো শত্রুর উপর হামলা করেছেন। তোমাদের উপর আমার মা কুরবান হোক, যিনি তোমাদের মতো সন্তান জন্ম দিতে পারেননি। তোমরা আমাকে অপমানিত হতে দাওনি।[২৪৪]

হুসাইন ইবনে নুমাইরের কঠোর অবরোধ

হুসাইন ইবনে নুমাইর ধীরে ধীরে অবরোধ সংকুচিত করে আনলো। যখন রবিউল আউল মাসের চাঁদ দেখা দিলো তখন সে মসজিদে হারামের নিকটবর্তী আবু কুবাইস এবং কুয়াইকাআন পর্বতে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এলো। ৩ রবিউল আওয়ালে এখান থেকে সে ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল,[২৪৫] যা এতই তীব্রতর ছিল যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং তার সাথিগণ তাওয়াফের জন্য কাবার কাছেধারেও ঘেঁষতে পারছিলেন না।[২৪৬]

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. এবং মুসআব ইবনে আবদুর রহমান রহ.-এর শাহাদাত

এসময়ে হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা, যিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ডান হাত ছিলেন, পাথরের আঘাতে শহিদ হয়ে যান।[২৪৭]

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হজরত মুসআব ইবনে আবদুর রহমান, যিনি বোধ-বুদ্ধিতে অনেক পরিপক্ব

---

[২৪৪] তারিখে দিমাশক : ৬০/২৯০

ফায়েদা : মুনযির ইবনে যুবাইর রহ.-এর কন্যা ফাতেমা বিনতে মুনযির প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসা ছিলেন। হাদিসের কিতাবে বিশেষভাবে তার বর্ণনাকৃত হাদিস রয়েছে, যার অধিকাংশই তিনি তার দাদি হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু বুখারিতেই তার বর্ণনাকৃত হাদিসের সংখ্যা দশটি।

[২৪৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৬৩৪

[২৪৬] আল-মিহান : ২০৩

[২৪৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৬৭

হওয়ার কারণে কাজিও হয়েছিলেন, একটি তিরের আঘাতে ঘায়েল হয়ে যান এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।[২৪৮]

এসময় খারেজিদেরও কিছু দল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল; কিন্তু তখন হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার অবস্থান স্পষ্ট করার কারণে তার এবং খারেজিদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কারণ খারেজিরা হজরত উসমান রা. কে দোষারোপ করতো; কিন্তু অপরদিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। খারেজিরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই অবস্থানের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. স্পষ্ট বলে দিলেন, তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো।

সর্বশেষ খারেজিদের সরদার নাফে' ইবনে আযরাক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলো। কিছু লোক এখানটায় এসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে অনভিজ্ঞ ভাবতে শুরু করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এটাই হতো যে, তিনি খারেজিদের সামনে নিজের অবস্থানের কথা যদি স্পষ্টভাবে বর্ণনা না করতেন এবং তাদেরকে বলে বুঝিয়ে সাথে রাখতেন; কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. আকিদাগত মাসআলাগুলোয় স্পষ্ট বিধান প্রয়োগের প্রবক্তা ছিলেন। সুতরাং এতে যদি কেউ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সঙ্গ ছেড়ে যায় তাহলে তিনি তার কোনো পরোয়া করতেন না।[২৪৯]

কাবা শরীফে আগুন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মসজিদে হারামের প্রাঙ্গণে বেশ বড় একটি তাঁবু খাঁটিয়ে রেখেছিলেন, যেখানে মক্কার নারীরা আহত মুজাহিদদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। একদিন হুসাইন ইবনে নুমাইর পাহাড়ের চূড়া থেকে এই তাঁবু দেখে বলল, "এখান থেকে রোজ রোজ বাঘ বের হয়ে আমাদের উপর

---

[২৪৮] আততারিখুল কাবির লিইবনে আবি খাইসামা : ২/৬২; আল-মিহান : ২০৩ আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩৫০

[২৪৯] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩১৭

আক্রমণ করে, যেন এটা তাদের বেলাভূমি। কেউ আছে, যে এই তাঁবু ধ্বংস করে দিতে পারবে!" তখন এক শামি সৈন্য বলল, "এই কাজটা আমিই করে দেখাবো।"

এরপর সেদিন রাতেই সে বর্শার মাথায় আগুন স্থাপন করে ঘোড়া নিয়ে তাঁবুর যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব গেলো। তারপর সেখান থেকে তাঁবুর দিকে বর্শা নিক্ষেপ করল। মুহূর্তেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তখন বাতাসের তীব্রতার কারণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কাবাঘরে গিয়ে পৌঁছল। কাবার ভবন (যা ঐসময় ২৭ ফুট উঁচু ছিল) ক্রমাগত পাথরের আঘাতে পূর্বেই কিছুটা ধসে গিয়েছিল। এখন আগুন ধরায় প্রথমে কাবার গিলাফের পর ছাদের কাঠ পুরে যায়।[২৫০]

কাবাঘরের এই অবস্থা হওয়ার পর উভয় দলের ভেতরেই অনুশোচনার জন্ম হলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এক কোনায় গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তিনি তখন বলছিলেন, "হে আল্লাহ, হে আমার প্রভু, আমি তো জানতাম না যে, এমন ঘটনা ঘটবে।"

অপর দিকে শামের সৈন্যদের থেকেও একজন পেরেশান হয়ে যমযম কূপের কাছে এসে চিৎকার করে বলল, "সেই সত্তার শপথ, যার হাতে

---

[২৫০] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ১৩/৯২

সনদ : আলি ইবনুল মুবারক, যায়েদ ইবনুল মুবারক, আবদুল মালিক ইবনে আবদুর রহমান আযযিমারি, কাসেম ইবনে মিআন, হিশাম ইবনে উরওয়া, উরওয়া ইবনুয যুবাইর।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা

১. আলি ইবনুল মুবারক (আবুল হাসান আসসানআনি মৃত্যু : ২৮১ হিজরি) একজন সিকাহ রাবি-(ইরশাদুল কাসি ওয়াদদানি ইলা তারাজিমিশ শুয়ুখিত তাবারানি : ১/৪৪১;

২. যায়েদ ইবনে মুবারক (মৃ.২১১ হিজরি) একজন সিকাহ রাবি-(আসসিকাত লিইবনে হিব্বান : ৮/২৫১) ইমাম আবু দাউদ এবং নাসায়ি রহ. বলেছেন, আলি ইবনুল মুবারক একজন সিকাহ রাবি- (তাহযিবুত তাহযিব : ৩/৪২৫

৩. আবদুল মালিক ইবনে আবদুর রহমান আযযিমারি (মৃত্যু : ১৯১ হিজরি) একজন সিকাহ রাবি- (তাহযিবুত তাহযিব : ৬/৪০১)

৪. কাসেম ইবনে মিআন : সিকাতুন ওয়া হুজ্জাতুন (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৮/১৯০) আর ইশাম ইবনে উরওয়া এবং উরওয়া ইবনুয যুবাইরকে আলাদা করে সিকাহ হিসেবে প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং এটা খলিফা ইবনে খাইয়াত বিশুদ্ধ সনদে ইবনে জুরাইজ থেকেও তার ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন (২৫২); আল-মিহান লিআবিল আরব : ২০৩, ২০৪

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, উভয় দলই ধ্বংস হয়ে গেছে।"[২৫১]

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার মৃত্যু

এই সময় ৬৪ হিজরির ১৪ রবিউল আউয়াল ৩৮ বছর বয়সে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ৩ বছর ৭ মাস ২২ দিন হুকুমত পরিচালনা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নিলো। তখন সে হাওয়ারিনে অবস্থান করছিল। আর জানাজার নামাজ পড়ায় তার ছেলে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ।[২৫২]

---

[২৫১] তারিখে খলিফা : ২৫৫

[২৫২] তারিখে খলিফা : ২৫৫

ইয়াজিদের সময়কাল ও তার সারকথা

ইয়াজিদের রাজত্বের প্রথমদিন থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল, সেসবের বিস্তারিত বিবরণ পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচিত হয়েছে। তবে তার সারাংশ হলো এই :

১. হজরত মুয়াবিয়া রা. উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক সামনে রেখে নেক নিয়তে ইয়াজিদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

২. ইয়াজিদ খলিফা হওয়া পর্যন্ত তার থেকে আপত্তিকর কিছু প্রকাশ পায়নি, যা পরে প্রকাশ হয়েছিল। মুফতি তাকি উসমানি লিখেছেন, "নিঃসন্দেহে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইয়াজিদের পাপাচার প্রকাশ পাওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই।"[২৫৩] সেই কারণেই ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত করা ও শাসক বানানো বৈধতার সীমারেখার ভেতরেই ছিল। যদিও উম্মতের মাঝে তখন তার চেয়েও অনেক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল। মুফতি তাকি উসমানি লিখেছেন, ইয়াজিদকে তো খেলাফতের উপযুক্ত মনে করা যায়; কিন্তু তখন উম্মতের মাঝে এমন লোকদের কমতি ছিল না, যারা দীনদারি, তাকওয়া-পরহেজগারি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় ইয়াজিদের চেয়ে অনেক উচ্চ অবস্থানে ছিলেন।[২৫৪]

৩. ইয়াজিদের ক্ষমতায় বসার পর হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শরিয়তের সংরক্ষণ এবং ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি। সেইসাথে ইয়াজিদের ক্ষমতা যেন প্রতিষ্ঠিত না হয় সেজন্য তারা আমৃত্যু চেষ্টা

---

[২৫৩] হজরত মুয়াবিয়া আওয়ার তারিখি হাকায়েক : ১১ ৫

[২৫৪] হজরত মুয়াবিয়া আওয়ার তারিখি হাকায়েক : ১১ ৫

চালিয়ে গেছেন। আর অন্যান্য সাহাবি শরিয়তের অপরাপর দলিলের উপর ভিত্তি করে ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করে নেন। যদিও বাস্তব-অর্থে শামের অধিবাসী ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না।

৪. হজরত মুয়াবিয়া এবং ইয়াজিদের সময়কালেও হজরত হুসাইন এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর এই মতাদর্শ ছিল যে, পৈত্রিক ক্ষমতা ইসলামি শুরাভিত্তিক শাসনের পরিপন্থি। এজন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা এখন সংশোধন-যোগ্য এবং হজরত আবু বকর রা. ও হজরত উমর রা. এর খেলাফতের আদলে গড়ে তোলা অপরিহার্য। এটা তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ইজতিহাদ এবং ফতোয়া ছিল।

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছেও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সেটাই ছিল, যা হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছিল। কিন্তু তাদের সংশোধনের চেয়ে বেশি দৃষ্টি ছিল বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের প্রতি। সেজন্য তখনকার হুকুমত এবং শাসনব্যবস্থা যেহেতু বৈধতার সীমারেখাতেই ছিল; তাই তারা সেটা গ্রহণ করাকেই কল্যাণকর মনে করেছেন।

৬. ইয়াজিদের পাপাচারের প্রসিদ্ধি তার খলিফা হওয়ার পর হয়েছিল। হজরত রশিদ আহমাদ গঙ্গুহি রহ. বলেছেন, “হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে যখন খলিফা মনোনীত করেছিলেন তখন সে ভালো অবস্থায় ছিল।” এরপর এখানেই তিনি লিখেছেন, “ইয়াজিদ প্রথমে ভালোই ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে যখন ক্ষমতা পেয়েছে খারাপ হয়ে গেছে।”[২৫৫]

৭. মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে যারা ইয়াজিদের পাপাচারের বিষয়টা নিশ্চিতভাবে জানতো, তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের ফিকহি মাসআলা অনুযায়ী ফাসেকের শাসন মেনে নেওয়া ছিল অবৈধ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ওয়াজিব। তাদের সামনে নবীজির সেইসব হাদিস ছিল, যেগুলোতে অন্যায়কে হাতের শক্তি দ্বারা প্রতিহত করার আদেশ ছিল। এইসব মনীষী

[২৫৫] তালিফাতে রশিদিয়্যাহ : ২৪২

আসলে মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কোনো অধিকার কারো নেই।

৮. অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ি ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন সেসব হাদিসের ভিত্তিতে, যাতে নবীজি খলিফার বাইয়াত ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন; সে জালেম হোক বা ফাসেক। অবশ্য কতক এমনও ছিলেন, যাদের কাছে ইয়াজিদের পাপাচার প্রমাণিত ছিল না। যেমন: মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রহ.।

৯. ইয়াজিদের ব্যাপারে কুফুরি ও ব্যভিচারের অপবাদ কিছু দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে এসেছে। সেগুলো আসলে সঠিক নয়। তবে ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে সকল আলেমই একমত পোষণ করেছেন এবং সেকারণেই মদিনার প্রবীণ সাহাবিগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কারণ তারা এসবের পূর্ণ ও পাকা প্রমাণ না নিয়ে নিছক ধারণার বশবর্তী হয়ে মাঠে নামেননি। তা ছাড়া ইয়াজিদের জুলুমটাই ছিল একধরনের ফিসক।

১০. ইয়াজিদ ক্ষমতাশালী হওয়ার পর কিছু অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার ফলে অনেক গভর্নর, রাজনীতিক এবং সাধারণ জনগণের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এসবের সাথে হজরত মুয়াবিয়ার কোনো যোগসূত্র ছিল না। কারণ তিনি তো গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন না। এইসবই হয়েছিল তার ইনতেকালের পর।

ইয়াজিদের অদূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক কিছু বড় ভুল

১. ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রা. ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তার বাইয়াতগ্রহণে বাধ্য করছিল। অথচ উচিত এটাই ছিল যে, ইয়াজিদ সম্মানের সাথে তাদেরকে তাদের ফতোয়া ও মতাদর্শের উপর ছেড়ে দিতো। এব্যাপারে মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি রহ. লিখেছেন, "ইয়াজিদের বাইয়াত প্রত্যাখ্যানের ফলে হজরত হুসাইন রা. এর নিশ্চিত জানা ছিল যে, তাকে হত্যা করা হবে। সন্দিহান ছিলেন এমন নয়; বরং নিশ্চিত ছিলেন। অথচ খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও খলিফার হাতে সকলের বাইয়াত হওয়া ফরজ

কিছু নয়। তবে বিদ্রোহ না করা ছিল ফরজ।[২৫৬] কিন্তু ইয়াজিদ তাদেরকে বাধ্য করছিল। সেজন্যই তারা মদিনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং পরবর্তীতে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

২. ইয়াজিদ হজরত নুমান ইবনে বাশিরের মতো একজন দূরদর্শী এবং অভিজ্ঞ ও সচেতন গভর্নরের জায়গায় বসালো উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, আমর ইবনে সাঈদ, মুসলিম ইবনে উকবার মতো কঠোর, অদূরদর্শী ও অসচেতন লোকদেরকে; এবং তাদের হাতেই ছেড়ে দিলো যাবতীয় দায়িত্ব। ফলে কারবালা, হাররা ও মক্কায় রীতিমতো নৃশংস হত্যা ও লুটপাটের উৎসব হয়েছিল।

৩. এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটানোর পরেও ইয়াজিদ তাদেরকে সামান্য নিন্দা ও ভর্ৎসনা ছাড়া কিছুই করল না। ইয়াজিদের এসব কর্মপন্থার কারণেই মুফতি তাকি উসমানি লিখেছেন, "ইয়াজিদের এসব ভুল ও অপরাধ অমার্জনীয়। কারণ সে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটানোর পরেও উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে কোনো শাস্তি দেয়নি।"[২৫৭] তার এসব কাজের কারণে শাসক ও শাসনব্যবস্থা উভয়েরই বদনাম হলো এবং সর্বদিকে বিদ্রোহ ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়ল।

ইয়াজিদের ব্যাপারে উম্মাহর আলেমদের মন্তব্য

অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ইয়াজিদের প্রতি আমাদের পূর্বসূরিগণ বরাবরই বিরাগভাজন ছিলেন। তারই সামান্য চিত্র এই যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রহ.-এর প্রসিদ্ধ ও উঁচুমাপের শাগরেদ ইমাম মুহান্না ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ইয়াজিদের নেতৃত্বের ব্যাপারে বলেছেন, "আমি একবার ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রহ.-কে ইয়াজিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন, সে-ই একমাত্র এমন ছিল, যে মদিনায় সবকিছু করেছে।

আমি তখন বললাম, আচ্ছা, সে কী কী করেছে?

---

[২৫৬] আহসানুল ফাতাওয়া : ৬/২১৮; শরহে মুসলিম লিননববী : ১২/৭৮

[২৫৭] হজরত মুয়াবিয়া আওয়ার তারিখি হাকায়েক : ১১৫

তখন তিনি বললেন, মদিনায় নবীজির সাহাবিদের হত্যা করেছে এবং আরো অনেক কিছু করেছে।

আচ্ছা! আর কী কী করেছে?

মদিনাতে লুটপাট করেছে।

তার থেকে কি হাদিস বর্ণনা করা সঠিক হবে?

তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করো না এবং কারো জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তার থেকে হাদিস বর্ণনা করবে ও লিখবে।

আচ্ছা! যারা মদিনায় সবধরনের কাজ করেছে, তারা কারা ছিল?

শামের অধিবাসী।

মিসরিরাও কি ছিল তাদের সাথে?

না। কারণ তারা তো হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারটা নিয়ে মশগুল ছিল।"[২৫৮]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, "ইয়াজিদ কিছু কাজ খুব খারাপ করেছে। সেগুলোর মধ্যে হাররার ঘটনাও একটি।"[২৫৯] ইমাম ইবনে তাইমিয়া একথাও লিখেছেন যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রহ.-এর পুত্র বলেছেন, কেউ কেউ বলে যে, আমরা ইয়াজিদের সাথে মহব্বতপূর্ণ সম্পর্ক রাখি; অথচ ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল নিজে বলেছেন, যার ভেতরে সামান্য কল্যাণ আছে, সে ইয়াজিদকে মহব্বত করতে পারে না।[২৬০]

হাফেজ জাহাবি রহ. লিখেছেন, ইয়াজিদ সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আমরা না ভালোমন্দ কিছু বলতে পারি আর না তার সাথে মহব্বত রাখতে পারি।"[২৬১]

---

[২৫৮] আসসুননাহ লিআবিবাকর ইবনে খাল্লাল : ৮৪৫

[২৫৯] রাঅসুল হুসাইন লি ইবনে তাইমিয়া : ২০৫

[২৬০] আলমাসাইলু ওয়াল আজরিবাহ : ৮০

[২৬১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৫; হাফেজ জাহাবি রহ.-এর এই কথা থেকে তাই বলে এই অর্থ বোঝা যায় না যে, প্রয়োজনে ইয়াজিদের সমালোচনা করা যাবে না এবং তার থেকে যেসব মন্দতা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা যাবে না। এই কথার সামান্য কিছু পরেই হাফেজ

প্রসিদ্ধ শাফেয়ি আলেম শায়েখ ইবনুল হারাদ (আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন) বলেন, "আমরা হজরত মুয়াবিয়ার জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দোয়া করি এবং ইয়াজিদের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ আল্লাহর কাছে সঁপে দিই।"[২৬২]

ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য

ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্যের ধারা অব্যাহতভাবে চলে আসছে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন আলেমের মন্তব্য উল্লেখ করা হলো :

১. হজরত আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামি রহ. ইয়াজিদকে "ফাসেক, নেশাখোর, অকল্যাণকামী ও জালেম" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৬৩]
২. আল্লামা ইবনে আবিদীন শামি রহ. ইয়াজিদকে প্রকাশ্য অপরাধী এবং ফাসেকদের মাঝে গণ্য করেছেন।[২৬৪]
৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. লিখেছেন, ইয়াজিদ নিঃসন্দেহে ফাসেক ছিল।[২৬৫]

জাহাবি ইয়াজিদের ব্যাপারে নিজেই একথা লিখেছেন যে, ইয়াজিদ ছিল নাসেবি, কঠোর, রূঢ় ও অভদ্র। ছিল নেশামত্ত এবং অন্যায় কাজে অভ্যস্ত। তার হুকুমত হজরত হুসাইন রা.-এর শাহাদাতের পর থেকে শুরু হয়ে হাররায় মর্মন্তুদ ঘটনায় গিয়ে থেমেছে। এজন্য লোকজন তাকে ঘৃণা করতো। ফলে তার বয়সের বরকত হারিয়ে গেলো।

[২৬২] ইজতিমাউল জুয়ুশ আল ইসলামিয়্যা লিইবনে কাইয়্যিম : ২২

[২৬৩] আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা : ২/৬৩২

[২৬৪] রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার : ৩/১৪৬; কিতাবুত তালাক। বাবুর রাজআহ।

[২৬৫] আল উরফুশ শাযি : বাবু মাজাআ ফি হুরমাতি মাক্কা : ২/২১৩; মাওলানা শাব্বির মুহাম্মদ আলাবি মাওলানা কাসেম নানুতবি রহ.-এর একটি দুলর্ভ কিতাব 'শাহাদাতে হুসাইন ওয়া কিরদারে ইয়াজিদ'-এর শুরুতে 'তামহিদ ফি-বায়ানি ফিসকি ইয়াজিদ' শিরোনামে এক মুকাদ্দামায় এবং মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ আলাবি তার অদ্বিতীয় তাসনিফ 'মাকামে হুসাইন ও ইয়াজিদ' এই কিতাবে মহান আলেমগণ এবং দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের উক্তি পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি, শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি, শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি, সাইয়েদ আহমাদ শহিদ, মাওলানা আবদুল হাই লাখনবি ফিরিঙ্গিমহল্লি, মাওলানা কাসেম নানুতবি, মাওলনা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহি, মাওলানা আবদুল হক হক্কানি, মাওলানা খলিল আহমাদ সাহরানপুরি, মুফতি আযীযুর রহমান উসমানি, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি, মাওলানা আবদুশ শাকুর লখনবি, মাওলনা ইদরিস কান্ধলবি, কাজি মুহাম্মদ সুলাইমান মানসুরপুরি, শাহ আতাউল্লাহ বুখারি, মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরি, মুফতি

৪. মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এক জিজ্ঞাসার জবাবে লেখেন, ইয়াজিদ ফাসেক ছিল এবং ফাসেকের শাসন একটি বিতর্কিত বিষয়।[২৬৬]

৫. সাইয়েদ ইউসুফ বানুরি রহ. লেখেন, ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।[২৬৭]

৬. শাইখুল হাদিস মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহ. ইয়াজিদের নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয়পূর্ণ নই। কারণ ইয়াজিদের ফিসকের মৌলিক কারণ হিসেবে তার সময়কালের এই তিনটি ঘটনাই যথেষ্ট।" এরপর তিনি কারবালার ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের শাস্তি না দেওয়া এবং হাররায় সাহাবি ও তাবেয়িদের হত্যা অতঃপর মক্কায় ইয়াজিদের সৈন্য প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া প্রচলিত যেই ধারণাটা আছে, ইয়াজিদের ব্যাপারে সব অপবাদই ছড়িয়েছে শিয়াসম্প্রদায়-তারও খুব শক্ত ও গবেষণাধর্মী উত্তর দিয়েছেন। তিনি লেখেন, ইয়াজিদের ব্যাপারে অপবাদ ও দুর্নাম রটানোর সম্পর্ক শিয়াদের সাথে যতটুকু জড়িত সেক্ষেত্রে কথা হলো, শিয়াদের অপবাদের হাত থেকে তো তিন খলিফা, হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে হজরত আয়েশা এবং হজরত হাফসা—কেউ বাদ পড়েননি। সুতরাং তারা যখন এইসব মহান মনীষীর বিরুদ্ধে এমন কথা বলতে পেরেছে, তাহলে ইয়াজিদ কোনছাড়! তা সত্ত্বেও আমরা যদি একথা মেনেও নিই যে, ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যা বর্ণনা আছে, সব শিয়াদের বানানো। তবু কারবালা, হাররা এবং মক্কায় আক্রমণের ব্যাপারটার সমাধান কী হবে? এগুলো মুতাওয়াতিরভাবে আমাদের পর্যন্ত এসেছে এবং এর সবক'টির সাথেই ইয়াজিদ ওতপ্রোতভাবে

শফি, কারি মুহাম্মদ তাইয়্যিব, শাইখুল হাদিস যাকারিয়া, মাওলানা আবদুল হক, মাওলানা আবদুশ শাকুর তিরমিজি এবং মুফতি জামিল আহমাদ থানবিসহ অনেকেই শামিল রয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য শাহাদাতে হুসাইন ও কিরদারে ইয়াজিদ : ৫-১৫; মাকামে হুসাইন ও ইয়াজিদ : ৯৮-১১০; সারকথা হলো, তাদের সকলের মতেই ইয়াজিদ নিঃসন্দেহে পাপাচারী এবং জালিম ছিল।

[২৬৬] ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৪/৪৬৫

[২৬৭] মাআরিফুস সুনান: ৬/৭

জড়িত। এতটুকুই কি তার জুলুম ও ফিসক প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়! তা ছাড়া আমাদের সালাফগণ সাহাবিদের যেমন সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে সর্বদা সজাগ থেকেছেন তেমনই যারা ইয়াজিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাদের পথও রুদ্ধ করতে চেয়েছেন।"[২৬৮]

---

[২৬৮] মাহেনামাহ সফদার: ১৫, ১৬ সংখ্যা: ৫৮ ডিসেম্বর ২০১৫

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো, অনেক আলেমের মতে ইয়াজিদের ঈমান নিয়ে সংশয় আছে। আল্লামা তাফতাযানি রহ. বলেন, "আমাদের কথা তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে নয়; বরং তার ঈমান নিয়ে।" (আকায়েদে নাসাফি : ৩৭৫) আল্লামা মুহাম্মদ আলুসি রহ. লেখেন, "আমরা যদি মেনে নিই যে, এই খবিস মুসলিম ছিল তাহলে সে তো মুসলমান বটে; কিন্তু এমন মুসলমান যে এতোসব কবিরা গুনাহ অর্জন করেছে, যা বর্ণনা করে শেষ করার মতো নয়"। (রুহুল মাআনি : ১৩/২২৯) এমনইভাবে প্রথম সারির কয়েকজন ফকিহ এবং মুহাদ্দিসও ইয়াজিদের উপর লানত করাকে জায়েজ মনে করতেন। যেমন আল্লামা ইবনে জাওযি রহ. একথার প্রবক্তা ছিলেন। তার কিতাবের আলোচনা থেকে লানত প্রদানের প্রবক্তাদের দলিলগুলোও সামনে এসেযায়। তবে অধিকাংশ আলেমের মাযহাব সতর্কতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেন মূর্খ মানুষেরা ইয়াজিদকে লানতের মাধ্যমে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর উপর লানতের রাস্তা না খুলে যায়। এজন্যই ইয়াজিদের ব্যাপারে কুফুর ও নেফাক এবং লা'নতকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে না কারো কোনো সন্দেহ আছে আর না কেউ তা বাতিল বলে গণ্য করেছেন। ইয়াজিদের উপর লানত না করা প্রসঙ্গে হজরত আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন: ইয়াজিদ এবং তার মতো শাসকদেরকে সর্বোচ্চ ফাসেক বলা যায়। মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৫৬৭ সুতরাং ইবনে তাইমিয়ার একথা থেকে বুঝা যায় যে, যেসকল আলেম ইয়াজিদের উপর লানত করাকে নিষেধ করেছেন তারাও ইয়াজিদের ফিসককে মেনে নিয়েছেন।

মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ

ইয়াজিদের নওজোয়ান ছেলে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ চরিত্র, নেতৃত্ব, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা; মোটকথা সবদিক থেকেই ছিল ক্ষমতা পাওয়ার উপযুক্ত। বলা হয়, তখন বনু উমাইয়ার কোনো ব্যক্তি সম্ভ্রান্ততা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সমতুল্য ছিল না।[২৬৯] ইয়াজিদ পরবর্তী খলিফা হিসেবে তাকেই দায়িত্ব দিয়েছিল।[২৭০] তার জন্ম হয়েছিল ৪৩ হিজরিতে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা, ঘন ও ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল, ডাগর চোখ, বড় মাথা, সুন্দর চেহারা, ঘন দাড়ি ও সুগঠিত দেহের অধিকারী। তিনি আসলে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তাই খেলাফত পরিচালনা সত্ত্বেও একবারের জন্যও তিনি রাজপ্রাসাদের বাইরে যাননি। বাস্তবিকপক্ষে ক্ষমতা গ্রহণের কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। এজন্য পূর্বে যারা যে দায়িত্বে ছিলেন, তাদেরকে সেখানেই বহাল রাখলেন। এক বর্ণনামতে তিনি ৪০ দিন এবং অন্য বর্ণনামতে ৪৫ দিন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।[২৭১] কিন্তু এই অল্পসময়ের সৌন্দর্যের দিক হলো,

---

[২৬৯] তারিখে দিমাশক : ২৭/২৮৯

[২৭০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৩৮ তারিখে খলিফা লিইবনে খাইয়াত: ২৫৫ তারিখে দিমাশক : ২৭/২৫৯

[২৭১] তারিখে খলিফা : ২৫৫

বনু উমাইয়ার ইতিহাসকি আব্বাসি যুগে ঘোর বিরোধিতার শিকার হয়েছিল?

মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের জীবনে পড়ে দুইটি বিষয় সামনে আসে। এক, বনু উমাইয়াদের মধ্যে ভালো, নেককার, পরহেযগার এবং বুজুর্গ মানুষও ছিলেন। তাই সকল উমাইয়া খলিফাকে একযোগে মন্দ বলে দেওয়াটা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। দুই, পূর্বের ঐতিহাসিকগণ বনু উমাইয়ার ব্যাপারে ততটুকুই বলেছেন যতটুকুর সত্যতা ছিল। এই ধারণাটা মূলত কঠোরতার উপরে দাঁড়িয়ে আছে যে, বনু উমাইয়ার সকল ইতিহাস আব্বাসি যুগে অনারবের দরবারি ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছা করে সেগুলো বর্ণনা করেছে। যদি এমনই হতো তাহলে তারা কেন মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদকে খারাপ হিসেবে উপস্থাপন করল না? হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজকে কেনো ভালো হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল? বনু উমাইয়ার প্রত্যেকটা স্তরকে আলাদা আলাদা করে কেনো বর্ণনা করেছেন? আবদুল মালেক এবং তার

রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনি খোলাফায়ে রাশেদিনের আদলে গড়ে তোলার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন এবং রাজনৈতিক অস্থির অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা হলো ক্ষমতাসীন হওয়ার বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে মুসলমানদের সন্তুষ্টি এবং শুরার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যেমনটা ভেবেছিলেন হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.।

অসুস্থতার প্রকোপ যখন বাড়তেই থাকল এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও ফুরিয়ে এলো তখন বনি উমাইয়ার নেতৃবর্গ তার কাছে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলেন।[২৭২] এরপর শামের আমিরগণ তাকে খলিফা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোঝালে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। তবে হ্যাঁ, আমি যদি মারা যাই তাহলে তোমরা ওয়ালিদ ইবনে উতবাকে আমার জানাজা পড়াতে বলবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত খেলাফত নিয়ে সমস্যার সমাধান না হয় ততক্ষণ যিহহাক ইবনে কায়েস রা. কে নামাজের ইমামতি করতে বলবে।"[২৭৩]

তার সম্মানিত জননী বংশের দোহাই দিয়ে খুব শক্তভাবে তাকে বলল যে, সে যেন তার ভাই খালেদ ইবনে ইয়াজিদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে; কিন্তু তখন তিনি এক আশ্চর্যজনক উত্তর দিলেন, বললেন, আমি কি জীবনভর এই বোঝা বহন করব এবং মৃত্যুর পরও? অসম্ভব! আমি কখনোই এমনটা করব না।[২৭৪]

ছেলের কাণ্ডকে কেনো ইতিহাসের অংশ বানালো? হাজ্জাজের মতো এমন কঠোর শাসকেরও কেনো এতো গুণ বর্ণনা করেছিলেন? মূলত বাস্তব কথা হলো সেই সকল ঐতিহাসিকগণ মূলত মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাদের উপর কোনো খারাপ মন্তব্য করাটা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই না। আসলে বিরোধিতা ও প্রোপাগান্ডা বনু উমাই কেন বনু আব্বাস বরং সব যুগেই এটা ছিল। কোনো যামানা বা কোনো শাসকই এ থেকে মুক্তি পায়নি। অবশ্য বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে বর্ণনা কিছুটা বেশিই হয়েছে। কারণ তাদের সময়কালটা ছিল খুবই সংকটময় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার। সুতরাং একথা বলাটা খুবই অযৌক্তি যে, বনু উমাইয়ার প্রত্যেক শাসকই ছিল খারাপ ও জালিম।

[২৭২] তারিখে দিমাশক : ৫৯/৩০১, ৩০৩

[২৭৩] তারিখে দিমাশক : ৫৯/২৯৯, ৩০২

[২৭৪] তারিখে দিমাশক : ৫৯/৩০৩

এটা সেই উত্তর ছিল, যা হজরত উমর রা. দিয়েছিলেন, আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তা বহন করতে অপছন্দ করি।[২৭৫]

এই সিদ্ধান্ত এবং উত্তর শুনে বুঝতে কঠিন হয় না যে, তিনি অল্পবয়সেই কতো অসাধারণ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। যদি আরো বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো অনেক সুন্দর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারতেন। তার আংটিতে এই বাক্য অঙ্কিত ছিল- "বিল্লাহি ইয়াসিকু মুয়াবিয়া।"

মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ এবং ইবনে যুবাইর রা. ও হুসাইন ইবনে নুমাইরের মাঝে যুদ্ধের অবসান

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার মৃত্যু ১৪ রবিউল আওয়ালে হয়েছিল। এই সংবাদ ১৭ দিনে এসে মক্কায় পৌঁছল। মক্কায় তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং হুসাইন ইবনে নুমাইর যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন।[২৭৬]

দামেশকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু সহযোগী ছিলেন, যারা প্রত্যহ সেখানকার সংবাদ তার কাছে পাঠাতেন। সে কারণে হুসাইন ইবনে নুমাইরের পূর্বেই তিনি ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে যান। এরপর তিনি শামের সৈন্যদের ডেকে বলতে লাগলেন, "এখন তোমরা কার জন্য লড়াই করছো? তোমাদের শাসকের তো মৃত্যু হয়ে গেছে।"

শামি সৈন্যরা উত্তর করল, "এখন আমরা ইয়াজিদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য লড়াই করব।" এর ঠিক ৪০ দিনের মাথায় মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের মৃত্যুসংবাদও এসে পৌঁছল। এই সংবাদ এবং বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রহ. আগেই জেনে ফেললেন এবং শামবাসীদের বললেন, "ইয়াজিদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়ে গেছে।"

শামি সৈন্যরা তখন বলল, "তাহলে এখন আমরা তারও স্থলাভিষিক্ত শাসকের জন্য লড়াই করব।"

---

[২৭৫] তারিখে দিমাশক : ৪২/৪২৮

[২৭৬] আখবারু মাক্কাহ লিলআযরুকি : ১/১৯৭

"তিনি তো কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে রেখে যাননি।"

হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথা শুনে হুসাইন ইবনে নুমাইর বলল, "আপনি যা বলেছেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে অচিরেই আমরা তা জানতে পারবো।"[২৭৭]

এরপর যখন সরকারি বার্তাবাহক হুসাইন ইবনে নুমাইরকে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ জানাল এবং এখন উম্মতের কোনো খলিফা নেই এই বিষয়টাও বিস্তারিতভাবে জানতে পারল তখন সে অবরোধ উঠিয়ে নিলো এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আলাপ-আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিলো। নিজে এসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করল। সে যখন আসছিল তখন হারামের কবুতরগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে চলছিল। এটা দেখে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বললেন, "এসব কবুতরের কষ্ট তোমাদের সহ্য হয় না; অথচ এখানে মুসলমানদের সাথে লড়াই করছো!" হুসাইন লজ্জিত হয়ে বলল, আমি আর আপনার সাথে লড়াই করব না। আমাদেরকে একটু তাওয়াফ করার সুযোগ দিন। শেষ হলে আমরা ফিরে যাবো।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. অনুমতি দিলেন এবং এই ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, যেকোনো শামি চাইলেই সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে যেতে পারবে। আর যারা ফিরে যেতে চাইবে ফিরে যাবে।[২৭৮]

ইবনে নুমাইরের আবদার এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর দূরদর্শিতা

বালাযুরির বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায়, ফিরে আসার পূর্বে হুসাইন ইবনে নুমাইর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে বলল, "আমি আগামীকাল হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে

---

[২৭৭] তারিখে খলিফা : ২৫৫

[২৭৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৫০১

দাঁড়িয়ে আপনার হাতে এই শর্তে বাইয়াত গ্রহণ করব যে, আপনি আমাদের সাথে শামে যাবেন এবং সেখানেই থাকবেন। আমরা আপনার প্রতিরক্ষায় মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করব।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. উত্তরে বললেন, "আমার শুরার মূল সদস্যদের পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই দিতে পারবো না। আমি তাদের সাথে কথা বলে আপনাকে জানিয়ে দেবো।"

এরপর তিনি শুরার সদস্যদের কাছে পরামর্শ চাইলে তারা বললেন, "আপনি কি পবিত্র হারাম—যেখানে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সাহায্য করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালার দেওয়া নিরাপত্তা—ছেড়ে সেসব লোকের কাছে যাবেন, যারা আল্লাহর ঘরে আক্রমণ করেছে? এসব আলোচনার পর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাকে জানিয়ে দিলেন যে, "আমার সাথিরা শামে যাওয়ার পক্ষপাতী নয়।"[২৭৯]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথিবৃন্দ শামের প্রতি আগে থেকেই আশ্বস্ত ছিলেন না। তা ছাড়া তার সাথিদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ২ হাজার ছিল। যদি হুসাইনের এসব শর্তের আড়ালে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকত তাহলে শামে গিয়ে সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করতে পারতো। আর যদি হুসাইন ইবনে নুমাইরের ভেতর নেক নিয়তও থাকতো তবু একথা জানা ছিল না যে, সেখানকার আমিরদের আচরণ কেমন হতো। তবে হ্যাঁ, তখন যদি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে অনেক বেশি সঙ্গী থাকতো, যাদের সাথে শামের আমিরগণ শক্তিতে পরাজিত করতে পারত না তাহলে সেখানে যাওয়াতে কোনো সমস্যা ছিল না। তাই সতর্কতা এটাই ছিল যে, তিনি সেখানে থেকেই শামের আমিরদের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন যেমনটা তিনি পরবর্তীতে করেছিলেন। ভবিষ্যৎ-অবস্থা একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত পূর্ণমাত্রায় সঠিক এবং দূরদর্শিতাপূর্ণ ছিল।

---

[২৭৯] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩৫১

ইবনে যুবাইর রা. এর সাথে সন্ধি ও হিশাম কালবির উপাখ্যান

হুসাইন ইবনে নুমাইর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে এই আবেদন জানাল যে, আপনি আমাদের সাথে শামে চলুন। শামি সৈন্যরা আপনার সাথেই থাকবে। সেখানকার সবাই আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তবে শর্ত হলো আমাদের পরস্পরের লড়াইয়ে যারা নিহত হয়েছে, তাদের রক্তপণ ক্ষমা করে দেবেন। এই কথা শুনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. চিৎকার দিয়ে উঠলেন। বললেন, কী ভেবেছো, আমি তোমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেবো! আল্লাহর শপথ, আমার তো প্রত্যেক নিহতের বদলে তোমাদের দশজনকে হত্যা করেও শান্তি হবে না। হুসাইন তখন আস্তে-ধীরে উত্তর দিলো, আপনাকে যে ব্যক্তি বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী মনে করবে সে ভুলের উপর আছে। আমি আস্তে আস্তে কথা বলছি আর আপনি চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। আমি আপনার কাছে খেলাফত পেশ করছি আর আপনি হত্যা ও প্রতিশোধের কথা তুলছেন। এই কথা বলে সে তার সাথিদের নিয়ে চলে গেলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. পরে খুব লজ্জিত হলেন এবং তাকে এখানেই বাইয়াত হওয়ার কথা বললেন। কিন্তু তিনি শামে যাওয়ার জন্য তখনো প্রস্তুত ছিলেন না। তাই হুসাইনও আর ফিরে এলো না।[২৮০]

এই বর্ণনাটা আসলে ইচ্ছাকৃতভাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে বুদ্ধিবিবেচনাহীন এবং শরিয়তবিরোধী প্রমাণ করার জন্যই দাঁড় করানো হয়েছে। এর বর্ণনাকারী হিশাম কালবি হলো রাফেযি। সে নিজেও এটা নিশ্চিত হয়ে বর্ণনা করেনি। বরং ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব বলেছে। তার বর্ণনা হলো, "কোনো কোনো কুরাইশ ধারণা করল যে, তিনি বলেছেন, কী ভেবেছো, আমি তোমাদের এমনিতেই ছেড়ে

---

[২৮০] তারিখুত তাবারি : ৫/৫০১, ৫০২ এই বর্ণনাটাই বালাযুরি অন্য এক সনদে বর্ণনা করেছে। আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩১৭ কিন্তু এই সনদে হাইসাম ইবনে আদী নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। যাকে মাতরুকুল হাদিস এবং কাযযাব হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। মিযানুল ইতিদাল : ৪/৩২৪ এই কারণেই এই বর্ণনার কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই। এখানে যদিও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা বিষয়টা এসেছে; কিন্তু তারপরেও এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ যে বর্ণনায় কাজ্জাব রাবি কিংবা এ মাপেরই অনেকেই জমা হয়ে যায় তখন রেওয়ায়েতে কোনো শক্তি সৃষ্টি হয় না।

দেবো! আল্লাহর শপথ, আমার তো প্রত্যেক নিহতের বদলে তোমাদের দশজনকে হত্যা করেও শান্তি হবে না।"

সনদের দিক থেকে তো এই বর্ণনা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া চিন্তা করলেও এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন বিশিষ্ট আলেম, সুন্নাহর অনুসারী ও মুত্তাকি সাহাবি একজনের বদলায় দশজনের জীবন নিতে আগ্রহী হবেন! হজরত সিদ্দিকে আকবারের নাতি, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার লালন-পালনে বেড়ে-ওঠা-ভাগিনা এমন সিদ্ধান্ত নেবেন এটা মানুষ কেন, জঙ্গলের পশুও বিশ্বাস করতে চাইবে না। তবে হ্যাঁ, এতটুকু হয়েছিল যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হুসাইন ইবনে নুমাইরকে প্রথমে শামে যাওয়ার কথা দেন; কিন্তু পরবর্তীতে সমস্যার কারণে তিনি তার কাছে ওজর পেশ করে সমাধান করে নেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. এর আক্ষেপ প্রকাশ এবং সতর্কবাণী

হুসাইন ইবনে নুমাইরের ফিরে আসার অল্পদিন পরেই কিছু সাথি-সঙ্গীসহ উমরা করতে আসেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.। তিনি কাবাঘরের ভঙ্গুর দশা দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। চোখ ঝাঁপিয়ে জল এলো। এরপর তিনি বললেন, "হে লোকসকল, যদি হজরত আবু হুরাইরা রা. তোমাদেরকে অনেক আগেই একথা বলে দিতেন যে, তোমরা নবীজির নাতিকে শহিদ করবে এবং নিজেদের রবের ঘর জ্বালিয়ে দেবে তাহলে তখন তোমরা বলতে, আবু হুরাইরার চেয়ে বড় কোনো মিথ্যাবাদী নেই। অথচ তোমরা কি নবীজির নাতিকে শহিদ করে দাওনি? কাবাঘরে আগুন ধরিয়ে দাওনি? আল্লাহর শপথ, তোমরা এমনটাই করেছো। তোমরা নবীজির নাতিকে হত্যা করেছো এবং কাবাঘর জ্বালিয়ে দিয়েছো। সুতরাং এখন তোমরা সেসবের শাস্তির অপেক্ষায় থাকো। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের জীবন, আল্লাহ অচিরেই তোমাদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেবেন ও দলে দলে বিভক্ত কওে ফেলবেন এবং পরস্পরে লড়াইয়ে মত্ত করে ছাড়বেন। তোমাদেরকে যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করাবেন।"

শেষের এই কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর আরো উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "তারা কোথায়, যারা কল্যাণের আদেশ দেয়? তারা কোথায়, যারা গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করে? সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের জীবন, যদি আল্লাহ অচিরেই তোমাদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেন ও দলে দলে বিভক্ত করে ফেলেন এবং পরস্পরে লড়াইয়ে মত্ত করে দেন তাহলে তখন তাদের থেকে জমিনের তৃণলতাও অনেক উত্তম হবে, যাদেরকে না কল্যাণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর না গুনাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।"[২৮১]

---

[২৮১] আখবারু মাক্কা লিআবিল ওয়ালিদ আল আযরুকি : ১/১৯৬, ১৯৭ আবুল ওয়ালিদ আযরুকি একজন সিকাহ রাবি, ফকিহ এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। ইমাম বুখারিও তার থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করে সহিহ বুখারিতে একথা বলেছেন যে, তিনি শাফেয়ি মাযহাবের ফকিহগণের মধ্যে প্রথম সারির একজন। তিনি সরাসরি ইমাম শাফেয়ি রহ. থেকে হাদিস, ফিকহের ইলম অর্জন করেন। আযরুকি আখবারি মাক্কাহতে যথাসম্ভব শুদ্ধ বর্ণনাগুলো আনার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য যদিও কিছু বর্ণনা দুর্বল আছে। তবে সামগ্রিকভাবে এই কিতাবটি মুহাদ্দিসদের কাছে গ্রহণযোগ্য। উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীগণ হলেন-আবুল ওয়ালিদ বর্ণনা করেছেন যে, আমার কাছে আমার দাদা আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ এবং ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ অশ শাফেয়ি তিনি মুসলিম ইবনে খালেদ, তিনি ইবনে খাসইয়াম তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন।

রাবিগণের হালাত

১. ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ আশ শাফেয়ি। মৃত্যু : ২৩৭ হিজরি। তিনি ইমাম শাফেয়ির চাচাতো ভাই ছিলেন। একজন সিকাহ রাবি হিসেবেই গণ্য ছিলেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/১৬৬

২. মুসলিম ইবনে খালেদ : মৃত্যু : ১৮০ হিজরি। ফাকীহুন, সদুকুন এবং কাসীরুল আওহাম ছিলেন। তাকরিবুত তাহযিব : তরজমাহ নং, ৬৬২৫

৩. ইবনে খাসইয়াম : মৃত্যু : ১৩২ হিজরি। সদুকুন। তাকরিবুত তাহযিব : তরজমা নং, ৩৪৬৬

৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে সা'দ : সম্ভবত তিনি সেই উবাইদুল্লাহ যিনি ইয়াসার ইবনে উমাইর থেকে হজরত উমর রা.-এর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন এবং তার থেকে শরিক ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। তাকে সিকাহ রাবিগণের মধ্যে শামিল করা হয়। আসসিকাত লিমান লাম ইয়াকা' ফি কুতুবিস সিত্তাহ: ৭/২২ তবে একটু সন্দেহ হলো, ইনিই কি সেই উবাইদুল্লাহ কি না। এখন কথা হলো, এই বর্ণনাটা যদি কিছুটা দুর্বল হিসেবেও গণ্য করা হয় তবুও কোনো সমস্যা নেই। কারণ প্রথমত, এটা ইসলামি শরিয়তের উসুলের সাথে কোনো সম্পর্কিত বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত এর পূর্বাপর ঐতিহাসিভাবে প্রমাণিত। সুতরাং বর্ণনাটা গ্রহণ করাতে আর কোনো বাধা থাকে না।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর খেলাফতকাল

৯ রজব ৬৪ হিজরি থেকে ১৭ জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরি পর্যন্ত

৩ মার্চ ৬৮৪ থেকে ১৫ অক্টবর ৬৯২ পর্যন্ত

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর জীবনচরিত

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হলেন উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি। তার পিতার নাম হজরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি। তার মা আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা.। তার দাদি সুফিয়া ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু। তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। গায়ের রং ছিল বাদামি। দাড়ি ছিল হালকা ঘন ও লাল। মাথার চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত।

জন্ম ও শৈশব

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হিজরতের প্রথম বছর জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পর ছেলেসন্তান হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেছেন। তার জন্মের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাকে পেশ করা হলে তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। সেই সময় ইহুদিরা এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে রেখেছিল যে, তারা জাদু-টোনা করে মুসলমানদের ছেলেসন্তান জন্মের ধারা বন্ধ করে রেখেছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে তাদের এই দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মুসলমানগণ যারপরনাই আনন্দিত হয়।[২৮২] বর্ণিত আছে, যখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. জন্মগ্রহণ করলেন তখন মদিনার মুসলমানগণ খুশিতে এমন তাকবিরধ্বনি দিয়েছিল, সারা মদিনায় তা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।[২৮৩] হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এই বরকতময় সন্তানকে

[২৮২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৯৩ সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৭০

[২৮৩] সহিহ বুখারি : ৫৪৬৯ কিতাবুল আকিকাহ: ৩৯০৯ কিতাবুল মানাকিব বাবু হিজরাতুন নাবি।

সাথে নিয়ে সারা মদিনা ঘুরে বেড়ান, যাতে ইহুদিরা অপমানিত হয়।[২৮৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছোট কাউকে বাইয়াত করতেন না; কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন তার বাবাকে অনেক বলে-কয়ে নবীজির কাছে তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য করলেন তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে তাকে বাইয়াত করে নেন। তার সাথে তখন উবাইদুল্লাহ ইবনে জাফর, আমর ইবনে আবি সালামা-সহ আরও কিছু বাচ্চা ছিল। অন্যরা তো ভয় পাচ্ছিল; কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. প্রথমে গেলেন নবীজির কাছে বাইয়াত হতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহস দেখে মুচকি হেসে বললেন, "এই না হলো বাপের বেটা!" সেইসময় তার বয়স ছিল সাত বছর।[২৮৫] হজরত আয়েশা রা. যেহেতু সম্পর্কে তার খালা ছিলেন; সেই সুবাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে তার অনেক যাতায়াত ছিল।[২৮৬]

সাহসিকতা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ছোট থেকেই অনেক বাহাদুরি ও নেতৃত্বদানে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার তিনি তার বন্ধুদের সাথে মদিনার এক গলিতে খেলছিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ এক লোক এসে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য খুব জোরে চিৎকার দিলো। সবাই তো ভয় পেয়ে দিলো দৌড়। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. একটুও ভয় পেলেন না। দৌড়ে পালালেন না। বরং জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে সাথিদের উচ্চ আওয়াজে ডেকে বললেন, "বন্ধুরা, তোমরা আমাকে আমির বানিয়ে এই ব্যক্তির উপর হামলা করো।"

আরেকবারের ঘটনা। তখনো তিনি খুব ছোট। সাথিদের নিয়ে মদিনার এক রাস্তায় খেলছিলেন। এমন সময় হজরত উমর রা. সেখান দিয়ে গেলেন। তখন তিনি খলিফা ছিলেন। সবাই তো হজরত উমর রা. কে

---

[২৮৪] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৩০

[২৮৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৭৭

[২৮৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৬৪ আল-ইসাবাহ : ৪/৮০

দেখে দৌড়ে পালালো। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হজরত উমর রা. আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার, তুমি কেন তাদের সাথে পালালে না?” তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সোজা উত্তর দিলেন, আমিরুল মুমিনিন, আমি এমন কোনো অপরাধ করিনি, যার কারণে আপনাকে ভয় পেয়ে পলায়ন করব। আর রাস্তাও এতো সঙ্কীর্ণ নয় যে, আমি সরে গিয়ে আপনাকে যাওয়ার পথ করে দেবো।”[২৮৭]

এ ছাড়াও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মাত্র ১৩ বছর বয়সে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতা হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ঘোড়ায় বসে ছিলেন। এরপর রোমান সৈন্যরা যখন পিছপা হয়ে গেলো তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার বাহিনীর আহত সদস্যদের খোঁজ লাগালেন।

হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি আফ্রিকা বিজয়ী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার অসাধারণ নেতৃত্ব ও আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের কারণে মাত্র ২০ হাজার মুসলমান ১ লাখ ২০ হাজার কাফের সৈন্যকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। সেই যুদ্ধে তিনি নিজে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আফ্রিকার শাসক জুরজিরকে হত্যা করেন। হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেন। হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তিনি কুসতুনতুনিয়া যুদ্ধে শামিল ছিলেন।[২৮৮] তার হাতেই সুসা-সহ আফ্রিকার কিছু অঞ্চল বিজিত হয়।[২৮৯]

হজরত মুয়াবিয়া তাকে খুব সম্মান করতেন। একবার তিনি হজরত মুয়াবিয়ার কাছে গেলেন। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে দেখে বললেন, “মারহাবা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফির

---

[২৮৭] তারিখে দিমাশক : ২৮/১৬৫

[২৮৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৮৭

[২৮৯] আল-বায়ানুল মুগরিব : ১/১৬, ১৭

সন্তানের জন্য। রাসুলের সহচরের ছেলের জন্য।" এরপর হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে ১ লাখ দিনার বা দিরহাম হাদিয়া দিলেন।[২৯০]

আয়েশা রা. এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর মহব্বত

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে নিজের সন্তান বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ কারণেই হজরত আয়েশা রা. যখন নিজের উপনাম কী হবে তা নিয়ে নবীজির সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন তখন নবীজি আয়েশা রা. কে বললেন, "তুমি তোমার ছেলে আবদুল্লাহর নামে উম্মে আবদুল্লাহ উপনাম রেখে দাও।" এরপর থেকে নবীজি হজরত আয়েশা রা. কে উম্মে আবদুল্লাহ বলেই ডাকতেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে জঙ্গে জামালে আশতার নাখায়ি অনেক আঘাত করা সত্ত্বেও তিনি জীবন দিয়ে হজরত আয়েশা রা. কে হেফাজত করে যাচ্ছিলেন। ৪০টিরও বেশি আঘাত লেগেছিল তার গায়ে। বাহ্যত তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু হজরত আয়েশা রা. যখন তার বেঁচে যাওয়া ও সুস্থ হয়ে ওঠার কথা শুনলেন তখন তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং সুসংবাদ প্রদানকারীকে দশ হাজার দিনার উপহার দিলেন।

তার ভাই উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. বলেন, "আমি আমার পিতা হজরত যুবাইর রা. এবং খালা হজরত আয়েশা রা. কে কারো জন্য এতো দোয়া করতে দেখিনি যতটা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জন্য।" এবং হজরত আয়েশা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে।[২৯১]

যুহুদ ও ইবাদত

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যুহুদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই ছিলেন। নামাজে তার একাগ্রতা ছিল অতুলনীয়।

---

[২৯০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৬৭

[২৯১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৬৭

তিনি যখন নামাজে দাঁড়াতেন তখন দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যেতেন। নফল নামাজ অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়তেন। এতো দীর্ঘ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও তার শরীর সামান্যও নড়াচড়া করতো না, যেন কোনো খুটি গেড়ে দেওয়া হয়েছে। কখনো কখনো এমন দীর্ঘ সেজদা করতেন, পাখি এসে তার পিঠে বসে যেতো।[২৯২]

একদিনের ঘটনা। তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় ছাদ থেকে একটি সাপ এসে তার ছেলেকে পেঁচিয়ে ধরলো। বাড়ির নারী সদস্যরা এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করতে শুরু করল। সর্বোপরি তারা ঘরে এসে সেই সাপ মেরে ফেলল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তখন একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ছিলেন। এসবের কিছুই তিনি জানতেন না। এরপর যখন সালাম ফেরালেন তখন লোকজন তাকে এই ঘটনা জানাল।[২৯৩]

ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রহ. বলতেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নামাজ শিখেছিলেন হজরত আবু বকর রা. থেকে। আর হজরত আবু বকর রা. শিখেছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (এজন্যই তার নামাজে এমন একাগ্রতা ছিল)।[২৯৪] মক্কায় যুদ্ধ চলাকালে শত্রুরা যখন মিনজানিক দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করছিল তখনো তার নামাজে একাগ্রতায় সামান্য ঘাটতি ছিল না। একবার মিনজানিকের পাথর এসে মসজিদে হারামের একটি ঘরে এসে পড়ল। সেখান থেকে আগুনের একটি ফুলকি তার গলা ও দাড়ির মাঝ-বরাবর স্থান দিয়ে ছিটকে উড়ে গেলো। কিন্তু এতেও তার নামাজে একাগ্রতার কোনো ব্যত্যয় ঘটলো না এবং সেদিকে তার মোটেই ভ্রুক্ষেপ ছিল না। বরং পূর্ণ খুশু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় করে যেতে থাকলেন।[২৯৫] মুজাহিদ রহ. বলেন, ইবাদতের আগ্রহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বেশি আর কারো মাঝে আমি দেখিনি। একবার কাবাঘর

---

[২৯২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/১৮৯

[২৯৩] তারিখে দিমাশক : ২৮/১৭৪

[২৯৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/১৮৯

[২৯৫] তারিখে দিমাশক : ২৮/১৭৬

বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেলো। কিন্তু তখনো তিনি সাঁতরে সাঁতরে কাবাঘরের তাওয়াফ করেছেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনটি বিষয়ে কেউ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমকক্ষ নেই। এক. বীরত্ব ও সাহসিকতা। দুই. ইবাদত-বন্দেগি। তিন. বাগ্মিতা ও বাকপটুতা।[২৯৬] তিনি সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতেন মসজিদে। তাই তিনি 'হামামাতুল মাসজিদ' মসজিদের কবুতর উপাধিতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২৯৭]

জ্ঞানগত ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণতা

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সংস্পর্শ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে হাদিস এবং ফিকহের সমুদ্র বানিয়ে তুলেছিল। কয়েকজন প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস, যেমন, হজরত তাউস ইবনে কাইসান, হজরত আমর ইবনে দিনার, হজরত সাবেত আল বুনানি, হজরত ইবনে আবি মুলাইকা, ওয়াহাব ইবনে কাইসান, হজরত আবু ইসহাক আস-সাবিয়ি, হজরত সাঈদ ইবনে মিনা, হজরত আবু যুবাইর রহ. প্রমুখ তার শাগরেদ ছিলেন। তার ভাই হজরত উরওয়া ইবনে যুবাইর, ভাতিজা হিশাম ইবনে উরওয়া তারই অধীনে থেকে মুহাদ্দিস এবং ফকিহ হয়ে উঠেছিলেন।[২৯৮] বর্ণিত আছে, মদিনায় আবদুল্লাহ নামে চারজন অনেক উঁচুমাপের ফকিহ ছিলেন। এক. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। দুই. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। তিন. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.। চার. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.। বিশেষত হজের বিধিবিধান এবং বিভিন্ন বিষয়ে শাখাগত মাসআলা বের করার ব্যাপারে তার সমতুল্য কেউ ছিল না। হজের বিষয়ে তিনি বলতেন, "হে হাজিগণ, তোমরা আমাদেরকে হজের মাসআলা জিজ্ঞেস করো। কারণ কুরআন মাজিদ আমাদের মাঝেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা তার আসল অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে খুব ভালো জানি।"[২৯৯]

---

[২৯৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/১৯৩

[২৯৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৬৭

[২৯৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৬৪

[২৯৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৬৭

হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে যখন কুরআন মাজিদ একত্র করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তখন বাছাই করা সেই দলের জিম্মাদারদের মধ্যে হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এবং কারী সাহাবিদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শামিল ছিলেন।[৩০০] তার অনন্য বাগ্মিতা ও বাকপটুতার ব্যাপারে সকলেই একমত ছিলেন। তার আওয়াজ ছিল অনেক উঁচু। যখন বক্তব্য দিতেন তখন অনেক দূর থেকেও তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যেতো এবং পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতো।[৩০১]

রাজনৈতিক বিষয়াদি ও পার্থিব জগতের কাজেও তিনি ছিলেন শতভাগ সজাগ ও সতর্ক। তার কাছে বিভিন্ন ভাষার ১০০ গোলাম ছিল। তিনি তাদের ভাষাতেই তাদের সাথে কথা বলতেন। তার সাথিদের একজন হজরত আমর ইবনে কায়েস বলেন, আমি তাকে পার্থিব জগতের কাজে এমনভাবে মশগুল হতে দেখে ভাবতাম মনে হয় তিনি আর আখেরাতের কাজের সাথে জড়িত হবেন না। আর যখন তাকে আখেরাতের কাজের সাথে সম্পৃক্ত দেখতাম তখন মনে হতো পার্থিব কাজে তিনি আর কখনো জড়াবেন না।[৩০২]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তার কথা উল্লেখ করে বলেন, "তিনি কিতাবুল্লাহর হাফেজ এবং কারী ছিলেন। সুন্নাতে রাসুলে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার অনুগত ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে প্রচণ্ড গরমেও রোজা রাখতেন। নবীজির সাথি-সঙ্গীর সন্তান ছিলেন। তার মা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা ছিলেন। তার খালা ছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.। তার মূল্য ও মর্যাদা সে-ই উপেক্ষা করতে পারে, আল্লাহ যাকে অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছেন।[৩০৩]

চিন্তার এক সূক্ষ্ম রেখা

কেউ যদি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কোনো অভিযোগ দাঁড় করাতে চায় তাহলে সে সর্বোচ্চ এটা বলতে

---

[৩০০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৭০
[৩০১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১ /১৯৩
[৩০২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১ /২০৪
[৩০৩] সহিহ বুখারি : ২৬৬৪, ২৬৬৬ কিতাবুত তাফসির। মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৩১ হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩৪

পারবে যে, হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণ রাজত্বকালে তিনি তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি, যা বিদ্রোহের আওতায় এসে যায়। তবে এখানে একথাও জানা থাকা দরকার যে, তিনি আসলে এক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদ ছিলেন, যেমন হজরত তালহা, যুবাইর, হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বাইয়াত না হওয়া এবং বিদ্রোহ করাটা ইজতিহাদি বিষয় ছিল। এখানে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আলেমগণ সেটাকেই বিদ্রোহ বলেন, যা 'ইমামে আদেল'-এর বিরুদ্ধে করা হয়। আর এই মতাদর্শই ছিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার উপর কোনোভাবেই বিদ্রোহের অপবাদ আরোপ করা যায় না। আর অধিকাংশ আলেমের মতে 'ইমামে আদেল' এই শর্তটি নেই। তবে তাদের মতে বিদ্রোহ হলো শাসকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ না করে শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করে কোনো এক এলাকাকে নিজের অধীনে আনার জন্য আক্রমণ করা। কিন্তু এরপরও ইয়াজিদের শাসনামল এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের পার্থক্য একজন অন্ধও দেখে বলে দিতে পারবে। হজরত আলি রা. নিঃসন্দেহে একজন আদেল ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। অথচ ইয়াজিদের মধ্যে আদেল ও ন্যায়পরায়ণতার ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। এজন্য ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারটা হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত থেকে সরে আসাটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম একটি বিষয়। তা সত্ত্বেও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বিদ্রোহের অপবাদ লাগালেও তা সর্বোচ্চ ইয়াজিদের মৃত্যু পর্যন্ত মেনে নেওয়া যায়। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত নিঃসন্দেহে শরয়ি ছিল। যেমন হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্বমুক্তির পর থেকে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত শরিয়তসম্মত হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শরয়ি খলিফা হয়েছিলেন। আক্ষেপ সেসকল লোকের উপর, যারা হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত আয়েশা রা. এর সম্মান বজায় রাখা ও প্রতিরক্ষা করার দাবিদার; অথচ তার কোলেই লালিত-পালিত, তরবিয়তপ্রাপ্ত, তাদের প্রিয় এবং এমন সম্মানিত একজন সাহাবিকে তারা বলে ফাসাদ সৃষ্টিকারী, মূর্খ এবং

পথভ্রষ্ট। অথচ এসব বলতে তাদের ভেতরটা সামান্যও কাঁপে না। ইয়াজিদকে নিষ্পাপ প্রমাণিত করার জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এমন উঁচুমাপের একজন সাহাবিকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে? কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিরোধের এই পন্থা সাহাবিদের কর্মপন্থা হিসেবে মেনে নেবে?

যদি কেউ বলে যে, আমরা আসলে হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কথা বলি; মূলত সেই সময় জমহুর সাহাবায়ে কেরাম নীরবতাকেই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। এখন যদি একথা বলা হয় যে, ইয়াজিদ শাসক হওয়ার উপযুক্ত ছিল না। তাহলে জমহুর সাহাবায়ে কেরামের উপর এই অপবাদ আরোপ হবে যে, তারা তাহলে আসল বিষয়টি বুঝতে পারেননি কিংবা বুঝেছিলেন; তবে ভয়ে চুপ ছিলেন। যেমনটা বুঝেছেন এবং করেছেন হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.। এই কথাটা বাতুলতা ছাড়া আসলে কিছুই না। কারণ, জমহুর সাহাবায়ে কেরাম তখন যে চুপ ছিলেন, সেটা তাদের ইজতিহাদের ভিত্তিতেই এবং হজরত হুসাইন রা. ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ-জিহাদ, ইয়াজিদের বিরোধিতা এটাও ছিল তাদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত যখন এটাই হয়ে গেলো যে, জমহুর সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ অনুযায়ী ফাসেক ও জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয় তখন এটা কীভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা ভয়ে চুপ ছিলেন? এবং এর দ্বারা এটা কীভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদ খুব নেককার, ন্যায়পরায়ণ, নিষ্কলুষ ফেরেশতা শাসক ছিলেন? আর এটাওবা ঠিক হয়ে যায় কীভাবে যে, ইয়াজিদের ব্যাপারে যেসব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা তো এখন তাওয়াতুরের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এগুলো দেখা ও জানা সত্ত্বেও হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী ইয়াজিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন তখন তাদের উপর বিদ্রোহের অপবাদ দেওয়ার সুযোগই-বা আসে কোথা থেকে?

আর যদি সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরোধ ইয়াজিদের প্রতিরোধের উপর

মওকুফ থাকতো তাহলে চৌদ্দশত বছর ধরে ওলামায়ে উম্মত ইয়াজিদের ফিসক ও জুলুমের ব্যাপারে একমত হতেন না। একথা কি সামান্য কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি মেনে নেবে যে, হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ, ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল, আল্লামা ইবনে জাওযি, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইবনে কাসির ও মুজাদ্দিদে আলফেসানি থেকে নিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবি ও ফকিহুল আসর মাওলানা রশিদ আহমাদ গঙ্গুহি রহ. পর্যন্ত আমাদের আকাবির-আসলাফ, যারা সাহাবায়ে কেরামের আদালাত-সাদাকাতের বিশ্বাস পোষণ করতেন, সেই তারা ইয়াজিদের বিষয়ে না বুঝেই এমন অবস্থানে গিয়েছেন! সামান্য না ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন!

৬৪ হিজরির বিপজ্জনক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

৬৪ হিজরির দিনগুলি ইসলামিবিশ্বে এক নতুন রাজনৈতিক মাত্রা ও মোড় প্রত্যক্ষ করছিল। রবিউল আওয়াল মাসের শেষদিকে ২৪ তারিখে ইয়াজিদের স্থলাভিষিক্ত মুয়াবিয়ার মৃত্যু হয়। তারপর এমন কেউ ছিল না, যে রাজনীতির লাগাম নিজের হাতে তুলে নেবে। স্বয়ং মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের এই দাবিই ছিল, যেন খেলাফতের বিষয়টা উম্মতের সন্তুষ্টি এবং শুরা তথা পারস্পরিক পরামর্শ-নীতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নিজেও এদিকেই আহ্বান করছিলেন। তিনি হিজাজবাসীর অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নিজেকে খলিফা দাবি করেননি। বরং তিনি চাচ্ছিলেন এই পৈত্রিক রাজ্য পরিচালনার ধারা যেন বন্ধ হয়ে যায়।

মদিনার অধিবাসীগণ শুরু থেকেই এই নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিলেন এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের থেকে কোনো সিদ্ধান্ত আশা করছিলেন। শাম এবং ইরাকেও একই অবস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা কী হবে?

এই প্রশ্নের যথাযথ কোনো উত্তর ছিল না।

এই অস্থিতিশীল পরিবেশে হজরত নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই চিঠিটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ, যা তিনি ইরাকের কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে লিখেছিলেন। সেখানে তিনি ধৈর্যধারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা যেন না জেনে, না বুঝে কারো অনুগত না হন এবং উম্মতের মধ্যে চলমান বিশৃঙ্খলা আর দীর্ঘায়িত না করেন। এই ব্যাপারে তিনি চিঠিতে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছিলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অন্ধকার রাতের মতো ফেতনা আসতে থাকবে। মানুষ সকালে

মুমিন হবে আর সন্ধ্যায় কাফের। লোকেরা পার্থিব জীবনের সামান্য উপকার বা লাভের জন্য নিজের অন্তর বিক্রি করে দেবে।"[৩০৪]

যিহ্হাক ইবনে কায়েস, যিনি মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের অসিয়ত অনুযায়ী দামেশকে নামাজের ইমামতি করছিলেন, সেইসময় ইরাকবাসীদের এই কথা লিখে একটি পত্র পাঠান, "আপনারা আমাদের ভাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিচ্ছি ততক্ষণ আপনারা আগে বেড়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না।"[৩০৫]

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বাইয়াত গ্রহণ শুরু

পরিস্থিতি ঘোলাটে এবং রাজনীতির ময়দানকে খালি দেখে বসরার হাকিম উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিজেই বাইয়াত গ্রহণ শুরু করে দিলো। জনসাধারণ তার ব্যাপারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ছিল। তা ছাড়া কারবালার ঘটনার পর তার অনেক বেশি বদনাম হয়ে গিয়েছিল। এইজন্য তার কাছে কেউ বাইয়াত হতে রাজি ছিল না। ফলে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ জনগণকে খুব ধমকালো ও শাসালো। সেইসাথে কিছু ওয়াদাও করল এবং ভালো কিছুর মাধ্যমে লোকদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের চেষ্টা করল। তখন তার ভাষণের ভাষাটা ছিল এমন, "যখন আমাকে তোমাদের গভর্নর বানানো হয়েছিল তখন তোমাদের সৈন্য ছিল ৭০ হাজার। আর এখন ৮০ হাজার। তখন তোমাদের প্রশাসনিক কর্মচারী ছিল ৯০ হাজার। আর এখন ১ লাখ ৪০ হাজার। যাকে নিয়ে তোমাদের ভয় হয়েছে, এমন কোনো অমঙ্গলকামীই আমার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তোমরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। তোমরা অন্যকে কেন পরোয়া করবে! তোমরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দমতো শাসক নির্বাচন করে নাও, যিনি দীনদারি এবং উম্মতের কল্যাণকামিতায় তোমাদের মনমতো হবেন। আমিও তার অধীনতা মেনে নেবো। এরপর শামবাসীরা যদি শাসক হিসেবে এমন কাউকে নির্বাচন করে, যার ব্যাপারে তোমরাও একমত তাহলে তোমরা সকলেই তাদের সাথে শামিল হয়ে যাবে।

---

[৩০৪] মুসনাদে আহমাদ : ১৫৭৫৩

[৩০৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৫০৪

অন্যথায় যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাওয়া পূর্ণ করা না হবে ততক্ষণ তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভূখণ্ডের রক্ষক হয়ে থাকবে। অন্য কোনো শহর বা দেশের আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ তোমাদেরকে ছাড়া চলতে পারবে না।"

এই বক্তব্য দ্বারা ইবনে জিয়াদের উদ্দেশ্য কী ছিল? সে কি ইরাকের নতুন কোনো আন্দোলন ঠেকাতে চাচ্ছিল নাকি নিজেই ইরাকের শাসক হতে চাইছিল?

এখানে মৌলিকভাবে দুটি দিকের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইবনে জিয়াদ এটা অবশ্যই চাচ্ছিল যে, লোকজন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ঝুঁকে না যাক। কারণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইবনে জিয়াদের ঘোর বিরোধ ছিল। অপরদিকে মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ছিল অন্যরকম। অল্পকিছু উপদল ছাড়া সকল সাহাবি ও তাবেয়ি এবং সর্বসাধারণও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কেই নেতৃত্বের উপযুক্ত বলে ভাবছিল; অথচ উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তখনো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সকল সম্ভাবনা ধূলিসাৎ করে জনসাধারণকে নিজের আয়ত্তে রাখার সবধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

ইরাকের আমিরগণ যদিও ইবনে জিয়াদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু তাদের করার কিছুই ছিল না। কারণ তাদের মাঝে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ভয় প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। অবশেষে আমিরগণ ইবনে জিয়াদের সাথে এক আশ্চর্যরকম খেলা খেলল। তারা ইবনে জিয়াদের প্রশংসা করে বলল, "হে আমাদের মহামান্য আমির, আল্লাহর শপথ, আপনার মতো এমন ক্ষমতাশালী ও দৃঢ় আর কেউ নেই। এজন্য আমরা আপনার হাতেই বাইয়াত হতে চাই।" এই বলে তারা সামনে বেড়ে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের হাতে বাইয়াত হয়ে গেলো।[৩০৬] এরপর ইবনে জিয়াদ আমিরদের সবিনয় অনুরোধে জেলের বন্দিদের মুক্ত করে দিলো, যাদের অধিকাংশই ছিল খারেজি। তারাও সকলে এসে

---

[৩০৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৫০৪, ৫০৫

ইবনে জিয়াদের হাতে বাইয়াত হলো। কিন্তু এসবই ছিল লোক-দেখানো মনভোলানো। আমিরদের আসল উদ্দেশ্য ছিল কয়েদিদের মুক্ত করা। এজন্যই এরা সবাই যখন ইবনে জিয়াদের মজলিস থেকে উঠে চলে এলো তখন তারা প্রাসাদের দেয়ালে হাত মুছতে মুছতে যাচ্ছিল এবং মজাক করে বলছিল, "ইবনে মারজানার বাইয়াত এখানেই রেখে গেলাম। সে নিজেকে কী মনে করে! আমরা উম্মতের সাথে ঐক্য গড়ে তোলা অথবা পৃথক থাকার বিষয়ে তার হুকুমমতো চলবো!"[৩০৭] ইবনে জিয়াদ বসরাবাসীদের এই বাইয়াতে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছিল। এরপর সে কুফাবাসীদের কাছেও নিজের প্রতিনিধি পাঠাল এবং তাদেরকে বাইয়াত গ্রহণের আদেশ দিলো। কিন্তু কুফাবাসী পরিষ্কার ভাষায় না করে দিলো। এটা দেখে বসরাবাসীদেরও সাহস বেড়ে গেলো। তারাও উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের প্রকাশ্য বিরোধিতায় মেতে উঠল। বসরাতে এভাবে হাঙ্গামা বাড়তে থাকল।[৩০৮] উবাইদুল্লাহ বুঝতে পারল যে, খেলা হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন তার মন চাইছিল সকলের গর্দান উড়িয়ে দিতে। কিন্তু তার হাতে খেলাফতের দায়িত্ব না থাকায় নীরব থাকতে বাধ্য হলো। এরপর এ অবস্থাতেই জুমাদাল উখরা ৬৪ হিজরিতে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মৃত্যু হয়ে গেলো। তার মৃত্যুর পর বসরাবাসী রাজপ্রাসাদে ঢুকে যার যার মতো লুটপাট চালালো। বসরার মন্ত্রী আখনাফ ইবনে কায়েস রহ. এই অবস্থা দেখে বাইতুলমাল, জেলখানা এবং সরকারি সকল অফিসে পাহারাদার নিয়োগ দেন। এরপর সকলকে জমা করে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শহরের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দায়িত্ব দেওয়া হয় আবদুল্লাহ ইবনুল হারেসকে। এভাবে তখন বিশৃঙ্খলা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলো।[৩০৯] খোরাসান-সহ প্রাচ্যদেশের সকল অঞ্চল কুফা ও বসরা থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কিন্তু এখানকার অস্থির অবস্থার কারণে সেইসব অঞ্চলেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। স্থানীয় সরদারগণ আমজনতাকে তাদের নিজেদের মতো ছেড়ে দিলো। ফলে

---

[৩০৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৫০৫ আনসাবুল আশরাফ : ৫/৪১৯

[৩০৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৫০৩

[৩০৯] তারিখে খলিফা : ২৫৮

সকলেই নেতা হয়ে উঠল এবং পরস্পরে তরবারির মাধ্যমে এর সমাধান খুঁজলো।[৩১০] বসরায় তখন এমন অবস্থা ছিল যে, জুমআর নামাজ পড়ানোর জন্য সাময়িক সময়ের জন্য নির্ধারিত আমিরের উপরও লোকদের ঐকমত্য ছিল না। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অনেক মামলা-মুকাদ্দমা ও পরামর্শ করে কাউকে আমির নিযুক্ত করতেন; কিন্তু দু'এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই এই নবনিযুক্ত আমিরকে হটিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ করতেন। পাঁচ-ছ' মাসের ভেতর এমন আমির-বদলের কাজ ঘটেছিল প্রায় চার-পাঁচবার।[৩১১]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কেন খলিফা হলেন?

চারদিকের এমন অস্থিতিশীল পরিবেশে খুব দ্রুত একজন যোগ্য আমিরের প্রয়োজন ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হিজাজের নেতৃবৃন্দের অনেক অনুরোধের পরও নিজেকে আমির হিসেবে ঘোষণা দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করল বেসামাল অবস্থাকে সামাল দিতে এবং উম্মাহর নেতৃত্ব হাতে তুলে নিতে, যা সকলের কোমর তখন ভেঙে দিচ্ছিল। তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর তার চেয়ে উত্তম কেউ ছিল না। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে যদি দেরি করা হতো তাহলে আশংকা ছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মতো কারুর তরবারির ভয় দেখিয়ে খেলাফতের মসনদ দখল করে নেওয়ার। সর্বোপরি ৯ রজব ৬৪ হিজরিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মক্কাতে উম্মতের নতুন খলিফা হিসেবে সকলের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।[৩১২] বাইয়াতের মধ্যে এই ওয়াদা ছিল যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. উম্মতকে কুরআন-সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের পথে পরিচালিত করবেন। তার হাতে যারা প্রথমদিকে বাইয়াত হয়েছিলেন, তারা হলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা., হজরত

---

[৩১০] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৪৬
[৩১১] তারিখুত তাবারি : ৫/৫২৭
[৩১২] তারিখে খলিফা : ২৫৮

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান মুসআব এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে উবাইদুল্লাহ।[৩১৩]

ইসলামিবিশ্বে সর্বময় গ্রহণীয়তা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. প্রথম খলিফা ছিলেন, যার খেলাফত পরিচালনার মূলকেন্দ্র ছিল মক্কা। তার প্রতিনিধিগণ শাম ও ইরাকে রওনা হয়ে গেলেন, যাতে সেখানকার অধিবাসীরাও তার বাইয়াত গ্রহণের সুযোগ পায়। মদিনাবাসী তো প্রথম থেকেই তার পক্ষেই ছিলেন। তাই সেখানকার আমির হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো হজরত উবাইদা ইবনে যুবাইরকে। মিসরের অধিবাসীরাও বাইয়াত হয়ে গেলো। সেখানে আমির নিয়োগ হলেন হজরত আবদুর রহমান ইবনে জাহদাম ফিহরি।[৩১৪] বসরাবাসীরা আঞ্চলিক মতপার্থক্য ও বিভেদ ভুলে নিজ থেকে আবেদন জানাল যে, তাদের জন্য একজন আমির নিযুক্ত করে দেওয়া হোক। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সাময়িকভাবে স্থানীয় বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য বিশিষ্ট সাহাবি, নবীজির খাদেম হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. কে সেখানকার আমির নিযুক্ত করলেন। এরপর যখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলো তখন আমির হিসেবে নিয়োগ পেলেন হজরত আমর ইবনে উবাইদুল্লাহ। কুফায় হজরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি ইবরাহিমকে নামাজের ইমামতি করার আদেশ দিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আল-আনসারিকে সেখানে দাপ্তরিক কাজ সামলাবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। এভাবে ইরাকও তার খেলাফতের অধীনে চলে এলো। এটা ৬৪ হিজরি রমজান মাসের কথা।[৩১৫]

ইবনে যুবাইর রা. এর হাতে শামের অধিকাংশ আমিরের বাইয়াত

শামেও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তাধারার মানুষ একেবারে কম ছিল না। দামেশকে হজরত যাহ্‌হাক ইবনে কায়েস, যিনি

---

[৩১৩] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩৫২

[৩১৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৩০

[৩১৫] তারিখে খলিফা : ২৫৯; তারিখুত তাবারি : ৫/৫৩২- ৫৩০

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের অসিয়ত অনুসারে নামাজের ইমামতি করছিলেন, নিজেও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদর্শ লালন করতেন। তাই তিনি চাচ্ছিলেন বনু উমাইয়ার আমিরদের নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের হাতে বাইয়াত হবেন।[৩১৬] এইসময় আবার দামেশকের কিছু আমির গিয়েছিলেন ওয়ালিদ ইবনে উতবার হাতে বাইয়াত হতে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট না করে দিয়েছিলেন এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি ইনতেকাল করেন।[৩১৭] এভাবে হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেকড় আরো শক্ত হয়ে গেলো। তিনি প্রথমে গোপনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য সর্বসাধারণের আগ্রহ ও মতামত জানলেন এরপর প্রকাশ্যে যখন এ কথা বললেন তখন সবাই তার ডাকে সাড়া দিলো এবং বাইয়াত হয়ে গেলো।[৩১৮] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর তৎপরতার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি খুব খুশি হলেন এবং অনেক মূল্যায়ন করলেন। সেইসাথে তাকে শামের আমির নিযুক্ত করে দিলেন।[৩১৯] শামের আরেক বড় শহর হিমসের আমির হজরত নুমান ইবনে বাশির রা. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর তারও ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত মেনে নেওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত সম্পূর্ণ সঠিক ও শরিয়তসম্মত ছিল। অপরদিকে কিন্নাসরিন শহরে হজরত যুফার ইবনুল হারেস এবং ফিলিস্তিনে নাতেল ইবনে কায়েসের মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন আমিরগণও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হলেন এবং তাকে সহযোগিতা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। জর্ডানের গভর্নর হাসসান ইবনে মালেক

---

[৩১৬] আনসাবুল আশরাফ : ৫/১৩২, ৫/৩৫০-৩৫২, ৬/২৬৬

[৩১৭] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/২৬৭

[৩১৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : আততাবকাতুল খামিসা : ২/২০১, ২০২

[৩১৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : আততাবকাতুল খামিসা : ২/২০১, ২০২ আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৫৮

ব্যতীত শামের সকল আমিরই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হন। এভাবেই তার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রইলো না। শুধু বনু উমাইয়ার কিছু সাবেক নেতা এবং তাদের কিছু উগ্রবাদী ও চরমপন্থি আত্মীয় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হলো না, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, মারওয়ান ইবনুল হাকাম, আমর ইবনে সাঈদ আল আশদাক এবং হাসান ইবনে মালেক।[৩২০]

---

[৩২০] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৩১ তারিখে খলিফা : ২৫৯; হাসসান ইবনে মালেক ছিলেন ইয়াজিদের মামা মালেক ইবনে জাহদালের সন্তান। তিনি বনু কালবের আমির ছিলেন। মুখতাসার তারিখে দিমাশক : ৬/৩০৯; পূর্ণ বনি উমাইয়াকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর ব্যাপারে তার অনেক অবদান ছিল। যার বিস্তারিত বিবরণটা সত্যিই শিক্ষণীয় বটে। বনু উমাইয়াকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর থেকে দূরে সরানোর জন্য সে অনেক সভা সমাবেশও করেছিল। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ হয়েছিল জিরুন নামক এলাকায়। যেই সমাবেশটা পরবর্তীতে 'ইয়াউমে জিরুন' হিসেবেই প্রসিদ্ধি পেয়েছে। বালাযুরি এর পূর্ণ বিবরণ লিখেছেন। আনসাবুল আশরাফ : ৬/৩৬৪-৩৬৭

উম্মতের ঐক্য ভেঙে দেওয়ার রাজনীতি

উম্মতের মাঝে তখন শান্তি ও নিরাপত্তার সুদিন প্রায় চলেই এসেছিল; কিন্তু হঠাৎ মারওয়ান ইবনুল হাকামের একটি মারাত্মক ভুলের কারণে উম্মতের মাঝে আবার বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হলো। আসলে মারওয়ানকে এ পথে চলতে প্ররোচনা দিচ্ছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। বসরা ও কুফা তাদের হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও সে তখনকার কুসুমাস্তীর্ণ পথ কন্টকাকীর্ণ করার জন্য একেবারে আদাজল খেয়ে মাঠে নামলো। মারওয়ান ইবনুল হাকাম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেকড় মজবুত হয়ে উঠেছে দেখে একরকম মেনেই নিয়েছিল। কিন্তু সে যখন দেখল হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েসের প্রভাব, ক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা দিন-দিন বেড়েই চলছে তখন বনু উমাইয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং সেই উদ্দেশ্যে হজরত আমর ইবনে সাঈদকে সাথে নিয়ে শাম থেকে রওনা দিলেন। এরপর তিনি যখন আযরুত নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন ইবনে জিয়াদ তার সাথে সাক্ষাৎ করে। সে আসছিল ইরাক থেকে। কারণ তার প্রতি স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ফলে কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিল। এখন জীবন নিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে দামেশক যাচ্ছিল। তারপর মারওয়ানের সাথে কথা বলে যখন জানতে পারল, সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হতে যাচ্ছে তখন অনেক বেশি পেরেশান হয়ে গেলো। কারণ, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভারসাম্যপূর্ণ শাসন-ক্ষমতায় তার কোনো গুরুত্ব ছিল না। এজন্য সে ভেবে রেখেছিল শামের জনগণকে যেকোনোভাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত থেকে বের করে নিজে সেখানকার ক্ষমতা দখল করবে। তাই সে মারওয়ানের এই সিদ্ধান্তে অনেক অসন্তোষ প্রকাশ করল এবং

তাকে লজ্জা দিয়ে বলল, "আপনি কুরাইশের একজন গণ্যমান্য সরদার। বনু আবদে মানাফের বরিত ও মানিত মানুষ। আপনি কেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের হাতে বাইয়াত হতে যাবেন? তার চেয়ে আপনিই খেলাফতের বেশি হকদার।" এই কথা শুনে মারওয়ান ইবনুল হাকাম খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "আচ্ছা, তাহলে তুমিই বলো, এখন আমার কী করা উচিত? "

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তখন বলল, "শুনুন! আপনি এখন শামে ফিরে চলুন এবং সেখানে গিয়ে মানুষকে আপনার বাইয়াতের দিকে আহ্বান করুন। আর কুরাইশ এবং তাদের সাথে সম্পৃক্তদের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আমিই তাদেরকে সামাল দেবো।" অবশ্য এখানে আরেকটা সমস্যা ছিল। তা হলো, বনু উমাইয়ার কিছু সদস্য ইয়াজিদের দ্বিতীয় ছেলে খালেদ ইবনে ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে দেখতে চাচ্ছিল। তাই যখন এই সমস্যার কথা আলোচনায় এলো তখন আমর ইবনে সাঈদ এর সমাধানকল্পে বলেন, "আপনি ইয়াজিদের স্ত্রী উম্মে খালেদ (ফাখতা ইবনে আবি হাশেম ইবনে উতবা) কে বিয়ে করে নিন। এতে খালেদ আপনার অনুগত হয়ে যাবে।" এসব পরামর্শ মারওয়ানের বেশ পছন্দ হলো। এরপর আমর ইবনে সাঈদ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে সাথে নিয়ে শামে ফিরে গেলেন। তিনি আলেপ্পো থেকে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত পালমিরা শহরে পৌঁছে অপেক্ষা করলেন, যাতে পরিস্থিতি বুঝে সামনে বাড়া যায়। অপরদিকে নাটেরগুরু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ আগেই চলে গেলো দামেশকে, যাতে উপরে উপরে হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তলে তলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেকড় উপড়ে ফেলা যায়।[৩২১]

স্বজনপ্রীতির আগুন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে কোনোভাবেই ইজতিহাদি বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ এক্ষেত্রে তাদের দীনি উদ্দেশ্য বা শরয়ি ব্যাখ্যার কোনো

---

[৩২১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/২০২ তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/১৩৪

ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। তাদের এমন স্বজনপ্রীতিমূলক আচরণ দেখেও কেউ কেউ পক্ষপাতিত্ব করেছে। অথচ মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর জর্ডান ছাড়া শামের সকল বাসিন্দাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত মেনে নিয়ে বাইয়াত হয়েছে। জর্ডানের লোকেরা এটা মেনে নিতে পারল না। বরং নিজেরা এই বলে বাঁচতে চাচ্ছিল যে, "হুকুমত তো পরিচালিত হয়ে আসছিল শামবাসীদের হাতে। এখন এটা হিজাজে স্থানান্তর হলো কেন? আমরা কখনোই তা গ্রহণ করব না।"[৩২২] এই নেতারাই লোকজনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করল এবং গোত্রপ্রীতি প্রকাশের মাধ্যমে নতুন সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করল। ইয়াজিদের মামাতো ভাই হাসসান ইবনে মালেক জর্ডানের বাসিন্দাদের মনে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করল, "হে জর্ডানবাসী, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং হাররায় নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের মত কী?

"আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর মুনাফিক এবং হাররায় নিহতরা জাহান্নামি।" সকলেই উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিলো।

আচ্ছা! ইয়াজিদ এবং হাররায় শামের সৈন্যদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে তোমাদের মত কী?

"ইয়াজিদ জান্নাতি আর হাররায় যেসব শামি সৈন্য নিহত হয়েছে, তারাও জান্নাতি।" জনগণের উত্তর।

"যদি এমনই হয় তাহলে ইয়াজিদ নিশ্চয় হকের উপর ছিল। সুতরাং আজও যারা তার দেখানো পথেই চলছে, তারাও হকের উপর আছে। আর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর যদি কিছুদিন আগেও বাতিল থেকে থাকে তাহলে আজও সে বাতিল বলেই গণ্য হবে। বিষয়টা কি এমনই নয়?"

লোকেরা হাসসানের এই কথা শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "আপনি সত্য বলেছেন।" এরপর তারা সকলেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য হাসসানের হাতে বাইয়াত হয়ে গেলো।[৩২৩]

---

[৩২২] তারিখে দিমাশক : ১৮/২৪৮

[৩২৩] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬৪

আইমান আল-আসাদির বিক্ষোভিত কবিতা

এইখানটায় সেসব লোকই সবচেয়ে উত্তম ছিল, যারা এসব ফেতনা থেকে দূরে অবস্থান করছিল। মারওয়ান আইমান ইবনে খুরাইম আল-আসাদিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আহ্বান করলে তিনি ওজর পেশ করেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমার বাবা এবং চাচা বদরযুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা আমার থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আমি যেন কোনো অন্যায় রক্তে নিজেকে রঞ্জিত না করি। এখন আপনি যদি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার জিম্মাদারি নিতে পারেন তাহলে আমি আপনার সাথে যুদ্ধে শরিক হবো।"

এই কথা শুনে মারওয়ান বলল, "নাহ, থাক। তোমার আর যুদ্ধে যেতে হবে না।" এরপরেই আইমান এই বিক্ষোভিত কবিতাগুলো আবৃতি করেন।

"আমি কুরাইশদের দ্বিতীয়দলের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো নামাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। কারণ সে তো একদিন রাজত্ব পাবে; কিন্তু আমার অর্জন হবে গুনাহ। আমি এমন বোকামি ও ক্রোধ থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি কোনো মুসলিমকে কারণ ছাড়া হত্যা করব কেন? এই কাজ তো সারাজীবনেও আমার কোনো উপকারে আসবে না।"[৩২৪]

হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রা. এর সাথে মারওয়ানের বিরোধ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বনু উমাইয়ার লড়াই বাধানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। একদিকে সে মারওয়ানকে খেলাফতের দাবি করতে উদ্বুদ্ধ করল অপরদিকে সে যাহ্হাক ইবনে কায়েসের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একপর্যায়ে হজরত যাহ্হাককেও খেলাফতের দাবি তুলতে প্ররোচিত করল। আর যাহ্হাকও ইবনে জিয়াদের পাতা ফাঁদে প্রায় পা দিতে বসেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য বন্ধুর পরামর্শে তিনি এ কাজের ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

---

[৩২৪] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬৭, ২৬৮

এরপর হজরত যাহ্হাক যখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে ও সমর্থনে দলে দলে বাইয়াত নেওয়া শুরু করলেন তখন তা ইবনে জিয়াদের কাছে সহ্য হলো না। তাই সে প্রথম চালে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় চাল শুরু করল। হজরত যাহ্হাককে মারওয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্ররোচিত করল। সে ভালোমানুষির পোশাক পরে হজরত যাহ্হাককে বুঝালো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু উমাইয়ার শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ করে না দেবেন ততক্ষণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত শতভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এটাই ভালো হয় যে, আপনি তাদের নেতা মারওয়ানের সাথে দামেশকের বাইরে গিয়ে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করবেন। এরপর এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলে, "যারা আপনার মতো মহান ব্রত নিয়ে আছেন, তারা কখনো দুর্গ ও প্রাসাদে বসে থাকে না। বরং বাইরে বের হয়ে অশ্বারোহীদের জমা করে। সুতরাং আপনিও দামেশক থেকে সৈন্য প্রস্তুত করে রওনা হয়ে যান।"

ইবনে জিয়াদের এই কথা হজরত যাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আত্মমর্যাদায় খুব আঘাত করল। তাই তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে 'মারজে রাহেত' নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। ইবনে জিয়াদ নিজেও তখন ছিল দামেশকে। অথচ মারওয়ান এবং বনু উমাইয়ার আমিরগণ তখনো ছিলেন 'পালমিরা' নামক স্থানে। এদিকে নাটেরগুরু ইবনে জিয়াদ তৃতীয় চালটাও চেলে দিলো। সে মারওয়ানকে লিখে পাঠাল, "তুমি লোকজনকে তোমার খেলাফত গ্রহণের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকো এবং যাহ্হাকের দিকে অগ্রসর হও। সে তোমাদের সামনে খোলা ময়দানে এসে গেছে।"

মারওয়ান কিছুদিন পূর্বেই ইয়াজিদের স্ত্রী উম্মে খালেদকে বিবাহ করে নিয়েছিল। ফলে এই গোত্রভিত্তিক আত্মীয়তার কারণে অনেক বড় একটা দল তার অধীনে এসে গিয়েছিল। তাই এখন শুধু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ইশারার অপেক্ষা। এরপর যখন ইবনে জিয়াদের চিঠি মারওয়ানের কাছে পৌঁছল তখন সে শামের অনেক আমির ও বনু উমাইয়ার অনেক বড় একটা অংশ নিয়ে 'জাবিয়া' নামক স্থানে এসে একত্রিত হলো।[৩২৫]

---

[৩২৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/২০২-২০৪ তারিখুল ইসলাম : ৫/১৩৫, ১৩৬ তারিখে খলিফা : ২৬০

জাবিয়ায় পরামর্শসভা

জাবিয়ার পরামর্শসভায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুৎসা ও নিন্দা এবং মারওয়ানের প্রশংসা ও গুণগান খুব বর্ণনা করা হলো। সেই পরামর্শসভায় তাদের মতও খণ্ডন করা হলো, যারা ইয়াজিদের ছেলে খালেদকে খলিফা বানাতে চাচ্ছিল। এখানে বুদ্ধিমান বেশ ক'জন এই পরামর্শও উত্থাপন করল যে, যদি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত সবাই মেনে না নিতো তাহলে মুসলিম উম্মত নিশ্চয় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর একমত হয়ে যেতো। একথা শুনে রাওহ ইবনে যিম্বাহ সরাসরি দাঁড়িয়ে বলল, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তার নিজের জায়গায় ঠিক আছে। কিন্তু এখন তিনি অপারগ ও অক্ষম মানুষ। আর অক্ষম ব্যক্তির দ্বারা উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলতে গেলে, তিনি যদিও হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান; কিন্তু এখন সে মুনাফিক। সে দুজন খলিফা, ইয়াজিদ ও তার ছেলে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। রক্তপাত ঘটিয়েছে। মুসলমানদের ঐক্য কাচের মতো টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের নেতৃত্ব এমন মুনাফিকের হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আর যদি মারওয়ান সম্পর্কে বলতে হয়, তাহলে ইসলামের এমন কোনো বিষয় নেই, যাতে মারওয়ানের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অবদান নেই। তিনি হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর হামলার দিন শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছেন। তিনি জঙ্গে জামালে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ করেছেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি তালহাকে হত্যা করে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছেন। সুতরাং এখন আমাদের করণীয় কী? আমরা বিশিষ্ট লোকদের ছেড়ে দিয়ে ছোটদের হাতে বাইয়াত হয়ে যাবো?[৩২৬] এরপর দাঁড়ালো হাসসান ইবনে মালেক। সে বলল, "আমিও রাওহ ইবনে যিম্বার কথার সাথে একমত। এটা আমি

---

[৩২৬] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬৭

কখনোই মেনে নিতে পারবো না যে, বনু উমাইয়া ইবনে যুবাইরের কাছে গিয়ে নিজেদের নিশ্চিত পতন ডেকে আনবে। তা ছাড়া মারওয়ান কুরাইশের একজন বরিত নেতা এবং মজলুম খলিফা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো ভাই। সর্বপ্রথম তিনিই হজরত উসমান-হত্যার কেসাস দাবি করেছিলেন। সুতরাং তিনিই সর্বদিক থেকে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যোগ্য উত্তরসূরি। আর ইবনে যুবাইরের সাথে তো তার কোনো তুলনাই চলে না। কারণ ইবনে যুবাইর হলো বদদীন ও মুনাফিক। সে খেলাফতের আসনকে জোর করে কেড়ে নিয়েছে, যা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নাফরমানির শামিল।[৩২৭]

এরপর উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে মারওয়ান খেলাফতের দাবি করে বসল। এটা ৬৪ হিজরির যিলকদ মাসের ঘটনা। অথচ তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত প্রতিষ্ঠার পর চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে।[৩২৮] মারওয়ান খেলাফতের দাবি করার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই বাইয়াত গ্রহণ করল এবং বলল, "সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, যিনি আমাদের থেকে খেলাফতের দায়িত্ব বাইরে যেতে দেননি।"[৩২৯]

মারওয়ানের এই অবৈধ খেলাফতের দাবি উত্থাপনে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের সকল চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। কারণ তিনি চেয়েছিলেন নেতৃত্বের মাসআলা উম্মতের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা এবং শুরার ভিত্তিতে হবে। কিন্তু হলো না।

---

[৩২৭] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬০ কেউ কেউ এখান থেকে মারওয়ানকে সাহাবি প্রমাণ করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করে। তারা যেন বিষয়টা একটু চিন্তা করে দেখে। আচ্ছা! মারওয়ানের প্রশংসার এই যে লম্বা এক পত্র, এখানে কি তার সাহাবি হওয়ার কোনো কথা বা প্রমাণ পাওয়া যায়? অথচ সে যদি প্রকৃতপক্ষেই সাহাবি হতো তাহলে কোনো না কোনোভাবে এখানে সে-কথার ইঙ্গিত চলে আসতো। কিন্তু সেসবের বদলে এই প্রশংসায় বলা হয়েছে যে, সে তালহা রা. কে হত্যা করেছে এবং হজরত আলি রা.-এর সাথে লড়াই করেছে। সুতরাং এসব থেকে এটা খুব সহজেই অনুমান করা চলে যে. মারওয়ান সাহাবি না। অবশ্য এ আলোচনা দ্বারা আমরা খুব সহজেই ধরতে পারি যে, ইয়াজিদের পৃষ্ঠপোষক শামি সরদারদের মাঝে ততদিনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

[৩২৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/২০২-২০৪ তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/১৩৫, ১৩৬ তারিখে খলিফা : ২৬০

[৩২৯] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬০

বরং মারওয়ানের এই ভুল সিদ্ধান্তে উম্মতের মধ্যে নতুন করে তৈরি হলো যুদ্ধের পরিবেশ, যা পরবর্তী দশ মাসেও সমাধান করা যায়নি। এই ফাসাদের দায়ভার বর্তাবে প্রধানত উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের উপর। হাসসান ইবনে মালেক ও মারওয়ানের উপর। যারা বনু উমাইয়া এবং শামবাসীদের মনে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দ্বিতীয়বার উম্মতের ঐক্য ধূলিসাৎ করে দিলো। উম্মতের মাঝে বিভক্তির আগুন ছড়িয়ে দিলো। সেই সাথে মুসলমানগণ এক খলিফার উপর একমত হয়েও বিগড়ে গেলো। বনু উমাইয়ারা খেলাফতলাভের জন্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

মারজে রাহাতের যুদ্ধ

সর্বোপরি মারওয়ান ৫ হাজার সৈন্য নিয়ে মারজে রাহাতে পৌঁছল, যেখানে পূর্ব থেকেই হজরত যাহ্হাক রা. সৈন্যদের নিয়ে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিলেন। মারওয়ান এখানে অস্ত্র এবং সৈন্য একত্র করতে লাগল।[৩৩০] এদিকে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করে দামেশক থেকে বের হয়ে সোজা মারজে রাহাতে মারওয়ানের কাছে উপস্থিত হলো। অপরদিকে দামেশকে বনু উমাইয়াদের তত্ত্বাবধায়ক ইয়াজিদ ইবনে আবু নিমস বিদ্রোহ করে বসল এবং হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধিকে শহর থেকে বের করে দিলো।

৬৪ হিজরির জিলহজের মাঝামাঝিতে উভয় দল মুখোমুখি হলো। হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তখন সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। আর মারওয়ানের সাথে ছিল ১৩ হাজার। স্বভাবতই উভয় দল রক্তারক্তি পছন্দ করছিল না। তাই ২০ দিন পার হয়ে গেলেও যুদ্ধের কোনো ফল সামনে আসছিল না। তখন সুযোগ বুঝে কোপটা দিলো উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। খেলার শেষ ঘুঁটিটাও চেলে দিলো সে। মারওয়ানকে বলল, "আসলে এভাবে আমরা কিছুই করতে পারবো না। বরং আমাদেরকে ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে। আপনি যাহ্হাককে সন্ধির প্রস্তাব দেবেন এরপর সে যখন এসব বিষয়ে উদাসীন ও অসতর্ক হয়ে যাবে তখন আমরা আক্রমণটা করব। তাহলে বিজয় নিশ্চিত আমাদের হাতেই আসবে।" ইবনে জিয়াদের পরামর্শ অনুযায়ী মারওয়ান হজরত যাহ্হাককে সন্ধির প্রস্তাব দিলো। তিনিও মেনে নিলেন। কিন্তু হঠাৎ একরাতে তারা যখন সম্পূর্ণ উদাসীন তখন

---

[৩৩০] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ১৩/৯২

মারওয়ান অশ্বারোহীদের নিয়ে আক্রমণ করে বসল। এতে হজরত যাহ্হাকের পূর্ণ সৈন্যবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং হজরত যাহ্হাক-সহ প্রচুর সৈন্য শহিদ হয়ে গেলো। মারওয়ান তখন উচ্চ আওয়াজে এই ঘোষণা করল যে, "যারা পলায়ন করেছে তাদেরকে যেন কেউ পিছু ধাওয়া না করে।"[৩৩১] এরপর যখন হজরত যাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিচ্ছিন্ন মাথা মারওয়ানের সামনে আনা হলো তখন সে বলল, "জীবন যখন শেষ, হাড্ডি যখন চূর্ণবিচূর্ণ সেই অবস্থাতে এসেও আমাকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে।"[৩৩২] হাফেজ জাহাবি রহ. বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শেষলড়াইটা ৬৫ হিজরির শুরুর দিকে হয়েছিল।[৩৩৩]

এই যুদ্ধে হজরত যাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোত্র বনু কায়েসের অনেক বড় একটা অংশ শহিদ হয়ে গিয়েছিলেন। শামে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত রক্ষায় এদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে যেখানে-যেখানে এই সংবাদ পৌঁছল, সেখানেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সমর্থকরা পিছু হটে গেলো। একসময় শামে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত সমর্থন করার মতো তেমন কেউ থাকল না। হিমসের হাকিম হজরত নুমান ইবনে বাশির রা. এ থেকে মুক্তি পেলেন না। তিনি হজরত যাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরাজয়ের সংবাদ শুনে পরিবার-পরিজন নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু বনু উমাইয়ার লোকেরা তাকে খুঁজে শহিদ করে দিলো। এভাবেই পূর্ণ শাম বিদ্রোহীদের দখলে চলে এলো।[৩৩৪]

হজরত নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত মাথা তার স্ত্রী নায়েলার ঝুলিতে রেখে দেওয়া হলো। এ দেখে তার মেয়ে উম্মে আবান বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে বলল, "আমিই এর বেশি হকদার।" একথা শুনে সৈন্যরা হজরত নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা

---

[৩৩১] তারিখুল ইসলাম : ৫/১৩৫, ১৩৬ তারিখে খলিফা : ২৬০
[৩৩২] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬৯
[৩৩৩] তারিখুল ইসলাম : ৫/৪১
[৩৩৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৪১ আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬৯০-২৭৫; ২৮৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪১২; তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/২০৪-২০৭; ৬/৫৩

নায়েলার ঝুলি থেকে নিয়ে উম্মে আবানের কোলে নিক্ষেপ করল।[৩৩৫] মারজে রাহাতে শামের অধিবাসীদের এই বিদ্রোহের মাধ্যমে নবীজির এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিষ্ঠা পেলো। নবীজি ইরশাদ করেছেন, "যখন আমার উম্মতের মধ্যে একবার তরবারি রেখে দেওয়া হবে তখন কেয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।"[৩৩৬] যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণী হজরত উসমান রা. কে শহিদ করার মাধ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আরো বেশি এর প্রকাশ ঘটেছিল। কারণ আমরা দেখতে পাই, এরপর থেকে অধিকাংশ শাসকই ইসলামি শুরার নেজামকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছে। আর ক্ষমতা অর্জনের জন্য তরবারির উপর বেশি ভরসা করেছে। দেখা যায় এই তরবারি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপরই পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং এরপর থেকে ক্ষমতার জন্য যে লড়াই ও রক্তপাত শুরু হয়েছিল, তা এখনো অব্যাহতভাবে চলছে।

পরাজয়ের কারণ

মারজে রাহাতে পরাজয়ের কিছু কারণ ছিল।

১. তারা ধোঁকার শিকার হয়েছিল। তারা একজন শত্রু ও দেশদ্রোহীকে নিজেদের মতো মনে করেছিল। ভেবেছিল সে ধোঁকা দেবে না; অথচ তাদের জন্য শতভাগ সতর্ক থাকাটা খুব বেশি প্রয়োজন ছিল।

২. হজরত যাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যগণ ছিলেন সাদাসিধে এবং মুখলিস। আর মারওয়ানের সৈন্যরা যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি ছিল খুব ধূর্ত, চালাক ও ধোঁকাবাজ। ফলে প্রায় সময় যা দেখা যায় যে, ধোঁকাবাজরাই যুদ্ধে ধোঁকা বা কৌশলের মাধ্যমে অনেক বেশি সৈন্যের মাঝ থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনে। এখানে তাই হলো।

---

[৩৩৫] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৮৩; হজরত নুমান ইবনে বাশির রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সমবয়সি ছিলেন। হিজরতের পরে মুহাজিরগণের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং আনসারগণের মধ্যে হজরত নুমান ইবনে বাশির রা. প্রথম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৮৩; তার পিতা বাশির ইবনে সা'দ রা. ছিলেন আনসার সাহাবিগণের সর্দার। সাকীফায়ে বনী সায়েদায় হজরত আবু বকর রা.-এর হাতে বাইয়াতগ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনিই প্রথম আনসারি ছিলেন। তিনি আইনুত তামার যুদ্ধে হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছিলেন। আনসাবুল আশরাফ : ১/২৪৪

[৩৩৬] সুনানুত তিরমিজি : ২২০২

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থকগণ শামকে বিশেষভাবে রক্ষা ও সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে সেখানে খুব সহজেই মারওয়ানের সমর্থকরা ঢুকে পড়ল এবং বাইতুল মাল বিদ্রোহীদের কাজে ব্যবহার হলো।

৪. হিজার থেকে হজরত যাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কোনো সহযোগিতা আসেনি। সময়মতো যদি রিজার্ভ বাহিনী পৌঁছে যেতো তাহলে মারওয়ানের পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

মারজে রাহাতের যুদ্ধ ও পর্যালোচনা

মারজে রাহাতের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য আরেকটি বেদনার কালো অধ্যায় ছিল। কারণ সেখানে হজরত যাহ্হাক এবং নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মহান সাহাবি এবং অসংখ্য তাবেয়িকে উম্মত হারিয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনি উম্মতের গুটিকয়েক সদস্য যেকোনো উপায়েই হোক, ক্ষমতা অর্জনই তাদের মুখ্য ছিল এটাও সত্য। এখন উম্মত তাদেরকে শাসক হিসেবে চাচ্ছে কি না, এটা দেখার কোনো প্রয়োজন তাদের ছিল না। এদের প্রথম সারিতে ছিল বনু উমাইয়ার সেইসব অযোগ্য উত্তরাধিকারী আমির, যাদের মাথায় গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া কিছুই ছিল না। আর দ্বিতীয় সারিতে ছিল শামের সেইসব জেনারেল, যারা নেতৃত্ব ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে আগ্রহী ছিল না। তবে এদের সাথে কিছু সাহাবিও ছিলেন। কিন্তু তাদের ভেতর আসলে কোনো খারাপ বা মন্দ ইচ্ছা ছিল না এবং কোনো ভুল সিদ্ধান্তও নেননি। আমরা তাদের প্রতি এই ধারণা পোষণ করি যে, তারা হয়তো অবস্থার ভুল অভিজ্ঞতা কিংবা কোনো ইলমি ভুল সিদ্ধান্ত অথবা ফিকহি কোনো ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছিলেন। অথচ তারা চাইলেই সম্পূর্ণ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারতেন। কিন্তু এখন তারা শরিয়তসম্মত একজন খলিফার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিদ্রোহীদের কাতারে শামিল হলেন। তবে হ্যাঁ, শামের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আমরা জাহেলিয়াতের সাম্প্রদায়িকতার মতো আখ্যা দিই না; যেমনটা অনেক ঐতিহাসিক করেছেন। কারণ ইসলাম তো জাহেলিয়াতের সাম্প্রদায়িকতা ও রীতিনীতি সবকিছুই মিটিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া বনু উমাইয়ার সাথে বনু হাশেম এবং অনেক সাহাবির বংশধরদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক

ছিল। আমরা বনু উমাইয়ার ভালো এবং যোগ্য খলিফাদেরকে কোনো কারণ ব্যতীত অভিযুক্ত করা ভুল মনে করি। কিন্তু এতটুকু অবশ্যই বলতে হবে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে তারা অনেক ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। বিদ্রোহটা যদি কোনো বিবেচনাযোগ্য কোনো ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তো তারা ফাসেক বা ফাজের হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু সর্বাবস্থায় রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ তো ভুল ফলই নিয়ে আসবে। সুতরাং এরপর যতকিছু হয়েছে এগুলোর দায়-ভার কার উপর বর্তাবে? বিদ্রোহীদের উপর নাকি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং তার সমর্থকদের উপর?

বনু উমাইয়ার আমিরগণ কী কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন?

কেউ কেউ বলেছেন, বনু উমাইয়ার নেতারা অনেক মজবুত দলিল-প্রমাণ নিয়েই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বিরোধিতা করেছিলেন। যেমন :

১. তারা ছিলেন উম্মতের যেকোনো বিষয় ও অবস্থায় সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব। সেই সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা। সুতরাং তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া কারো খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্যই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২. মারওয়ানকে মূলত খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেছিল দামেশক এবং শামের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ। ফলে খলিফা হওয়ার হক তারই বেশি ছিল এবং তার কথামতো চলা ও তাকে অনুসরণ করাই ছিল সময়ের দাবি।

৩. আর ইসলামিবিশ্বে যেহেতু উম্মতের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা ছিল জরুরি; অপর দিকে অনৈক্য সৃষ্টি করা ছিল অবৈধ, এজন্য ইসলামি রাষ্ট্রের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য দুজন আমির না হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। তাই এটা আবশ্যক ছিল যে, অন্যায়ভাবে খেলাফতের দাবিদারকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়া।[৩৩৭] এইসব কারণেই মূলত

[৩৩৭] শামবাসীর এই ওকালতির পথ ও পন্থাটা মূলত বর্ণনা করেছে মারওয়ানের পৃষ্ঠপোষকগণ।

তারা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থকদের রক্ত হালাল মনে করেছিল এবং একারণেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই উভয় দলের মাঝে দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর খেলাফত শরিয়তসম্মত ছিল

আসলে শামের আমিরদের এইসব দলিল খুবই ভয়াবহ রকম উদ্ভট ও ভিত্তিহীন ছিল। কারণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ৬৪ হিজরির রজব মাসে সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা হয়ে গিয়েছিলেন। তার বাইয়াতটা হজরত আবু বকর, হজরত উমর, হজরত উসমান, হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতোই ছিল। কাউকে বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। বরং এটা সংঘটিত হয়েছিল মুসলমানদের সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতেই। মুসলমানদের তৎকালীন পাঁচটি ইসলামি বড় রাষ্ট্র—হিজাজ, বসরা, কুফা, দামেশক ও মিসরের অধিকাংশ আমির কোনো লোভ, ভয় এবং কারো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই শুধু উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন একজনকে আমির হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, যার বিশ্বস্ততা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও সাহসিকতা, বীরত্ব ও পরহেজগারির ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এভাবে উম্মতে মুসলিমা যখন তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে তখন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবং হাসসান ইবনে মালেকের বোঝানোর কারণে শামের কিছু আমির ও বনু উমাইয়ার কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির মাঝে হঠাৎ খেয়াল এলো যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তার আমির হওয়াও সঠিক নয়; তাই এখন সংশোধন প্রয়োজন। আর নিজেদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। এমন মূর্খসুলভ সিদ্ধান্ত এবং পাগলামি কীভাবে মেনে নেওয়া যায়!

ওদের চোখে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর তৎপরতা

বনু উমাইয়ার এই বিচ্ছিন্ন ও বিদ্রোহী দলের কাছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত বাতিল করে দেওয়ার একমাত্র পথ ছিল নেতৃত্বশীল সাহাবায়ে কেরামের শেষ স্মারকটি কলঙ্কিত করা এবং তাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মূলত এর কারণ ছিল, ইয়াজিদের সময়কালের রাজনৈতিক দুর্বলতাগুলো বনু

উমাইয়া এবং শামের অধিকাংশ আমিরের মধ্যেই একপ্রকার অহমিকা, ঔদ্ধত্য ও ধোঁকার জাল বিছিয়ে রেখেছিল। এরা মূলত নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজেদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মনে করতো। সেইসাথে তারা নিজেদেরকে মনে করতো দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র ঠিকাদার। ফলে অনেক বড় বড় সাহাবিকেও তারা সামান্যও মূল্য দিতো না। বরং অন্যদের মতোই ভাবতো। যেমন : হজরত আবু শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এক মহান সাহাবির সামনে একজন সাধারণ গভর্নর আমর ইবনে সাঈদ আল আশদাকের নিজের জ্ঞানের প্রশংসা ও অহংকার প্রকাশের প্রমাণ তো বুখারিতেই বিদ্যমান।[৩৩৮] আর সেখানে শাসক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ও তার তৎপরতা তো তাদের চোখে রীতিমতো বিষকাঁটা ছিল।

চিন্তক ও বিবেকবানদের স্থানে যোদ্ধা নিয়োগ, একটি ভুল সিদ্ধান্ত

সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং পরবর্তীদের রাজনীতির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য এই ছিল যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেক বড় একটি জামাত ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। একদিকে তারা যেমন ছিলেন দাঈ, শিক্ষক, মুজাহিদ, সিপাহসালার, কাজি, গভর্নর, শাসক অপর দিকে ছিলেন পূর্ণমাত্রায় মুত্তাকি, পরহেজগার ও ইবাদতগুজার। তারা আসলে এসব গুণ অর্জন করেছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সংস্পর্শে থেকে এবং তার নিরুপম তরবিয়তের মাধ্যমে। তাদের হৃদয় এবং মস্তিষ্কে আল্লাহ তায়ালার ভয়, মহব্বত, আখেরাতের ভাবনা ছিল টইটুম্বুর, যা ছিল প্রতিনিয়ত আত্মজিজ্ঞাসার ফল। এজন্যই তারা

---

[৩৩৮] সহিহ বুখারি : ৪২৯৫ কিতাবুল মাগাজি।

এমনই আরেকজন ছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফল রা.-এর ব্যাপারে অত্যন্ত বেআদবির সাথে বলেছে: "তোমরা তো পোশাকি সাহাবি।" আলআহাদ ওয়াল মাসানি: ১০৯৩ অথচ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রা. বাইয়াতে রিদওয়ানে শামিল হওয়া একজন সাহাবি ছিলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের জন্ম ৩২ হিজরিতে হয়েছিল। সুতরাং এখান থেকে বুঝা যায় যে, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যখন এসব কথা বলেছে তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রা.-এর আশির কাছাকাছি। আর ইবনে জিয়াদ তখন তরুণ বয়সি টগবগে যুবক। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৪৮৩; একজন তরুণ যেকোনো একজন বৃদ্ধকে এভাবে কথা বলাই তো বেয়াদবি ও ভদ্রতা বিবর্জিত আর সেখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রা.-এর মতো সাহাবি! অবশ্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রা. ইবনে যিয়াদের কথার উত্তর খুব দারুন করে দিয়েছিলেন।

সর্বক্ষেত্রের দায়িত্বকেই সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসে ধীরে ধীরে এসব কমে যেতে থাকল। জ্ঞানী, যোদ্ধা, দাঈ, শিক্ষক সকলেই পৃথক হয়ে গেলো। এমন অবস্থায় জরুরি ছিল এমন কাউকে শাসকের দায়িত্ব দেওয়া, যার ভেতর ভারসাম্যবোধ আছে; জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আচরণবিধি ভালো জানা আছে, যিনি শাসনের চেয়ে দীনদারি এবং জনসাধারণের কাছে বেশি প্রিয় ও গ্রহণীয় হবে। এমন লোক তখন প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমরা ইয়াজিদের শাসনের শুরুতেই দেখতে পাই যে, সে গ্রহণীয় ও প্রিয় ব্যক্তিদের এক এক করে সরিয়ে তাদেরকে একপ্রকার বিকল করে রাখল এবং ইবনে জিয়াদ, উমর ইবনে সাঈদ ও মুসলিম ইবনে উকবার মতো কঠোরপ্রকৃতির লোকদেরকে উপর চাপিয়ে দিল। পরবর্তীতে বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসের অধিকাংশ শাসকই রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে এই নীতিকেই অবলম্বন করেছিল। তবে ইতিহাস সাক্ষী এই নিয়মের ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈরাজ্য, ব্যর্থতা ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এজন্যই আল্লামা ইবনে খালদুন তার ঐতিহাসিক মুকাদ্দিমায় একটি পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন এই বিষয়ে। সেখানে তিনি বুঝিয়েছেন, যদিও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে কিছু কঠোরপ্রকৃতির লোকের প্রয়োজন আছে; কিন্তু রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইলম ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেদের দায়িত্ব দেওয়া ব্যতীত কোনো রাস্তা নেই।[৩৩৯]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বনু উমাইয়ার শাসন প্রতিষ্ঠা হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেই হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই ইয়াজিদের উচিত ছিল তার যুগে আলেমদের প্রাধান্য দেওয়া। কিন্তু সে করেছিল এর সম্পূর্ণ উলটো কাজ। আলেমদের চেয়ে অনেক বেশি ভরসা ছিল তার তরবারির উপর, কঠোরপ্রকৃতির গভর্নরদের উপর, যারা বন্ধু ও শত্রুর মাঝে পার্থক্য করতে জানতো না। এমনকি তাদের হাত থেকে সাহাবায়ে কেরামও মুক্তি পাননি। অনভিজ্ঞ তরবারির শক্তি সেই কঠোর শাসকদের মধ্যে কতটা প্রকট ছিল, সেটা উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার কথাবার্তা এবং হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সেই মর্মান্তিক

[৩৩৯] ইবনে খালদুন : ১/৩১৮; মুকাদ্দামা, আলবাবুস সালেস, আলফাসলুল খামেস ওয়াস সালাসুন।

আচরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। মুসলিম ইবনে উকবার মদিনায় আক্রমণ এবং সাহাবায়ে কেরামকে ধরপাকড় ও হত্যার ঘটনা থেকেও কিছুটা আঁচ করা যায়। সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় এতোকিছুর পরেও তাদের মধ্যে কোনো লজ্জা, অনুতাপ, অপরাধবোধ ও নতি স্বীকার না করার দ্বারা। যেমন : ইবনে জিয়াদের কথাই ধরা যাক। কারবালার এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েও তার ভেতরে কোনো পরিবর্তন আসেনি। যখন সে ইরাক থেকে জীবন বাঁচিয়ে শামের দিকে পলায়ন করছিল তখন তাকে খুব চিন্তিত অবস্থায় দেখে একজন বলল, আপনি মনে হয় ভাবছেন যে, হায়! যদি হজরত হুসাইন রা. কে হত্যা না করতাম!

ইয়াজিদ সাথে সাথেই প্রতিউত্তর করল, অসম্ভব। হজরত হুসাইন রা. তো আমাকেই হত্যা করতে আসছিল। তাই আমার পর্যন্ত পৌঁছার আগেই আমি তাকে হত্যা করে ফেলাকেই ভালো মনে করেছিলাম।[৩৪০]

মদিনায় হামলাকারী মুসলিম ইবনে উকবা মরার সময়ও এই কথা বলছিল যে, হে আল্লাহ, আমি তাওহিদ এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর এমন কোনো আমল করিনি, যা আমার কাছে মদিনাবাসীদের সাথে যুদ্ধের চেয়ে বেশি প্রিয় এবং আখেরাতেও এর কল্যাণের ব্যাপারে আমি অধিক আশাবাদী। আমি যদি এমন বড় আমলের পরেও জাহান্নামে যাই তাহলে এটা আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই না।[৩৪১] সম্মানিতদের অসম্মান করা এবং যাচ্ছেতাই আচরণ করার অভিপ্রায় ও আত্মপ্রসন্নতায় ভোগার এই বিষবীজ মূলত ইয়াজিদ তাদের ভেতর বপন করে গেছে। কারণ, পরবর্তীতে এটাকে পৃথক একটি শিক্ষা ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মনে করে তারা বারবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। ইয়াজিদের ছেলে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় জিরুন নামক স্থানে যে-পরামর্শসভা বসেছিল, সেখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমালোচনা করতে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি।[৩৪২] এরপর তো মারজে রাহাতের যুদ্ধ একথাই প্রমাণ করে যে, ক্ষমতাবঞ্চিত এই দল যেকোনো মূল্যে তাদের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছিল। তাতে

---

[৩৪০] তারিখুত তাবারি : ৫/৫২২

[৩৪১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৬৩৩; তারিখুত তাবারি : ৫/৪৯৭; তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৩৩

[৩৪২] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬৫

যদি যুদ্ধ, অন্যায় হত্যা ও রক্ত ঝরাতে হয় তাহলে তা করতেই তারা ছিল বদ্ধপরিকর। অথচ তাদের বিপরীতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতি ছিল ঈর্ষণীয়। মক্কায় আক্রমণ এবং কঠিন অবরোধ চলা সত্ত্বেও তিনি তার সাথি-সঙ্গীদের পীড়াপীড়িতেও শামের সৈন্যদের উপর আক্রমণের অনুমতি দেননি। কারণ এক্ষেত্রে নিরপরাধ মুসলমানদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে এবং অযথাই জীবন হারাতে হয়। তাই তিনি এই যুদ্ধের অনুমতি দেননি।[৩৪৩] তবে আমরা একথা অস্বীকার করছি না যে, প্রথম যুগের বনু উমাইয়ার আমিরদের মাঝে জাতির কল্যাণবোধ ছিল না। আমরা সেই বাস্তবতাও অস্বীকার করছি না যে, রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা এবং জনসাধারণের ব্যাপারে কোনো চিন্তাফিকির তাদের মাঝে একেবারেই ছিল না। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো খলিফার বিরোধিতা একথাই প্রমাণ করে যে, তারা আসলে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন, তাই করতে পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত ছিল। এই আগ্রহ বা লোভকে অসুস্থতা ছাড়া কিছুই বলার নেই।

রাজনৈতিক গোঁড়ামির ব্যামো এবং পরবর্তীকালে তার প্রভাব

বনু উমাইয়ার এই রাজনৈতিক গোঁড়ামি প্রায় ৯ বছর অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে তারা একমুহূর্তের জন্যও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা থেকে নিবৃত থাকেনি। তা ছাড়া এই ৯ বছরে তারা অনেক যুবককে তৈরি করে ফেলেছিল তাদের মতো করে, যাদের সিদ্ধান্ত শুধু ক্ষমতা অর্জনই ছিল না; বরং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখাও ছিল অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এভাবেই একসময় ক্ষমতা তাদের গোত্র, সেখান থেকে নিজ বংশ, বংশ থেকে পরিবার, পরিবার থেকে নিজের সন্তানে এসে ক্ষমতা নিস্তার পেলো। শাসনটা হয়ে উঠল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নিজেদের বাপ-দাদার সম্পত্তির মতো। এই অসুস্থতার শুরুটা মূলত হয়েছিল ৬৪ হিজরিতে বিদ্রোহের সময়কাল থেকেই, যখন মারওয়ানের পর খালেদ ইবনে ইয়াজিদ এবং তারপর আমর ইবনে সাঈদকে খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করা হলো। হতে পারে তাদের অনেকেই নামাজ, রোজা ও সুন্নাতের অনুসারী ছিল। কিন্তু এটা নিশ্চিত

---

[৩৪৩] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৬

যে, তাদের প্রায় সকলেই রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে জুলুম ও অন্যায় করাকেও জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভেবে বৈধতার আওতায় নিয়ে এসে নির্বিবাদে সব করে চলছিল এবং এক্ষেত্রে নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিতো। তাদের ধারণা ছিল, তারা যা করছে সব সঠিক এবং আল্লাহ তায়ালাও তাদের এসব কাজে সন্তুষ্ট। এর সামান্য ধারণা পাওয়া যায় শাম্মার ইবনে যিল-জাওশানের কর্মকাণ্ড থেকে, যে হজরত হুসাইন রা. কে শহিদ করে দিয়েছিল এবং সৈন্যরা যখন হজরত হুসাইন রা. কে শহিদ করার ক্ষেত্রে কিছুটা অনাগ্রহ প্রকাশ করল তখন সে বলেছিল, "আরে কীসের অপেক্ষা করছো! একে হত্যা করে ফেলো।" এরপরই মূলত হজরত হুসাইন রা. কে শহিদ করে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।[৩৪৪] অথচ এই শাম্মার ইবনে যিল-জাওশান গোটা জীবনজুড়ে ছিল পাক্কা নামাজি এবং ইবাদতগুজার ব্যক্তি। ফজরের নামাজ পড়ে ইশরাক পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করতো। এরপর ইশরাক পড়ে এই দোয়া করতো, "হে আল্লাহ, আপনি ভালোই জানেন, আমি কতটা ভদ্র। সুতরাং আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।" তার এই দোয়া শুনে এক লোক বলেছিল, "আল্লাহ তোমাকে কেন ক্ষমা করবেন? তুমি তো নবীজির নাতি হজরত হুসাইন রা. কে শহিদ করেছো।" উত্তরে শাম্মার বলল, তোমার ধ্বংস হোক! এতে আমার কী করার ছিল! আমাদের উপর শাসকের এমনটাই আদেশ ছিল। আমাদের তো তার নির্দেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। আর যদিও আগ বেড়ে তার নির্দেশ উপেক্ষা করতাম তাহলে আমাদের অবস্থা বোঝা-টানা গাধার চেয়েও খারাপ হতো।"[৩৪৫]

হাফেজ জাহাবি রহ. তার এই উত্তরের উপর ব্যাখ্যা করে বলেন, "তার এই ওজর সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, শাসকের আনুগত্য করা একটি কল্যাণকর কাজ ছাড়া কিছুই না।"[৩৪৬] এই ঘটনাগুলো থেকে তখনকার সকল শাসকের অবস্থাই কিছুটা আঁচ করা যায়। তা ছাড়া তারা এই ভুল মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠছিল দিন দিন। তাদের এই মন্দ মানসিকতার ফলে মুসলিমবিশ্ব বারবার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

---

[৩৪৪] অল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৫৪৮

[৩৪৫] তারিখে দিমাশক : ২৩/১৮৯

[৩৪৬] মিযানুল ইতিদাল : ২/২৮০

শাম এবং মিসরে মারওয়ানের দখলদারিত্ব

মারজে রাহাতের ময়দানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দলকে পরাজিত করে মারওয়ান ইবনুল হাকাম বনু উমাইয়ার এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু এই হুকুমত হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধরের মধ্যে আর রইলো না; বরং তা ছিল হাকাম ইবনুল আসের বংশধারা থেকে। যদিও জাবিয়াতে বনু উমাইয়ার-করা সমাবেশে ৬৪ হিজরির যিলকদ মাসে মারওয়ান ইবনুল হাকামের পর খালেদ ইবনে ইয়াজিদ এবং তারপর আমর ইবনে সাঈদকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু মারওয়ান যখন তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল এবং ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নিলো তখন সে খালেদ ইবনে ইয়াজিদ এবং আমর ইবনে সাঈদের পরিবর্তে তার ছেলে আবদুল মালেক এবং তারপর আরেক ছেলে আবদুল আজিজকে শাসক হিসেবে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিলো।[৩৪৭] এভাবেই পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার শেকড় আরো শক্ত হয়ে গেলো।

৬৪ হিজরির জিলকদে খেলাফতের দাবি করার পর মারওয়ান মাত্র ৯ মাস বেঁচে ছিল। ৬৫ হিজরির মহররম মাসে সে মারজে রাহাতের যুদ্ধে জয়ী হলো। তারপর শামের অন্যান্য এলাকাও দখল করল। এরপর মিসর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদের সাথে গোপনে আলাপ-আলোচনা করল। তখন মিসরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নায়েব হজরত আবদুর রহমান ইবনে জাহদামের শাসন চলছিল। মারওয়ান সেখানে গিয়ে প্রধান শহর ফুসতাত ঘেরাও করে ফেলল। শহরবাসীরা খন্দক খনন করে তাদের সাথে কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে গেলো।

---

[৩৪৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৬০৫

যুদ্ধের শেষদিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল হয়ে গেলো। যুদ্ধের কারণে লোকজন তার জানাজাতেও ঠিকমতো অংশগ্রহণ করতে পারল না। তারপর তার ঘরেই তাকে দাফন করা হলো। এই দিনই শহরবাসী তাদের হাতিয়ার রেখে দিলো এবং মারওয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ করল। মারওয়ান সেখানকার প্রায় ৮০ জনকে হত্যা করল। কারণ তারা মাওয়ানের বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাদের মধ্যে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘর অবরোধকারী উকাইদিন ইবনে হাম্মাম নামের একজন বৃদ্ধও ছিল। এটা ৬৫ হিজরি ১৫ জুমাদাল উখরার ঘটনা। মারওয়ান তার ছেলে আবদুল আজিজকে মিসরের প্রশাসক নিযুক্ত করল এবং মুসা ইবনে নাসিরকে তার উজির বানিয়ে শামে ফিরে এলো।[৩৪৮] এদিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মিসরবাসীদের সহযোগিতার জন্য রিজার্ভ বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এই বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন তার ভাই মুসআব ইবনে যুবাইর। কিন্তু মারওয়ানের সেনাপতি আমর ইবনে সাঈদ তাদেরকে শামের সীমান্ত এলাকাতেই আটকে দিলো এবং পিছপা হতে বাধ্য করল।[৩৪৯]

হিজাজে মারওয়ানের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়

মারওয়ান তখন হিজাজ দখলের ধান্ধায় ছিল। সে হুবাইশ ইবনে দালাজা এবং নিজ ভাই উবাইদুল্লাহ ইবনে হাকামকে ৪ হাজার সৈন্য দিয়ে মদিনায় আক্রমণের নির্দেশ দিলো। সেই দলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং তার বাবাও শামিল ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বসরা থেকে রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে এসে তাদেরকে রাবযা নামক স্থানে থামিয়ে দিলো এবং ৬৫ হিজরির রমজান মাসে উভয় দলের মধ্যে চরম সংঘর্ষ হলো। সেই যুদ্ধেই উরওয়ার ভাই উবাইদুল্লাহ ইবনে হাকাম এবং সেনাপতি হুবাইশ নিহত হলো। আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও তার বাবা কোনো রকম পালিয়ে বেঁচে ফিরলো।[৩৫০]

---

[৩৪৮] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪২

[৩৪৯] আল-কামিল ফিত তারিখ : ৩/২৪৫; তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৩

[৩৫০] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৪

মারওয়ানের মৃত্যু

তখনো পরাজয়ের সংবাদ দামেশকে পৌঁছেনি। কিন্তু এর মধ্যেই ৬৩ বছরের মারওয়ানের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। ৬৫ হিজরির ৩ রমজানে তার ইনতেকাল হলো।[৩৫১] সে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার স্ত্রী উম্মে খালেদকে বিবাহ করেছিল। ইয়াজিদের ছেলে খালেদ তখন তার ঘরেই লালিত-পালিত হচ্ছিল। কিন্তু মারওয়ান তার সাথে ভালো আচরণ করতো না। একদিন মারওয়ান খালেদকে সবার সামনে তার মায়ের নাম তুলে গালি দিলে খালেদ এসে তার মাকে সব বলে দিলো। একথা শুনে উম্মে খালেদ মারওয়ানকে হত্যার ফন্দি-ফিকির করতে লাগল। সেদিন রাতেই মারওয়ান যখন বিশ্রামের জন্য শোয়ার ঘরে এলো তখন উম্মে খালেদ কয়েকজন পরিচারিকাকে ভেতরে ডাকলো। এরপর মারওয়ানের মুখে একটি বালিশ চাপা দিয়ে অনেক জিনিসপত্র রেখে দিলো। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরই দম বন্ধ হয়ে মারওয়ান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।[৩৫২] কি আশ্চর্য! এত বড় একজন রাজনীতিবিদ ঘরের সামান্য ও সাধারণ এক স্ত্রীর রাজনীতির শিকার হয়ে গেলো। মারওয়ান ইবনুল হাকামকে সাধারণত প্রবীণ তাবেয়িদের কাতারে শামিল করা হয়। সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও কুরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতো।[৩৫৩] জ্ঞান, আদব-আখলাক, বীরত্ব, সাহসিকতা, সমরজ্ঞান ও রাজনৈতিক ব্যাপারে একজন ধীমান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিল। কিন্তুকিছু রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে সে সমালোচিত হয়েছে। সে মারওয়ানি খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই ইতিহাসে পরিচিত ছিল। যদি মারওয়ানের ব্যাপারে এই অভিযোগটা না থাকতো যে, সে হজরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. কে শহিদ করেছে এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শরিয়তসম্মত খেলাফতের বিরোধিতা করেছে তাহলে ইসলামি ইতিহাসে হজরত হাসান বসরি রা. এবং হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতোই সে গ্রহণীয় ও বরণীয় হতো। সেইসাথে তাকে খুব সম্মানের সাথে স্মরণ করা হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মারওয়ান

---

[৩৫১] তারিখে খলিফা : ২৬২

[৩৫২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬৫ হিজরির আলোচনাধীন; আসসিকাত লিলআজলি : ২/১০৫, ১০৬

[৩৫৩] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৬০

সেই স্থানটা দখল করতে পারেনি এবং সেই স্থান পর্যন্তও পৌঁছতে পারেনি, যেখানটায় পৌঁছেছে তার সমকালীন ও নিম্নস্তরের অনেক তাবেয়ি।[৩৫৪]

---

[৩৫৪] মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে মারওয়ান :

যদিও মারওয়ানের জন্ম গাজওয়ায়ে উহুদের সময় হয়েছিল। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর সময় মারওয়ানের বয়স যদিও ৮ বছর ছিল; কিন্তু আসমাউর-রিজালের সকল কিতাবেই তাকে তাবেয়ি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৩৬ আল ইসতিয়াব : ৩/১৩৮৭ উসদুল গাবাহ : ৫/১৩৯; কেউ কেউ তাকে হাফেজ ইবনে হাজারের বরাতে সাহাবি হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এমন কোনো দাবি পেশ করেননি। অবশ্য এক জায়গায় মারওয়ানকে সাহাবি হিসেবে গণ্য করার পরপরই বলেছেন, আমি এমন কাউকে দেখিনি যে মারওয়ানকে সাহাবি হিসেবে গণ্য করে এবং তাকে সাহাবি হিসেবে আখ্যা দেয়। আল-ইসাবাহ : ৬/২০৩; হাফেজ ইবনে হাজার আরেক স্থানে এর চেয়েও আরো স্পষ্ট করে বলেন, মারওয়ানের সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। তাকরিবুত তাহযিব : ৬৫৬৭; হাফেজ জাহাবি মারওয়ানের ব্যাপারে ইমাম বুখারি রহ.-এর কওল উল্লেখ করে বলেন, ইমাম বুখারি রহ. মারওয়ানের ব্যাপারে বলেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মারওয়ানের সাক্ষাতের কোনো প্রমাণ নেই। এরপর হাফেজ জাহাবি রহ. লেখেন, আমার মতেও মারওয়ান একজন তাবেয়ি ছিল এবং তার থেকে বেশ কিছু মন্দ কাজও প্রকাশ পেয়েছে। আল-মুগনি ফিযযুআফা : ২/২৫১; মিযানুল ইতিদাল গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে: আমার মতে মাওয়ান থেকে এমনসব কাজ প্রকাশ পেয়েছে যেগুলো খুবই ধ্বংসাত্মক। আমরা তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা কামনা করি। মিযানুল ইতিদাল : ৪/৮৯; শুধু ওয়াকিদির এক বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মারওয়ানের সাক্ষাৎ হয়েছিল। আতাদিল ওয়াত তারজিহ : ২/৭৩১; কিন্তু ভালো মন্দ বাছ-বিচারহীন বর্ণনা একত্রকারী ওয়াকিদির কথাকে কীভাবে ইমাম বুখারি রহ.-এর মতো বড় ব্যক্তিদের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। সেই কারণেই আল্লামা ইরাকি রহ. লিখেছেন, ইমাম তিরমিজি রহ. একদিন নিজে ইমাম বুখারি রহ. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন; আচ্ছা! মারওয়ান কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিল? এর উত্তরে ইমাম বুখারি রহ. সরাসরি বলেছিলেন যে, না। মারওয়ান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনি। তুহফাতুত তাহসিল ফি যিকরি রুয়াত আল মারামিল : ১/২৯৮; বড় বড় ব্যক্তিদের মতকে উপেক্ষা করে ওয়াকিদির মতো এমন একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর কথায় কাউকে সাহাবিয়্যাতের আসনে বসানোটা মূর্খতা ছাড়া কিছুই হবে না। তবে একথা সত্য যে, বেশ কিছু মুহাদ্দিস মারওয়ানকে সিকাহ রাবি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই ইমাম বুখারি রহ. তার থেকে অনেক বর্ণনাকেই গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া মারওয়ান হজরত উমর, হজরত উসমান ও হজরত আলি রা. থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছে সেইসাথে এসব হাদিস তার থেকে গ্রহণ করেছেন হজরত সাহাল ইবনে সা'দ, হজরত উরওয়া ইবনুয যুবাইর এবং আলি ইবনে হুসাইনের মতো ব্যক্তিগণ। আল-জারহু ওয়াত তাদিল লিইবনে আবি হাতেম: ৮/২৭১; এর কারণ মূলত এই ছিল যে, মারওয়ান এসব বর্ণনা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর বিরোধিতার পূর্বে বর্ণনা করেছিল। ফাতহুল বারি : ১/৪৪৩; এবং তখনো

মুখতার : বনু সাকিফের মিথ্যাবাদী

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং মারওয়ানের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলাকালীন সময়ে মক্কায় উদ্ভাবিত এক নতুন শক্তি ইসলামিবিশ্বকে নিজের মুঠোয় আনার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। এই চক্রান্তের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মুখতার ইবনে আবু উবাইদা। বনু সাকিফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইতিহাসে তাকে মুখতার সাকাফি বলে স্মরণ করা হয়। তার পিতা আবু উবাইদা ইবনে মাসউদ সাকাফি একজন সাহসী তাবেয়ি ছিলেন, যিনি হজরত উমর রা. এর খেলাফতকালে ইরাকের সীমান্ত এলাকায় 'জিসিরযুদ্ধে' মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বলা হয়, মুখতারও তাবেয়িদের সময়কালেরই লোক ছিল। কিন্তু সে তাকওয়া, আমানতদারি এবং জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ খালি ছিল। তবে সে তার বীরত্ব ও দূরদৃষ্টির ফলে বনু সাকিফের প্রধান সারির লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[৩৫৫] শুরু থেকেই তার ভেতরে নেতৃত্বের লোভ জন্মে গিয়েছিল। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সময় সে যুবক ছিল। আর তখন তার চাচা সাঈদ ইবনে মাসউদ মাদায়েনের গভর্নর ছিল। সেসময় তার মাথায় নেতৃত্বের

পর্যন্ত তার উপর হজরত তালহা রা. কে হত্যার অভিযোগ ছিল না। এই কারণে তখন সবাই তাকে সাহাবিদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন বড় তাবেয়ি হিসেবেই ভাবতো। সুতরাং মারওয়ানের এমন ভুল কাজের পরেও এই সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই যে, সে জেনে বুঝে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নবীজির হাদিসকে বিকৃত করেছে। কিংবা তাতে কোনো রদ বদল করেছে। এরও সম্ভাবনা রয়েছে মুহাদ্দিসগণ হজরত উরওয়া ইবনুয যুবাইরের মতের উপর ভিত্তি করে তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন এবং তার রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও বলতেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছে মারওয়ান ইবনুল হাকাম আর আমরা তাকে অভিযোগ মুক্ত মনে করি না। আততারিখুল কাবির : ১/৩১৭; তা সত্ত্বেও ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. মারওয়ানকে সিকাহ রাবি মনে করতেন না। অথচ তখনো প্রায় সকল মুহাদ্দিসগণের মত ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হবে না এবং তার রাজনৈতিক ভুল যেগুলো বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সেগুলোকেও অস্বীকার করা হবে না।

[৩৫৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৫৪০

লোভ চড়ে বসল। ভাবলো, যদি হজরত হাসান রা. কে ধরে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দেওয়া যায় তাহলে অবশ্যই বড় কোনো পদ আমাকে দেওয়া হবে। এরপর এই ইচ্ছার কথা যখন সে চাচা সাঈদ ইবনে মাসউদের কাছে প্রকাশ করল তখন সাঈদ খুব কঠোরভাবে ধমকি দিলো এবং এই ইচ্ছা ত্যাগ করার আদেশ দিলো।[৩৫৬] এরপর ইয়াজিদের যুগে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যখন তার এমন আরো সব হঠকারিতা ও গোঁড়ামির কথা জানতে পারল তখন তাকে একশো বেত্রাঘাত করে শহর থেকে বের করে তায়েফে পাঠিয়ে দিলো।[৩৫৭] বেত্রাঘাতের সময় তার এক চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[৩৫৮] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং ইয়াজিদের দ্বন্দ্ব চলাকালে সে মক্কায় এসে গেলো এবং হুসাইন ইবনে নুমাইরের বিরুদ্ধে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এসবের দ্বারা তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় সাহাবি ও তাবেয়ির সাথে ওঠাবসা করে জনমনে নিজের অবস্থান শক্ত করা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ছাড়াও হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার কাছেও তার আসা-যাওয়া ছিল। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া যেহেতু অনেক জ্ঞানী ও দূরদর্শী মানুষ ছিলেন; তাই তিনি মুখতারের এই চক্রান্তটা ধরতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি মুখতারকে এড়িয়ে চলতেন। তবে শুরুর দিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার উপর বেশ ভরসা রাখতেন। এরপর যখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন সে ইরাক যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলো এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে এটাও বুঝালো যে, সেখানে গেলে খেলাফতে যুবাইরিয়ার অনেক উপকার হবে।[৩৫৯]

---

[৩৫৬] তারিখুত তাবারি : ৫/১৫৯

[৩৫৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৫৪৪

[৩৫৮] আলমুহাব্বার: ১/৩০৩

[৩৫৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৯৮

নোট : খেলাফতে যুবাইরিয়্যাহ' এই পরিভাষাটা অনেক ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করেছেন। এখানে সহজার্থে আমরা সেই পরিভাষাটাই ব্যবহার করেছি। নয়তো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বা তার সাথিবর্গ কখনোই তাদের সময়কাল বা খেলাফতকে 'খেলাফতে যুবাইরিয়্যাহ' বা অন্য কোনো নামে আখ্যা দেননি।

তাহরিকে তাওয়াবিন বা তাওয়াবিন আন্দোলন

সবশেষে মুখতার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে অনুমতি নিয়ে ৬৪ হিজরির রমজান মাসে মক্কা থেকে বের হয়ে কুফায় গিয়ে থামলো।[৩৬০] সেখানে তখন সাহাবি হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন।[৩৬১] তার সাথে তখন ছিল কুফায় অবস্থানরত শিয়ানে আলির লোকজন। সেইসাথে তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধের জন্য সবধরনের সরঞ্জামই প্রস্তুত করছিল। এরা সকলেই মূলত কারবালায় হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সহযোগিতা না করার কারণে লজ্জিত ছিল। এদের মধ্যে সেইসব লোকও শামিল ছিল, যারা হজরত হুসাইন রা. কে চিঠি দিয়ে ইরাকে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা তাদের এই

---

[৩৬০] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৭৭, ৫৭৮

[৩৬১] হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা.-এর সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে আসলাফগণ একমত পোষণ করেছেন এবং আসহাবে জরাহ ও তাদিলের মতও এটাই। আত তারিখুল কাবির লিলবুখারি : ৬/১৩৬; আল ইসতিয়াব : ২/৬৫০, ৬৫১; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৯৪; আল-ইসাবাহ : ৩/১৪৪ মু'জামুস সাহাবা : ৩/১৫৬; এছাড়াও সহিহ বুখারিতে তার থেকে মারফু বর্ণনা রয়েছে। হাদিস নম্বর: ৩২৮২, ৪১১... (এখানে এরপরের সংখ্যাটা অস্পষ্ট) অন্যস্থানেও এসেছে যেমন: ৬০৪৮

এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মারওয়ানিয়্যাতে প্রভাবিত কিছু নতুন গবেষত হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা.-এর সাহাবি হওয়াটা অস্বীকার করেন। কারণ তাদের মতে একজন সাহাবির জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর অবৈধ খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব করাটা অসম্ভব বিষয়। প্রথমত তাদের এই দলিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দ্বিতীয়ত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর খেলাফত ছিল শরিয়তসম্মত। সুতরায় তার প্রতিনিধি কিংবা তাকে সমর্থনকারীগণ কখনোই রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। বরং আসল রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল শামের আমিরগণ। যারা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর শরিয়তসম্মত খেলাফতের বিরোধিতা করে আসছিল। একথা সত্য যে, সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ছিল শিয়ানে আলির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তখন শিয়ানে আলির অধিকাংশের আকিদা-বিশ্বাসই ছিল সঠিক। শুধু সাবায়ি গ্রুপ যারা পরবর্তীতে রাফেজিদের মূল ভিত্তি হয়েছিল। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ছিল অশুদ্ধ। তাই বলে কতক মন্দ মানুষের কারণে পূর্ণ দল বা মতাদর্শকেই বর্জন করা বা খারাপ বলা সঠিক নয়। কারণ পৃথিবীতে হকপন্থিদের এমন কোনো দল নেই, যাতে এই ধরনের মন্দ মানুষ নেই। তা ছাড়া এটা তো সকলেরই জানা যে, নবীজি থাকা অবস্থাতেও মদিনায় মুনাফিকদের হৈ-হুল্লোড় কম ছিল না। তারা প্রকৃত ঈমানদারদের বেশ ধরে ইসলামকে নিধনের চক্রান্ত সবসময়ই করতো। সুতরাং নবীজির অবর্তমানে হকপন্থিদের সাথে এমন দুষ্টচক্র থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে হকপন্থিদের কাজকর্ম বাতিল হিসেবে গণ্য করাটা কোনোভাবেই ঠিক হবে না।

আন্দোলনকে 'তাহরিকে তাওয়াবিন' (তাওবাকারীদের আন্দোলন) নামকরণ করেছিল। হজরত হুসাইন রা. কে রক্ষার অবহেলার উপর তারা তাওবা ও ইসতেগফার করেছিল এবং তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে ছিল বদ্ধপরিকর। এতে যদি জিহাদ করতে করতে জীবন চলে যায় তাহলেও তাতে তাদের সামান্যও পিছুটান ছিল না। এজন্য তারা ইরাক থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শামের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো এবং সেখানে গিয়ে বনু উমাইয়ার আমিরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করল। আর হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি মহব্বত যেহেতু সকল মুমিনের অন্তরে ছিল; তাই হাজারো যুবক সুলাইমান ইবনে সুরাদের নেতৃত্বে তাদের পতাকাতলে একত্র হয়ে গেলো।[৩৬২] তাওয়াবিনদের এই আন্দোলন প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং বুঝে-শুনেই তাদেরকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিলেন। কারণ তার এই শক্তি শামি আমিরদের বিরুদ্ধে ব্যয় হচ্ছিল। তা ছাড়া এই আন্দোলনটা তার খেলাফতের অধীনও ছিল। হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. ছাড়াও এই আন্দোলনে আমির হিসেবে শরিক ছিলেন মুসাইয়িব ইবনে নাজবা ফাযারি, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ায়েল এবং রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ রহ.-এর মতো বড় বড় তাবেয়ি।

তাওয়াবিনদেরকে মুখতারের নিজের দিকে আকৃষ্টকরণ

মুখতার যখন কুফায় পৌঁছল তখন দেখল যে, হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা.-এর নেতৃত্বে সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে মুখতার ভাবলো, এই তো সুযোগ! এখন অনেককেই আমার মুঠোয় আনা সম্ভব। ফলে সেও সবার সাথে সুর মিলিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের আওয়াজ তুললো। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ ছিলেন সকলের কাছে বরিত ও মানিত মানুষ। তা ছাড়া তিনি ছিলেন সেখানকার অনেক পুরাতন ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। তাই মুখতারের কোনো মূল্যই সেখানে ছিল না।

---

[৩৬২] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৫২ থেকে ৫৬০ পর্যন্ত।

এভাবে মুখতার যখন দেখল সোজাসুজি কাজ হচ্ছে না তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলতে শুরু করল, "আমি এই জমানার পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি আমাকে তার বিশেষ প্রতিনিধি বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।" অপরদিকে সে হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদের ব্যাপারে বলতে লাগল, "সে তো তোমাদের নিয়ে শুধু যুদ্ধই করতে যাচ্ছে। এতে দেখবে সে নিজে তো মরবেই সাথে তোমাদেরকে নিয়ে মরবে। কারণ সে সমরনীতিতে একদম অনভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞানই নেই।" এভাবে সে হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে কিছু লোককে নিজের দলে ভিড়িয়ে ফেলল। এভাবে আলি-ভক্ত শিয়ারা দুই ভাগ হয়ে গেলো। অধিকাংশই ছিল হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদের দলে। আর কিছু ছিল মুখতারের দলে।

তাওয়াবিনদের পরিণাম

মুখতার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা প্রথমে হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে তারপর তারা সামনে অগ্রসর হবে। সেই কারণে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রইলো। সেই সাথে তাওয়াবিনদের সিদ্ধান্তের প্রশংসা এবং তাদেরকে প্রাণিত করতে থাকল। এদিকে হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন তখন প্রায় ১৬ হাজার সৈন্য যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লেখালো। সৈন্যদের এই উদ্দীপনা দেখে কুফায় অবস্থানরত হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতে অংশগ্রহণকারীদের ঘুম হারাম হয়ে গেলো। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতাকারীদের অন্যতম আমির আমর ইবনে সা'দ তো ভয়ে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়েই দিলো এবং রাজপ্রাসাদে রাত্রিযাপন করতে থাকল। সবশেষে হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন তখন তার সাথে সৈন্য ছিল মাত্র ৪ হাজার। কিন্তু এতকিছুর পরেও হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. তার সিদ্ধান্ত থেকে সামান্যও নড়লেন না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে খুব বোঝালো যে, এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শামের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো বোকামি না করাই ভালো। কিন্তু হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না। বরং নিজ সিদ্ধান্তে অটল ও অবিচল রইলেন।

ঠিক এই সময় কুফার গভর্নরদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, শাম থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইরাকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। সেই কারণে শহরের হাকিম হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. কে বললেন, "আপনি এখানে থেকেই লড়াই করুন। এর মধ্যে আমরাও আমাদের প্রস্তুতি সেরে নিই। এরপর শত্রুরা যখন আসবে তখন আমরা একসাথে ও একযোগে তাদের উপর আক্রমণ করব।" কিন্তু হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. এতটুকু অপেক্ষাও সহ্য করতে পারলেন না। এরপর ৬৫ হিজরির রবিউল উখরার ৫ তারিখে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরের কাছে গিয়ে দোয়া ও কান্নাকাটি করে শামের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। এই জামাতের প্রধান স্লোগান ছিল 'ইয়া লিসারাতিল হুসাইন' (হায়, হুসাইনের প্রতিশোধ)! পরবর্তীতে এই স্লোগানটাই পছন্দ করেছিল মুখতার।

এভাবে তারা যখন 'কারকিসিয়া'নামক স্থানে পৌঁছল তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পৃষ্ঠপোষক যুফার ইবনে হারেস তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল এবং খুব সম্মান ও যত্ন করল। যুফার ইবনে হারেস এতো অল্প সৈন্যসংখ্যক দেখে খোলা ময়দানে শামের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করাকে বিপজ্জনক ভেবে বলল, "আপনি আমাদের শহরে অবস্থান করে সেনাঘাঁটি বানিয়ে নিন। এই ক্ষেত্রে আমাদের এবং আপনাদের উদ্দেশ্য একই হবে। তা ছাড়া শাম থেকে আপনার সাথে লড়াই করার জন্য সৈন্যদের অনেক বড় একটি দল রওনা হয়ে গেছে।" কিন্তু হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. এই সিদ্ধান্তও উপেক্ষা করলেন এবং বললেন, "এই পরামর্শ তো আমাদের শহরের লোকেরাও দিয়েছিল; কিন্তু আমরা তা গ্রহণ করিনি।" সর্বশেষ হজরত যুফার ইবনে হারেস যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিয়ে তাদেরকে বিদায় দিলেন। এরপর হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. যখন বাহিনী নিয়ে শামের সীমান্ত এলাকা 'আইনুল ওয়ারদা'য় পৌঁছলেন তখন তারা শামের সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ৬৫ হিজরির রবিউল উখরার ২৬ তারিখে। তখনো মারওয়ান ইবনুল হাকাম জীবিত ছিল। সে-ই মূলত এই সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিল। টানা তিনদিন এখানে ভয়ংকর যুদ্ধ চললো। অবশেষে শামি সৈন্যরা তাদেরকে পরাজিত করে প্রায় সকলকেই হত্যা করে ফেলল। শুধু হজরত রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ রহ. কিছু

লোকবল নিয়ে কোনোরকম বেঁচে ফিরলেন।[৩৬৩] সে-সময় হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল ৭৩ বছর।[৩৬৪] তিনি কিছু হাদিসও বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেছিলেন।[৩৬৫]

পরাজয়ের কারণ

হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরাজয়ের কারণ বেশ স্পষ্ট।

১. তার ভেতরে হুঁশের চেয়ে বেশি কাজ করেছিল জোশ। শুধু তাওয়াক্কুলের মাধ্যমেই তিনি যুদ্ধজয় করতে চাচ্ছিলেন।
২. সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। মাত্র ৪ হাজার। আর শামিদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০ হাজার।
৩. যুদ্ধের ময়দানটা শামের নিকটবর্তী এবং কুফা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। ফলে তাওয়াবিনদের জন্য সৈন্যসাহায্য পৌঁছা ছিল অনেক কঠিন আর শামিদের জন্য ছিল খুবই সহজ।
৪. প্রকৃতপক্ষে হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ যুদ্ধ সম্পর্কে তেমন অভিজ্ঞ বা প্রাজ্ঞ ছিলেন না। সাথিদের মধ্যেও যুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো কমান্ডার ছিল না। অপরদিকে হুসাইন ইবনে নুমাইর ছিল অভিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।
৫. তাওয়াবিনদের নিজেদের মধ্যেই পরস্পরের সহযোগিতা ও শৃঙ্খলার অভাব ছিল। কারণ প্রয়োজনের সময় সৈন্যসংখ্যা ১৬ হাজার থেকে ৮ হাজার চলে এসেছিল।
৬. মুখতার যদিও উপরে উপরে এই আন্দোলনের পক্ষে ছিল; কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিল শয়তানি। তার কারণেই মূলত অনেক সৈন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। ফলে তাওয়াবিনরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

বাহ্যিকভাবে এইসব কারণেই মূলত তাওয়াবিনদের শেষ পরিণাম এই হয়েছিল।

---

[৩৬৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৮৩ থেকে ৬০৫ পর্যন্ত। তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৬, ৪৭ আল-কামিল ফিততারিখ : ৬৫হিজরির আলোচনাধীন।
[৩৬৪] জামিউল উসুল : ১২/২৪৮ মুসতাদরাকে হাকিম : ৬২৫৫
[৩৬৫] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ৪/১৯১

মুখতারকে বন্দি ও তার পরবর্তী তৎপরতা

হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. কুফা থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকেই মুখতারের তৎপরতা বেড়ে গেলো। কুফায় অবস্থানরত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্তগণ মুখতারের চলাফেরা বেশ সন্দেহজনক মনে করলো। কারণ যেকোনো সময়ই সে শহর অনিরাপদ করে তুলতে পারে এবং রাষ্ট্রের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কুফার হাকিম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ হঠাৎই মুখতারকে গ্রেফতার করে জেলে বন্দি করে রাখে।[৩৬৬] এরপর তাওয়াবিনদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারা যখন কুফায় এলো তখনো মুখতার কারাগারেই আবদ্ধ ছিল। মুখতার সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্যালক ছিল। তাই সে তার বোনের মধ্যস্থতায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুপারিশে জেল থেকে মুক্তি পেলো। সেই সাথে কুফার শৃঙ্খলারক্ষাকারীগণ শহরের দশজন বড় বড় ও সম্মানিত ব্যক্তির থেকে এই জামানতনামা লেখান যে, এই ব্যক্তি কারাগার থেকে বের হয়ে যেন রাষ্ট্রের কোনো বিরোধিতায় লিপ্ত না হয়। এই কথার উপর মুখতার থেকে অঙ্গীকারও নেওয়া হয়।

এরপর কারাগারের বাইরে বের হয়েই মুখতার বলে উঠল, "এরা কতো মূর্খ! এরা ধরেই নিয়েছে যে, আমি আমার শপথ পূর্ণ করব।" এই বলে সে পূর্বের থেকে আরো দ্রুত তৎপরতা শুরু করে দিলো।[৩৬৭] এরপর সে হজরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য সামনে অগ্রসর হলো। তখন তাওয়াবিনদের বাকি লোকজন আমিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের আশায় তার আশপাশে জড়ো হলো। তার এই গ্রহণযোগ্যতার একটি কারণ এই ছিল যে, সে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া থেকে একটি চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিল, যাতে তাকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর সে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে মাহদি (পথপ্রদর্শক) আর নিজেকে তার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করল। অবশ্য কেউ কেউ মুখতারকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল; তাই তারা ছোট একটি দলকে আসল খবর নেওয়ার জন্য হিজাজ পাঠিয়ে দিলো।

---

[৩৬৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৬৮৯, ৬৯০

[৩৬৭] তারিখুত তাবারি : ৬/৪-৯ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/২০৫

মুখতারের ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মন্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া স্পষ্টভাবে মুখতারকে নিজের প্রতিনিধি আখ্যা দেননি; বরং বলেছেন, "আমি চাই যে, আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়েই যেন আমাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।" এদিকে মুখতার খুব ভয়ে ছিল। কারণ মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া আবার উলটা কিছু বলে না বসেন! কিন্তু হিজাজ থেকে যখন এই দলটি ফিরে এলো তখন তারা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার কথার সারমর্ম হিসেবে এই কথা বলেন যে, "মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া আমাদেরকে মুখতারের সহযোগিতার আদেশ দিয়েছেন।"[৩৬৮] এতে মুখতারের গ্রহণযোগ্যতা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেলো। কুফায় মুখতারের এই তৎপরতা দেখে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সেখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি রা. কে নতুন হাকিম হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তিনি নামাজ এবং অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। আর আয়াস ইবনে মুযারিবকে পুলিশপ্রধান নিযুক্ত করলেন এবং তাকে সর্বসাধারণের সাথে নম্রতা প্রদর্শন আর সন্দেহভাজনদের প্রতি কঠোরতা আরোপের আদেশ দিলেন।[৩৬৯]

কারামতি কুরসি

মুখতার লোকদেরকে নিজের মুরিদ বানানোর জন্য আশ্চর্য আশ্চর্য পন্থা বের করতে লাগল। এইসময় যখন কেউ তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো তখন তার উপর পয়সার বৃষ্টিবর্ষণ করতো। তুফাইল ইবনে জা'দা নামের এক দরিদ্র ব্যক্তির কিছু পয়সার প্রয়োজন ছিল। তাই তখন সে বুদ্ধি করে অনেক পুরাতন একটা চেয়ার বের করল এবং তা মুখতারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "আমার বাবা এই চেয়ারটাতে বসতেন। এতে নাকি ভিন্নরকম ও বিশেষ এক প্রভাব রয়েছে।" মুখতার এটা দেখে বলল, বাহ! তুমি একথা আমার কাছে আরো আগে বলোনি কেন?" এরপর মুখতার তুফাইল ইবনে জা'দাকে বারো হাজার দিরহাম দিয়ে বিদায় দিলো।

---

[৩৬৮] তারিখুত তাবারি : ৬/১৩, ১৪

[৩৬৯] তারিখুত তাবারি : ৬/১০, ১১

মুখতার সেই চেয়ার নিয়ে এক কাহিনি বানিয়ে ফেলল। লোকদের মজমায় বসে একপর্যায়ে বলল, "পূর্বযুগের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের এমন কোনো জিনিস নেই, যা আমাদের কাছে পৌঁছেনি। বনি ইসরাইলদের কাছে একটি তাবুত (সিন্দুক) ছিল, যাতে হজরত মুসা ও হজরত হারুন আলাইহিমাস সালামের বংশধরদের ব্যবহৃত বরকতময় জিনিসপত্র ছিল। ঠিক এমনই জিনিস আমাদের কাছেও আছে।" এই বলে সে গিলাফ লাগানো চেয়ারটির দিকে ইশারা করল এবং সেটা নিয়ে আসা হলো। এরপর যখন চেয়ারের গিলাফ খুলে ফেলা হলো তখন তা দেখেই লোকেরা চারদিক কাঁপিয়ে তাকবিরধ্বনি দিলো এবং মুখতারের এই দাবির উপর ঈমান আনলো। লোকদের এই কাণ্ড দেখে কুফার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শাবাস ইবনে রিবয়ি তাদেরকে অনেক বোঝালো এবং বলল, "হে লোকসকল, খেয়াল রেখো, তোমরা যেন আবার কুফুরিতে লিপ্ত না হয়ে যাও।" কিন্তু কেউ তার কথায় ভ্রুক্ষেপ করল না। বরং শাবাস ইবনে রিবয়িকে ধাক্কা দিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দিলো।[৩৭০] এরপর থেকে যারাই আসতো, মুখতার তাদেরকে এই চেয়ারের গুণাবলি বর্ণনা করতো। সেই সাথে এই দাবিও করে বসতো যে, হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিজে এখানে আসেন এবং এই চেয়ারে বসেন।

একদিন রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ মুখতারের কাছে গেলো। মুখতার তাকে দেখেই বলল, "আপনি এখানে আসার কিছুক্ষণ আগেই হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এই চেয়ার থেকে উঠে গেলেন।" এই কথা শোনার পর রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ তরবারির খাপে হাত রাখলেন এবং মনে মনে বললেন, "এখনো আমি কীসের অপেক্ষা করছি। আমি কেন এর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলছি না। এরপর আমর ইবনুল হামিক বর্ণিত একটি হাদিসের কথা তার স্মরণ হয়ে গেলো। সেই হাদিসে নবীজি ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি থেকে নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাপদ থাকে; কিন্তু এরপরও দ্বিতীয় ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে গাদ্দারির ছায়াতলে দাঁড় করানো হবে।

---

[৩৭০] তারিখুত তাবারি : ৬/৮২, ৮৩

এই হাদিসের কথা চিন্তা করেই হজরত রিফাআ মুখতারকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা সমীচীন মনে করলেন না।[৩৭১]

মুখতারকে আল্লাহ তায়ালা মূলত ঢিল দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে নিজের শক্তি সমৃদ্ধ করতে থাকল এবং সর্বশেষ ৬৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখে কুফায় ব্যাপক বিদ্রোহ করে বসল।[৩৭২] কুফার গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি রা. কে বহিষ্কার করে দিলো এবং মুখতারের মুরিদরা শহর নিজেদের দখলে নিয়ে নিল। এইসময় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক সৈন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহিদ হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে হজরত রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ রহ. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে কায়েসও ছিলেন।[৩৭৩]

হজরত হুসাইনের হত্যাকারীদের পরিণতি

মুখতার নিজের ক্ষমতা কিছুটা গুছিয়ে বেছে বেছে সেসব লোককে হত্যা করতে থাকল, যারা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। কুফায় মুখতারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলো এবং অনেকেই নিহত হলো। শাম্মার ইবনে যিল-জাওশান বসরার দিকে পালালো। কিন্তু মুখতারের লোকজন তাকে খুঁজে বের করল এবং একপর্যায়ে শাম্মার নিহত হলো।[৩৭৪]

মুখতার কুফায় এই ঘোষণা করে দিলো যে, "হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের যারা এখানো লুকিয়ে আছে, তাদের সবার নাম যেন লোকেরা জানিয়ে দেয় এবং তাদেরকে খুঁজে বের করে হত্যা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনকে আমি এদের থেকে পবিত্র না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার জন্য খানাপিনা হারাম।"

---

[৩৭১] মুসনাদে আবু দাউদ আততায়ালিসি: ১৩৮২

[৩৭২] তারিখে খলিফা : ৩৬৬

[৩৭৩] আল-কামিল ফিততারিখ : ৬৬ হিজরির আলোচনাধীন। তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৫০

[৩৭৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/২১ তারিখুত তাবারি : ৬/৫২-৫৫

এই ঘোষণার পর শহর উত্তপ্ত হয়ে গেলো। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করে আনা হলো। মুখতার তাদের কাউকে জীবিতই পুড়িয়ে ফেলল। কারো হাত-পা কেটে দিলো। কাউকে তির দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হলো। মালেক ইবনে বাশির হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জুব্বা টেনে খুলেছিল। মুখতার তার হাত-পা কেটে হত্যা করল। খাওলা ইবনে ইয়াজিদ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা আলাদা করেছিল। মুখতার তাকে জীবিতই জ্বালিয়ে দিলো। তবে হত্যাকারীদের একজন বড় সদস্য সিনান ইবনে আনাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মুখতার তখন তার ঘর ধ্বংস করে দিলো। উমর ইবনে সা'দকে জীবন রক্ষার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ডেকে আনলো এবং তাকেও হত্যা করে দিলো। তার ছেলে বাবার কাটা মাথা দেখে ইন্নালিল্লাহ পড়লে তাকেও ডেকে এনে এই বলে হত্যা করল যে, এটা মহান আলি ইবনে হুসাইনের বদলা। মুখতার তাদের উভয়ের মাথা আলাদা করে মদিনায় হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না।[৩৭৫] মুখতারের সিপাহসালার ইবরাহিম ইবনে মালেক ছিল আশতার নাখায়ির ছেলে এবং একজন যুদ্ধপ্রিয় লোক। কুফায় মুখতারের বিদ্রোহ ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের বিরোধিতার বিষয়ে তাকে খুব কাজে লাগালো এবং ভালোভাবে ব্যবহার করল।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর কাছে মুখতারের চিঠি প্রেরণ

মুখতার এতটাই ধুরন্ধর ছিল যে, কুফায় বিদ্রোহ করেও সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখল। সেইসাথে তাকে একটি চিঠি লিখে পাঠাল, যাতে মুখতার লিখেছিল, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি রা. আপনার বিরোধীদের প্রতি খুবই নরম ছিল। এজন্য আমি তার আনুগত্য করা পছন্দ করিনি।[৩৭৬] মাদায়েনির বর্ণনামতে মুখতার সেই চিঠিতে লিখেছিল, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি রা. আপনার বিরোধী ছিল এবং সে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সাথে ভাব ও হৃদ্যতা তৈরি করছিল।

---

[৩৭৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/২৩-২৮

[৩৭৬] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৫০

অথচ আপনি আমার নিকট আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের চেয়ে অধিক প্রিয়।"[৩৭৭]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যেহেতু নিজেও রাজনীতি খুব ভালো বুঝতেন; তাই মুখতারের এই চালাকি ধরতে তার খুব বেগ পেতে হলো না। কিন্তু তখন কিছু সমস্যা ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে খুব বেশি কিছু বললেন না। বরং কুফায় হুকুমতের একটি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন।[৩৭৮] মনে হয় সে তার শক্তি দিয়ে শামের বিদ্রোহীদের দমন করতে পারবে।

শামে মুখতারের হামলা এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে হত্যা

৬৬ হিজরির যিলকদ মাসে মুখতারের সিপাহসালার ইবরাহিম ইবনে মালেক নাখায়িকে সাত হাজার সৈন্য দিয়ে শামে পাঠিয়ে দিলো। যেন তারা গিয়ে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে হত্যা করতে পারে। এই দলকে সফলতার ব্যাপারে নিশ্চিত করতে মুখতার তার কারামতি কুরসিটি বিজয়ের নিশান বানিয়ে সৈন্যদের সাথে দিয়ে দিলো। সেই চেয়ারটিকে একটি গিলাফ দিয়ে ঢেকে খচ্চরের উপর বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার চেয়ারটিকে সবদিক থেকে প্রতিরক্ষাব্যূহের মতো বানিয়ে সৈন্যরা সামনে বাড়তে থাকল।[৩৭৯] ৬৭ হিজরির মহররম মাসে এই দলটি মুসেল থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত খাযির নামক স্থানে শামের সৈন্যদের সাথে ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। যেহেতু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিজের অন্যায় ও জুলুমের কারণে বিশেষত কারবালার ঘটনার কারণে সকলের কাছেই ঘৃণিত ছিল; তাই ইরাকিরা তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত পারঙ্গমতা ও উত্তেজনার সাথে লড়াই চালিয়ে গেলো। এদিকে ইবরাহিমে সমরকৌশল ও বীরত্বের সামনে শামি সৈনরা খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারল না। অবস্থার ভয়াবহতা দেখে অবশেষে শামি সৈন্যরা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। সেইসাথে জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠল শামের সৈন্যদের লাশের স্তূপ। ইবরাহিম নিজে আক্রমণ করতে করতে সামনে বাড়তে থাকল এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এরপর সেখানেই তাকে হত্যা করা হলো। পরবর্তীতে

---

[৩৭৭] আনসাবুল আশরাফ : ৬/৭৪৭

[৩৭৮] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৫০

[৩৭৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৮৩

তার লাশ খোঁজা হয়েছিল কাপড়ের সেই সুগন্ধি শুঁকে, যা সে সবসময় ব্যবহার করতো। হুসাইন ইবনে নুমাইর এবং শুরাহবিলের মতো শামি জেনারেলরাও সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনা ঘটেছিল ১০ মহররম। ঠিক এর ছ' বছর পূর্বে এই দিনেই উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছিল। এরপর ইবরাহিম উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মাথা আলাদা করে কুফায় মুখতারের কাছে পাঠিয়ে দিলো।[৩৮০]

সুনানে তিরমিজির বর্ণনামতে মুখতারের সামনে যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কর্তিত মাথা রাখা হলো তখন হঠাৎই কোথা থেকে একটি সাপ চলে এলো এবং পরপর প্রায় তিনবার তার নাক দিয়ে ঢুকে কিছুক্ষণ ভেতরে থেকে মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতো (আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে তার গজব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং মুখতারের মধ্যে অসন্তোষের আগুন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মুখতারের প্রত্যেকটি তৎপরতা চোখে চোখে রাখছিলেন। এই পর্যন্ত তিনি জেনে-শুনেই মুখতারকে ছাড় দিচ্ছিলেন। আর মুখতারও একের পর এক ঘুঁটি চেলে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে সে কুফায় নিজের শাসনকে শক্ত করে ইরাকের কিছু অঞ্চল থেকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষকদের সরিয়ে দখল করে নেয় এবং লোকদেরকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে ভুল-ভাল বোঝাতে থাকে, যাতে জনমনে অন্যকারো বুজুর্গি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। অপর দিকে সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাৎক্ষণিক আক্রমণ থেকেও শংকামুক্ত ছিল না। তার ইচ্ছা ছিল অনেক শক্তি সঞ্চয় করবে এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দল যখন হালকা হয়ে পড়বে তখন হিজাজে হামলা করবে। কিন্তু মুখতার নিজের এই শত্রুতা ঢাকার জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠি লিখল, “আমি তো নিজের সন্তুষ্টিতেই আপনার হাতে বাইয়াত হয়েছিলাম এবং আপনার মঙ্গল কামনা করতাম।

---

[৩৮০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৪৫-৪৮

কিন্তু আপনি যখন আমার সাথে ভিন্ন আচরণ শুরু করলেন তখন আমি আপনার থেকে দূরে সরে গেলাম। কিন্তু এখনো যদি আপনি আমার সাথে আগের মতোই ভালো ব্যবহার করেন তাহলে আমি পুনরায় আপনার অনুগত ও মঙ্গলকামী হয়ে যাবো।"[৩৮১] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. জানতেন মুখতার একথা বলেছে তাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। তাই তিনি মুখতারের এই দাবি অসার প্রমাণ করতে হজরত আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, "তুমি কুফায় রওনা হয়ে যাও। আমি তোমাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলাম।" এ কথা শুনে হজরত আবদুর রহমান বললেন, "সেখানে তো মুখতার রয়েছে।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তখন বললেন, "কিন্তু সে তো আমার অনুগত হিসেবেই নিজেকে দাবি করছে।"

এরপর যখন মুখতার হজরত আবদুর রহমানের আগমনের কথা শুনতে পারল তখন সে যায়েদা ইবনে কুদামাকে ৭০০ অশ্বারোহী সৈন্যের আমির বানিয়ে ৭০ হাজার দিরহাম দিয়ে বলল, "আবদুর রহমানকে এই দিরহামগুলো হাদিয়া দিয়ে ফেতর যেতে বলবে। কিন্তু তাতে যদি সে রাজি না হয় তাহলে তরবারির জোরে হলেও তাকে ফিরিয়ে দেবে।" এভাবে হজরত আবদুর রহমান যখন পথিমধ্যে এই নতুন এক অবস্থার মুখোমুখি হলেন তখন তিনি চুপচাপ ৭০ হাজার দিরহাম নিয়ে সোজা বসরায় ফিরে গেলেন, যা তখনো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধিদের আয়ত্তে ছিল। এভাবেই এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মুখতার যেকোনো মূল্যে স্বাধীন ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। আর বড়দের অধীনে ক্ষমতা পরিচালনা করার যেই বুলি সে আওড়ায় এটা ধোঁকা ছাড়া কিছুই না।[৩৮২] এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, মুখতার আরবদের বিপরীতে আজমিদের বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিল। কারণ আরবের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার ধোঁকা এবং মন্দ আকিদা সম্পর্কে অবগত ছিল। কিন্তু আজমিদের অনেকেই তার সম্পর্কে কিছু জানতো না। ফলে তাদেরকে বোকা বানানো তার জন্য ছিল অনেক সহজ। এই কারণেই মূলত মুখতার অনারবদের প্রাধান্য দিচ্ছিল।

---

[৩৮১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/২২
[৩৮২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৩২

আবদুল মালেক : দামেশকের নতুন শাসক

দামেশকের সিংহাসনে তখন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান সমাসীন ছিলেন। ৩১ বছরের এই যুবকে পূর্বাপর জীবনের মধ্যে অনেক বড় একটা ব্যবধান ছিল। কারণ পিতার সিংহাসনে বসার পূর্বে সে দিন-রাত কুরআন, হাদিস এবং ফিকহের জ্ঞান নিয়েই পড়ে থাকতেন। অনেক নফল এবং তেলাওয়াত ছিল তার দৈনন্দিনের রুটিন।[৩৮৩] কবিরা গুনাহ তো দূরের কথা, সামান্য সন্দেহজনক কাজ থেকেও থাকতেন অনেক দূরে। মারজে রাহাতে যখন বনু উমাইয়ার প্রায় সকল আমির নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন তখনো তিনি তাতে শরিক হননি। কারণ তার কাছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাই ছিল সন্দেহযুক্ত। তাই সাবধানতা এটাই ছিল যে, এসব আন্দোলনে যোগ না দেওয়া।[৩৮৪] কিন্তু যখন শাম এবং মিসরের ক্ষমতা তার হাতে চলে এলো তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে শরিয়তসম্মত খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারলেন না এবং যেকোনো উপায়ে তার ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন। এখান থেকেই বুঝা যায় যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষের ধ্যানধারণা কীভাবে পরিবর্তন করে দেয়।

হিজাজে আবদুল মালেকের অসফল অভিযান এবং মুখতারের ব্যর্থ ঘুঁটি চাল

আবদুল মালেক সুযোগমতো একটি বাহিনী হিজাজে প্রেরণ করল, যাদের প্রধান টার্গেট ছিল মদিনার উত্তর দিকে অবস্থিত 'ওয়াদিল কুরা' দখল করা। মুখতার যখন এই সংবাদ জানতে পারল তখন সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে সহযোগিতার বাহানায় হিজাজে নিজের

---

[৩৮৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/২৪৮

[৩৮৪] আনসাবুল আশরাফ : ৬/২৭০

বাহিনী প্রবেশ করাতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ একজন বার্তাবাহককে এই চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলো যে, "যদি আপনি ভালো মনে করেন তাহলে আমি এখান থেকে আপনার সহযোগিতার জন্য সৈন্য প্রেরণ করতে প্রস্তুত আছি।" যেহেতু তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগিতার অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল; তাই তিনি সাতপাঁচ না ভেবে চিঠির উত্তরে লিখলেন, "যদি তুমি আমার অনুগত হয়ে থাকো তাহলে তোমার এই প্রস্তাব আমার কাছে মোটেই খারাপ লাগার কথা নয়। তাই তুমি একটি বাহিনী ওয়াদিল কুরাতে পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা শামিদের মোকাবেলায় আমাদের সহযোগিতা করতে পারে।" এরপর তিনি হজরত আব্বাস ইবনে সাহাল রহ. কে নির্বাচিত দুই হাজার সৈন্য দিয়ে মদিনার সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই সাথে এই হেদায়েত দিলেন যে, "যদি মুখতারের সৈন্যরা আমাদের অনুগত থাকে তাহলে তো ভালো। নয়তো তাদের সাথে খুব সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। যেন ওরা আবার আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার সুযোগ না পায়।"

এদিকে মুখতার শুরাহবিলকে তিন হাজার সৈন্য দিয়ে প্রথমে মদিনা তারপর হিজাজ দখলের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে পাঠিয়ে দেয়। এরপর যখন শুরাহবিল তার সৈন্য নিয়ে মদিনার কাছাকাছি জায়গায় এলো তখন সেখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জেনারেল হজরত আব্বাস ইবনে সাহালের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। প্রথমে আব্বাস ইবনে সাহাল শুরাহবিলকে জিজ্ঞাস করলেন, "আপনি কি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুগত? "

হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা তার অনুগত। শুরাহবিলের এই উত্তর শুনে হজরত আব্বাস ইবনে সাহাল বললেন, "যদি তাই হয় তাহলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ হলো আমরা যেন ওয়াদিল কুরায় পৌঁছে শামের সৈন্যদের প্রতিহত করি।" তখন শুরাহবিল বলল, "কিন্তু আমাকে তো আমার আমির নির্দেশ দিয়েছেন প্রথমে মদিনায় পৌঁছতে। সেখানে গিয়ে তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমাদের পরবর্তী কাজ কী।"

হজরত আব্বাস ইবনে সাহাল বুঝে গেলেন মুখতারের আসল উদ্দেশ্য হলো হিজাজ দখল করা। তাই তিনি তখন কল্যাণের দিক চিন্তা করেই

আর কথা বাড়ালেন না। এরপর তারা সেখানেই অবস্থান করলেন। কিন্তু হঠাৎ রাতে হজরত আব্বাস ইবনে সাহাল একটি ভালো সুযোগ বুঝে মুখতারের বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালালেন। এতে শুরাহবিলসহ অনেক সৈন্য নিহত হলো। আর বাকি যারা বেঁচে ছিল দ্রুত ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল।[৩৮৫]

বসরা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা

মুখতার যখন পরাজয়ের এই সংবাদ শুনলো তখন খুব কষ্ট পেলো এবং তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তাই সে এবার টার্গেট করল ইরাকের দ্বিতীয় প্রধান নগরী বসরা। সেখানে সে মুসান্না ইবনে মুখাররিবার মাধ্যমে বিদ্রোহ করার চেষ্টা চালালো। কিন্তু সেখানকার আমিরগণ ছিলেন অনেক সজাগ ও সতর্ক। তাই সেখান থেকেও তাকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসতে হলো।[৩৮৬]

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে ব্যবহারে ব্যর্থ চেষ্টা

মুখতার বয়ান করে লোকদের মনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে শত্রুতা উসকে দিতো। সেইসাথে হিজাজ দখলের জন্য হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার সমর্থন ও অনুমতি নেওয়াকে একান্ত প্রয়োজন মনে করল। তা ছাড়া তখন পর্যন্ত হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মুখতারকে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে বেশ সহযোগিতা করে আসছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি মুখতারের গোলাম হয়ে যাননি। মুখতার তখন হিজাজে সৈন্য নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে একটি পত্র লিখে সালেহ ইবনে মাসউদের হাতে দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলো। সেখানে লেখা ছিল- "আমি আপনার সহযোগিতার জন্য মদিনায় কিছু সৈন্য পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছে। এখন আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি এখান থেকে আবারও কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেব এবং আপনিও দু'একজন পত্রবাহক পাঠিয়ে মদিনাবাসীদের বিষয়টি জানিয়ে দিন।"

---

[৩৮৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৩৩ তারিখুত তাবারি : ৬/৭১-৭৫

[৩৮৬] তারিখুত তাবারি : ৬/৬৬-৭০

কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া এই মিথ্যুকের পাতা ফাঁদে পা দিতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি উত্তরে লিখে দিলেন, "আমার কাছে অধিক প্রিয় কাজ হলো আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করা। তাই তুমি ভেতর এবং বাইরে আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে যাও। আর মনে রেখো, যদি আমার লড়াই করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে লোকেরা এমনিতেই আমার পাশে এসে জমা হয়ে যেতো। আমার সহযোগীও অনেক হয়ে যেতো। কিন্তু আমি নিজে এসব থেকে দূরে অবস্থান করব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করব যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনিই উত্তম সিদ্ধান্তকারী।" এরপর তিনি মুখতারের পত্রবাহককে বললেন, "মুখতারকে গিয়ে বলবে, সে যেন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং অন্যায় রক্তপাত বন্ধ করে।"[৩৮৭] এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেসব ঐতিহাসিক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে বিভেদের কথা বলে, তাদের মন্তব্যটা সঠিক নয়। কারণ মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া যদি চাইতেন তাহলে প্রথমেই প্রচুর লোকবল নিয়ে হিজাজে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু তার ইলম ও স্বভাবের কারণে তিনি এসব থেকে সবসময় দূরে অবস্থান করেছেন এবং ক্ষমতা এড়িয়ে চলেছেন।[৩৮৮]

---

[৩৮৭] তারিখুত তাবারি : ৬/৭৪, ৭৫ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৩৪

[৩৮৮] প্রসিদ্ধ আছে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে তার বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাকে কারাগারে বন্দি করে রাখলেন এবং তাকে হত্যা বা জীবিত আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মুখতারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। অতঃপর মুখতার ৭৮০ সৈন্য পাঠিয়ে দিল। যারা মক্কায় প্রবেশ করে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিল। তারিখুত তাবারি : ৬/৭৫, ৭৬, ৭৭

এই বর্ণনাটা হলো আবু মিখনাফের। যার দুর্বলতার ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া তার এই বর্ণনা সরাসরি সাহাবিগণের মতের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং আবু মিখনাফের মতো একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে সাহাবিগণের মতের উপর প্রাধান্য দেওয়া মূলনীতির পরিপন্থি। দ্বিতীয়ত, এটা আমাদের বিবেকও সমর্থন করে না। কারণ মাত্র ৭৫০ জন সৈন্য পূর্ণ হেজাজকে আবদ্ধ করে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে তারা নিরাপদে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে বের করেছে এটা স্বপ্নেও ঠিকঠাক ভাবা যায় না। তা ছাড়া মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার বর্ণনা থেকে এটা খুব ভালো করেই বুঝে আসে যে,

মুখতারের নবুওয়াতের দাবি

কুফার ক্ষমতা দখল এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে হত্যা করার পর মুখতারের প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেলো। ফলে সে তার থেকে আরো এক কদম আগে বেড়ে নবুওয়াতের দাবি করে বসল এবং বলতে থাকল, “আমার উপর হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম অহি নিয়ে আসেন।”[৩৮৯] সে তার এই দাবি সারা ইরাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করল, যাতে শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তার হাতে বাইয়াত হয়ে যায়। সে আরো আগে বেড়ে বলতে লাগল, যে আমার হাতে বাইয়াত হবে আমি তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল জিম্মাদারি নিয়ে নেবো। মুখতার নিজে অনেককে চিঠি পাঠিয়ে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করল। বিখ্যাত তাবেয়ি আখনাফ ইবনে কায়েস রহ. বসরার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুখতারকে সরাসরি কাজ্জাব–মিথ্যুক বলেই সম্বোধন করতেন। এসব জেনে মুখতার তাকে এই চিঠি লিখল, “আসসালামু আলাইকুম, বনু মুযার এবং রবিয়া গোত্রের অপদার্থ হে আখনাফ, তুমি নিজের গোত্রকে জাহান্নামের দিকে এমনভাবে নিয়ে যাচ্ছো, যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। কিন্তু আমি তো আর তাকদির পরিবর্তন করতে পারবো না। আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি আমাকে কাজ্জাব আখ্যা দিয়ে থাক। আমার পূর্ববর্তী নবীদেরকেও লোকেরা এমন মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে। আমি তো আর তাদের অনেকের থেকে খুব বেশি ভালো নই। তাই তুমি যদি আমাকে মিথ্যুকও বলো তাহলেও তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।”

এই চিঠি থেকে বুঝা যায় যে, মুখতার নিজেকে আসলে নবী বলেই মনে করতো এবং নিজেকে অনেক নবীর উপর প্রাধান্যও দিতো।[৩৯০] সে নিজের মুরিদদের সামনে বড় অদ্ভুত কথা বলতো। এমনকি সে এই দাবি করে বসল যে, সে গায়েবের সংবাদ জানে। যখন কোনো দেশ বা

সে বন্দি নয়; বরং নিজের ইচ্ছাতেই নির্জনবাসকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। আর মুখতারও তার জন্য কোনো সৈন্য প্রেরণ করেনি। সে অবশ্য অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে একবাক্যে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

[৩৮৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৫৪১

[৩৯০] তারিখুত তাবারি : ৬/৬৭-৭০

এলাকার সংবাদ তার কাছে আগে পৌঁছতো তখন সে তা অদৃশ্যজ্ঞান বলে মুরিদদের সামনে প্রকাশ করতো।

মুখতার এবং ইবনে যুবাইর রা. এর মাঝে প্রকাশ্য শত্রুতা

নবুওয়াতের দাবি করা এবং হাজারো মুরিদ সাথে থাকা সত্ত্বেও সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দলকেই ভারী দেখছিল; এবং সে যে হিজাজ ও বসরায় আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল, দুই স্থানেই তার স্পষ্ট পরাজয় ঘটেছিল। সেই সাথে তার এই ভয়ও ছিল যে, যেকোনো সময় আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ হত্যার প্রতিশোধ যেকেউ নিতে পারে। এজন্য মুখতার কমপক্ষে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে খুব বেশি সম্পর্কে জড়াতে চাচ্ছিল না। তবে সে তার থেকে আর্থিক সহযোগিতা এবং সম্পর্ক কিছুটা সহজ করার জন্য একবার পত্র লিখে পাঠাল, "আমি কুফাকে প্রধান নগরী বানিয়ে নিয়েছি। যদি আপনি এখানে আমাকে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে রাখেন এবং এক লাখ দিরহাম পাঠিয়ে দেন তাহলে আমি শামে আপনার বিরোধীদের উপর হামলা করে সবক'টাকে শেষ করে দেবো।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এই চিঠি পড়ে বললেন, "বনু সাকিফের এই মিথ্যাবাদী এবং আমার মাঝে এই চক্রান্ত ও চালাকির চাল আর কতো দিন চলবে!" এরপর তিনি মুখতারকে সরাসরি নিষেধ করে স্পষ্ট শব্দে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি তোকে একটা দিরহামও দেবো না।"[৩৯১] এভাবেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ও মুখতারের মাঝে প্রকাশ্য বিরোধিতার গোড়াপত্তন হয়।

মুখতারকে কেন কাজ্জাব বলা হতো?

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মুখতারকে এজন্য কাজ্জাব বলেছিলেন যে, এব্যাপারে তার মা হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. এই হাদিস শুনিয়েছিলেন, 'নিঃসন্দেহে বনু সাকিফের এক ব্যক্তি অনেক বড় মিথ্যুক এবং রক্তপিপাসু হবে।'[৩৯২] হজরত আসমাসহ এবং সে-

---

[৩৯১] আনসাবুল আশরাফ : ৬/৪৪৭

[৩৯২] সহিহ মুসলিম : ৬৬৬০

সময়কার প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের ধারণা এটাই ছিল যে, এই মুখতারই বনু সাকিফের সেই কাজ্জাব। সেই কারণেই মুখতারের জীবদ্দশাতেই তার উপাধি কাজ্জাব প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে নিজের বয়ানে প্রায়ই বলতো, "যদি আমি মুহাম্মদ সা. এর পরিজনদের হত্যার প্রতিশোধ না নিই তাহলে আমি তেমনই কাজ্জাব যেমনটা লোকে এখন আমাকে বলে।"[৩৯৩]

ইরাকে মুসআব ইবনে যুবাইরকে গভর্নরের দায়িত্ব

মুখতারের হাতে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবং হুসাইন ইবনে নুমাইরের মৃত্যুর পর শামবাসীদের ক্ষমতা ও সাহসে বিশাল ফাটল ধরলো। সেইসাথে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও কমে গেলো। এজন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শামবাসীদের পক্ষ থেকে খুব দ্রুতই কোনো আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন না। তাই এটাই ছিল মুখতারকে শেষ করে দেওয়ার সঠিক সময়। কারণ নবুওয়াতের দাবি করার পর তাকে আর বেশি ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ শরিয়তে ছিল না। অপরদিকে এই আশঙ্কাও ছিল যে, যদি বেশি দেরি হয়ে যায় তাহলে মুখতার নিজেও বসরায় আক্রমণ করে নিজের অধিকারে নিয়ে নেবে। আর পূর্ণ ইরাক তখন হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এই গুরুভার নিজ ভাই হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করলেন এবং তাকে বসরার গভর্নর বানিয়ে দিলেন। যাতে পূর্ণ ইরাক এই প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা এবং মন্দ বিশ্বাসের এই তুফান থেকে মুক্তি পায়। তা ছাড়া মুসআব ইবনে যুবাইর আরবের প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী, সৌন্দর্যে অনন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুপম এবং দানশীলতা ও উদারতায় প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।[৩৯৪]

মাজারের চূড়ান্ত যুদ্ধ

কুফার যেসব এলাকা মুখতারের দখলে ছিল সেখানকার জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মুখতার থেকে দূরে সরে আসছিল। তখন মুখতারের সাথে শুধু

---

[৩৯৩] তারিখুত তাবারি : ৬/৫৭

[৩৯৪] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৫৭ সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/১৪১

ছিল গোলাম, মূর্খ ও চাকরবাকর ধরনের লোকজন। তারাই কেবল মুখতারের অনুগত ছিল এবং তার গুণগান গাইতো। এরপর হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর যখন বসরায় পৌঁছলেন তখন কাদিসিয়া থেকে মুহাম্মদ ইবনুল আশআস এবং কুফা থেকে শাবাস ইবনে রিবয়িসহ ইরাকের বেশ কিছু সম্মানিত ব্যক্তি তার সাথে এসে যোগ দিলেন। এ ছাড়া অনেক সাধারণ মুসলমানও তার সাথে মিলিত হলো। খোরাসানের বিখ্যাত বিজয়ী মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরাও এসে যোগ দিলেন তাদের সাথে। যদিও প্রথমে তিনি আসতে চাননি; কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আশআস নিজে গিয়ে তাকে মুখতারের নারী ও শিশু-নির্যাতনের বর্ণনা শোনান। ফলে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

এ অবস্থায় মুখতার প্রায় ২০ হাজারের একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে আহমার ইবনে শুমাইত এবং আবু উমারার নেতৃত্বে বসরায় আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে দিলো। মুসআব ইবনে যুবাইর খোলা ময়দানে তাদের সাথে লড়াই করলেন। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ওয়াসেত এবং বসরার মাঝামাঝি এবং বসরা থেকে চার মঞ্জিল সামনে মিসানের নিকটবর্তী অঞ্চল মাজারে সংঘটিত হয়েছিল। এখানেই রয়েছে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে উবাইদুল্লাহ এবং মুসআব ইবনে যুবাইরের মাজার।[৩৯৫] হজরত মুসআব ইবনে যুবাইরের সাথিরা আগে বেড়ে একেবারে মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে গেল। একপর্যায়ে মুখতারের সেনাপ্রধান আহমার ইবনে আবু শুমাইত এবং আবু আমারা উভয়েই নিহত হলো। আর যারা বেঁচে ছিল তারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে দ্রুত ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল। হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর তবু থামলেন না। কারণ তিনি এই যুদ্ধের শেষটা দেখার অপেক্ষায় ছিলেন। তাই সকলেই কুফি-সৈন্যদের ধাওয়া করতে থাকল। এরপর ওয়াসেতে পৌঁছতেই সামনে পড়ল ফুরাত নদী। তারা সেই নদী অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নিয়ে কুফার দিকে এগোতে থাকল। মুখতারের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন সে নদীর পানি ডানে বামে ছেড়ে দিয়ে বাঁধ আটকে দিলো। ফলে অল্পসময়েই পূর্ণ নদী হয়ে পড়ল পানিশূন্য। হজরত মুসআব ইবনে

---

[৩৯৫] মু'জামুল বুলদান : ৫/৮৮

যুবাইরসহ কয়েকজন সেনানায়ক দ্রুত ঘোড়া নিয়ে বাঁধের কাছে গিয়ে বাঁধ ছেড়ে দিলেন এবং শেষপর্যন্ত কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। মুখতার বাধ্য হয়ে নিজের সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এলো। এখানে পুনরায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এখানে মুহাম্মদ ইবনে আশআস শহিদ হয়ে গেলেন। কিন্তু মুখতার ও তার বাহিনী বেশিক্ষণ ময়দানে টিকতে পারল না। এভাবেই হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর শহর নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন।

মুখতার কিছুদিন রাজপ্রাসাদে ঘাঁটি বানিয়ে অবস্থান করল। তার অধিকাংশ সাথি-সঙ্গী পূর্বেই যেহেতু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; তাই মুখতারকে জব্দ করা খুব কঠিন কিছু ছিল না। হজরত মুসআব প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে কড়া বেষ্টনী দিয়ে রাখলেন, যাতে মুখতার খাবারদাবার না পেয়ে হাতিয়ার ফেলে দেয় এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু শহরের অনেক মহিলাই মুখতারের আকিদায় বিশ্বাসী ছিল। তারা গোপনে গিয়ে তাকে খাবার দিয়ে আসতো। এরপর এই সংবাদ যখন মুসআব ইবনে যুবাইর জানতে পারলেন তখন প্রাসাদের আশপাশে মহিলাদের আনাগোনা একদম বন্ধ করে দিলেন। এভাবে যখন তারা চরম খাদ্যসংকটে পড়ল তখন তারা পরস্পর মরণপণ লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তখনো তার অনেক অনুসারীই হাতিয়ার রেখে দিতে চাইলো এবং মুখতারকেও এই পরামর্শ দিলো। কিন্তু মুখতার তাদের কথা শুনলো না। উলটো বলতে থাকল, লড়াই করতে করতে মরে যাওয়াই ভালো। কারণ সে ভালো করেই জানতো যে, যেই অপরাধ সে করেছে এর শাস্তি মৃত্যু ছাড়া কিছুই না। এজন্যই সে সাথিদের নিয়েই মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরপর সে যখন দুর্গ থেকে বের হলো তখন হঠাৎই তার বুকের কথা মুখে এসে গেলো। সে বলতে লাগল, "আমিও একজন আরব বংশোদ্ভূত। আমি যখন দেখলাম ইবনে যুবাইর হিজাজে এবং নাজদা খারেজি ইয়ামামায় আর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান শামে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল। তখন আমারও চিন্তা এলো যে, আরব হিসেবে তাদের চেয়ে কোনো অংশে আমি কম নই। এজন্য আমিও কয়েকটি শহর নিজের দখলে এনেছি।" মুখতার নিজেই তার

মৃত্যুর আগে একথা স্বীকার করে গেছে যে, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা অর্জন। এবং একারণেই সে এই সবকিছু করেছে। এরপর সে মাত্র ১৯ জন সাথি নিয়ে দুর্গ থেকে বের হয় এবং লড়াই করতে করতে মৃত্যু বরণ করে। লড়াই শেষ হওয়ার পর মুসআব রহ. যখন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন তখন মুখতারের কাটামাথা তার সামনে উপস্থাপন করা হলো। এই ঘটনাটা ঘটেছিল ৬৭ হিজরির ১৪ রমজান। সেসময় মুখতারের বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।[৩৯৬] এভাবেই বিদায় নিলো আরো একজন মন্দ মানুষ। মুক্তি পেলো পৃথিবী। নীরবে নিলো সুখের শ্বাস। মুখতার এমন থাকা সত্ত্বেও তার হাতে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের যে পরিণাম হয়েছিল, তা সত্যি অবিশ্বাস্য। ইতিহাসে এর বাস্তবতা নবীজির একথাতেই পাওয়া যায়, "নিশ্চয় আল্লাহ তার এই দীনের সহযোগিতা মন্দ লোকের দ্বারা নিতে পারেন।"[৩৯৭]

ইবরাহিম এবং মুসআব

মুখতারের সিপাহসালার ইবরাহিম ইবনে মালেক তখন মুসেলে অবস্থান করছিল। সে ছিল অনেক অভিজ্ঞ জেনারেল। মুখতারের আসল শক্তির উৎসই মূলত সে ছিল। উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকেও সে পরাজিত করেছিল। অবশ্য সে অন্যান্য মূর্খের মতো মুখতারের অন্ধভক্ত ছিল না। বরং রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য তার সাথে ছিল। তা ছাড়া সে যে মুখতারকে মোটেই সহ্য করতে পারতো না, তার প্রমাণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, মুখতার যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল তখন সাথে যেই কারামতি কুরসিটা দিয়ে দিয়েছিল। সেটা নিয়ে মানুষের আগ্রহ দেখে বলতে লাগল, "হে আল্লাহ, আমাদের এই মূর্খ লোকগুলোর কাজের কারণে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়ো না। আল্লাহর শপথ, এ তো ছিল বনি ইসরাইলের রুসুম। তারাও তাদের বাছুরের আশপাশে একত্র হয়ে এমনই করতো।[৩৯৮]

---

[৩৯৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৯০-১১০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৫৫-৬২, ৭১-৭২

[৩৯৭] সহিহ বুখারি : ৪২০৩ সহিহ মুসলিম : ৩১৯

[৩৯৮] তারিখুত তাবারি : ৬/৮২

মুখতারের মৃত্যুর পর দামেশকের আবদুল মালেক এবং কুফার মুসআব ইবনে যুবাইর এই দুজনের ইচ্ছা ছিল ইবরাহিমকে নিজেদের দলে এনে শক্তি আরো সমৃদ্ধ করা। এক্ষেত্রে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ইবরাহিমকে এই প্রস্তাব দিলো যে, আপনি আমার অধীনে এসে ইরাকের যতগুলো অঞ্চল জয় করতে পারবেন, সবক'টির ক্ষমতা আপনারই থাকবে। কিন্তু ইবরাহিম আবদুল মালেকের উপর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে প্রাধান্য দিয়ে কুফায় এসে হজরত মুসআবের সাথে যোগ দিলেন। হজরত মুসআব তাকে কুফার সেনাপ্রধান বানিয়ে দিলেন। আর তার স্থানে অর্থাৎ মুসেল এবং আলজাজিরায় মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরাকে নিযুক্ত করলেন।[৩৯৯]

---

[৩৯৯] তারিখুত তাবারি : ৬/১১০, ১১১ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৭২-৭৪ তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৬৬, ৬৭

খারেজিদের উপদ্রব

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে অনেক বড় একটি শক্তি তার বিরুদ্ধে ছিল। এই শক্তির নাম হলো খারেজি সম্প্রদায়। হিজাজ থেকে নাজ্‌দ, ইয়ামামা থেকে বাহরাইন এবং ইরাকের কুফা ও বসরা থেকে পারস্যের সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত খারেজিদের তৎপরতা বিস্তৃত ছিল। খারেজিরা বনু উমাইয়া এবং নবী-পরিবারেরও শত্রু ছিল। তাদের বিশ্বাসমতে যারা হজরত উসমান, হজরত আলি এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের প্রতি ভালো ধারণা রাখে তারা পথভ্রষ্ট। এমনকি তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ইয়াজিদ যখন সৈন্য মোতায়েন করছিল তখন তাদের নেতা নাজদা ইবনে আমের, নাফে ইবনুল আযরাক এবং আবদুল্লাহ ইবনে ইবায কিছু সময় পর্যন্ত এই ভেবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গ দিয়েছিল যে, তিনি হজরত উসমানসহ সকল খলিফার বিরুদ্ধে। কিন্তু যখন তারা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখ থেকে এমন কিছু শুনতে পেলো না তখন একদিন জিজ্ঞাসাই করে বসল, "হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বলেছিলেন, "আমি তাকে জীবিত অবস্থায়ও মহব্বত করেছি, আর এখন ইনতেকালের পরেও মহব্বত করি।" খারেজিরা এই উত্তর শুনে তার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।[৪০০]

---

[৪০০] তারিখে খলিফা লিইবনে খাইয়াত : ২৫৩; খলিফা ইবনে খাইয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনাটা ঘটেছিল হুসাইন ইবনে নুমাইরের সাথে লড়াই করার পর। আর বালাযুরির বর্ণনামতে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে যখন খারেজিদের কাছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর মতাদর্শটা স্পষ্ট হয়ে গেলো তখন তাদের সবচেয়ে বড় নেতা নাফে ইবনে আযরাক যুদ্ধের মাঝখানেই চলে গেলো। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর কোনো পরোয়াই করেননি। আনসাবুল

জাজিরাতুল আরবের খারেজি সম্প্রদায়

এই বিচ্ছিন্নতার পর থেকেই খারেজিরা মূলত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন মাত্র খেলাফতের মসনদে আরোহণ করেছেন তখনই তারা লড়াই করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তখন তারা মূলত দু-দলে বিভক্ত ছিল। তাদের একদলের নেতা নাফে ইবনে আযরাক ইরাকে গিয়ে আত্মরক্ষাব্যূহ বানিয়ে নেয়। অন্যদলটি ইয়ামামায় আবু তালুতের অধীনে আন্দোলন শুরু করে। আবু তালুতই প্রথম ৬৫ হিজরিতে জাজিরাতুল আরবে লুটপাট ও আক্রমণের ধারা অব্যাহতভাবে চালাতে থাকে। এরপর ৬৬ হিজরিতে আবু তালুতের স্থানে নিয়োগ হলো নাজদা ইবনে আমের। সে গোত্রীয় সরদারদেরকে জায়গায় জায়গায় পরাজিত করার পর ৬৭ হিজরিতে বাহরাইন এবং ইয়ামামাও নিজের দখলে নিয়ে নেয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তখন ইরাকের যুদ্ধ ও শামিদের হুকুমতের বিরোধিতায় এমনভাবে লিপ্ত ছিলেন যে, নাজদার এসব কাজের প্রতি তেমন দৃষ্টি দিতে পারছিলেন না। এভাবে ৬৯ হিজরিতে নাজদার শক্তি ও ক্ষমতা এত শক্ত-পোক্ত হয়ে গেলো যে, সে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের মতো ৮৬০ জন সঙ্গী নিয়ে হজ আদায় করতে মক্কায় চলে এলো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ৭০ হিজরিতে নাজদার ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। খারেজিদের কয়জন আমির তার বিরোধী হয়ে উঠল। ফলে এতে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলো। [৪০১]

ইরাকি খারেজিদের উপদ্রব

ইরাকের খারেজিরা নাফে ইবনুল আযরাকের নেতৃত্বে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। নাফে ইবনুল

আশরাফ : ৫/৩১৭; কেউ কেউ হজরত আলি রা.-এর খেলাফতকে সাবায়িদের অনুদান মনে করে আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর খেলাফতকে খারেজিদের অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ খেলাফত ভাবে। অথচ খারেজিরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর সাথে খুবই অল্পসময় ছিল। আর কোনো খেলাফত অবৈধ হওয়ার দলিল যদি এটাই হয় তাহলে উমাইয়া বংশের সবচেয়ে উত্তম খলিফা হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর খেলাফতও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ খারেজিরা তারও অনুগত ছিল।

[৪০১] আল-কামিল ফিততারিখ : ৬৫ হিজরির আলোচনাধীন। তারিখে ইবনে খালদুন : ৩/৩৮৫-৩৮৭ তারিখুত তাবারি : ৬৫ হিজরি থেকে ৭২ হিজরির আলোচনাধীন।

আযরাকের দিকে লক্ষ রেখেই এই দলকে 'আযারিকা' বলা হয়। ৬৫ হিজরিতে বসরার যুদ্ধে নাফে যদিও মৃত্যুবরণ করেছিল; কিন্তু তার দলটি আপন অবস্থাতেই চলছিল। আমির পরিবর্তন হতো আর সরকারি সৈন্যদের মোকাবেলা করতে গিয়ে মারা যেত। খারেজিরা তখন আহওয়াজ এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। সেখানে জোরপূর্বক তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে।[৪০২] ইরাকের খারেজিদের উপদ্রবের কারণে বসরার আবাদ অঞ্চলগুলো চরম আতঙ্কের মধ্যে ছিল। তাই হজরত আখনাফ ইবনে কায়েস রহ. -সহ বসরার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরাকে তাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য আবেদন করল। তখন মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা খোরাসানের দায়িত্বশীল ছিলেন। এরপর তাকে ইরাকে ডেকে আনা হলো এবং প্রচুর সৈন্য দিয়ে এই যুদ্ধে পাঠানো হলো। সেখানে বেশ কিছু যুদ্ধ হলো। উভয় দলেরই অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হলো। তবে সবশেষে খারেজিদের প্রায় ৪৮০ জনের মৃত্যুর পর তারা পিছু হটতে থাকল এবং বসরা ছেড়ে পারস্যের দিকে পালালো।[৪০৩] এরপর প্রায় তিন বছর নিরাপত্তা বজায় ছিল। ৬৭ হিজরিতে মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরাকে আজারবাইজান, আলজাজিরা এবং মুসেলের আমির নিযুক্ত করে দিলেন।[৪০৪] তার চলে যাওয়াতে খারেজিরা আবার সুযোগ পেয়ে বসল এবং ইরাকের পুরো শাসনব্যবস্থা অনিরাপদ ও বিচ্ছৃঙ্খল করে তুলল।[৪০৫]

খারেজিরা আসলে এক স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা এক জায়গায় পরাজিত হলে অন্য জায়গায় গিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাতো। মাদায়েনের স্থানীয়দের উপর তারা এমন অত্যাচার চালালো যে, তাতে জমিন কেঁপে উঠল। নারী ও শিশুদেরকে বড় নির্দয়ভাবে নির্বিচারে হত্যা করে চললো। গর্ভবতীদের পেট ফেঁড়ে ফেলা হতে

---

[৪০২] তারিখে খলিফা লিইবনে খাইয়াত : ২৫৬, ২৫৭ তারিখুত তাবারি : ৫/৬১৩-৬১৫
[৪০৩] তারিখুত তাবারি : ৫/৬১৫-৬১৯ তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪১
[৪০৪] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৬২
[৪০৫] তারিখুত তাবারি : ৬/১১৯, ১২০

লাগলো। অনুরূপ কাজ তারা সাবাতেও প্রদর্শন করল।[৪০৬] তবে ইসপাহানে তাদের লজ্জাজনক পরাজয় হলো। তাদের সরদার ইবনে মাহুয মারা গেলো। খারেজিরা তখন কুকুরের মতো দৌড়ে পালালো। আর তাদের সকল সহায়-সম্পত্তি হুকুমতের আওতায় চলে গেলো। কিন্তু এরা মনে হয় আশ্চর্য কোনো মাটির তৈরি। সরদারের মৃত্যুর পরও তাদের ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। তারা ইবনে মাহুযের পর পুনরায় কাতারি ইবনে ফুজাআ নামক এক আরব যোদ্ধাকে নিজেদের আমির বানিয়ে নিলো। যিনি খারেজিদেরকে নিয়ে জায়গায় জায়গায় আবার লুটপাট শুরু করে দিলো। অবস্থা এমন বেগতিক দেখে হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. আবার মুহাল্লাবকে খারেজিদের নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য পাঠাল। মুহাল্লাব তাদের সাথে টানা আট মাস যুদ্ধ চালিয়ে গেলো।[৪০৭]

জারিফের মহামারি

এদিকে বসরা এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ব্যাপক মহামারি দেখা দিলো। এই মহামারিকে 'তাউনে জারিফ' নামেই স্মরণ করা হয়। এই মহামারির প্রকোপে প্রচুর মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশের প্রায় ৭০-৮০ জন শিশু এর শিকার হয়েছিল। বসরায় তখন এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং চর্তুদিকে নেমে এসেছিল নীরবতা ও নিস্তব্ধতার এক কালো অধ্যায়। তখন জুমআর নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে শুধু সাতজন মুসল্লি ছিল। মৃতদের কাফন-দাফন দেওয়ার মতো তেমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন বসরার শাসকের মা মারা গেলো তখন জানাজাটা কাঁধে নেওয়ার জন্য শুধু চারজন মানুষ পাওয়া গিয়েছিল।[৪০৮] এই সময় হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর সৈন্যশক্তি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হলো। কারণ তার অধিকাংশ অভিজ্ঞ ও বড় বড় গভর্নর এবং সেনাপ্রধান বসরাতেই অবস্থান করছিলেন।

---

[৪০৬] তারিখুত তাবারি : ৬/১২১

[৪০৭] তারিখুত তাবারি : ৬/১২৩-১২৭ এই সময়েই হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হন।

[৪০৮] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৬৬

আমর ইবনে সাঈদকে হত্যা

দামেশকে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেকড় উপড়ে ফেলার অপেক্ষায় ছিল। সে বড় রাজনীতিবিদ, দূরদর্শী, সুযোগসন্ধানী ও ক্ষমতালিপ্সু ছিল। সে বনু মারওয়ানকে নিজের অনুগত বানানোর জন্য ভেতরগত সকল সমস্যা চুকিয়ে ফেলেছিল। জাবিয়ার সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তমূলক অঙ্গীকার অনুযায়ী মারওয়ানের পর খলিফা হওয়ার কথা ছিল খালেদ ইবনে ইয়াজিদ এবং তারপর আমর ইবনে সাঈদ আল আশদাক। কিন্তু মারওয়ান নিজের ক্ষমতা কিছুটা পাকা-পোক্ত করে নিজের ছেলে আবদুল মালেক এবং আবদুল আজিজকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে দেয়।

খালেদ ইবনে ইয়াজিদ স্বভাবগত নম্রতার কারণে যদিও চুপ ছিল; কিন্তু আমর ইবনে সাঈদ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সে স্পষ্টভাবে আবদুল মালেক থেকে নিজের অধিকার দাবি করে বসল, যেন তাকে খলিফা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আবদুল মালেক যখন তার এসব কথায় কান দিলো না তখন সে জোরপূর্বক দামেশকের দুর্গ নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়। এটা ৬৯ হিজরির শেষদিকের ঘটনা। আবদুল মালেক তখন দেখল যে, বিষয়টা ভিন্ন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে তখন সে সাঈদকে খলিফা বানানোর অঙ্গীকার করে কোনোরকম মানিয়ে নিলো। এরপর একদিন সুযোগমতো সাঈদকে নিজের প্রাসাদে এনে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করে ফেললো।[৪০৯] হত্যা করার পূর্বে আবদুল মালেক তাকে বলেছিল, "যদি আমার ধারণা এমন হতো যে, তুমি জীবিত থাকা অবস্থাতেও আমার আত্মীয়তার সম্মান রক্ষা করবে তাহলেও আমি তোমাকে মাফ করে দিতাম। কিন্তু বাস্তবতা হলো একটি পালে দুটি ষাড় কখনো একত্র হতে পারে না। একটা আরেকটাকে সরিয়ে তারপরই থামে।" এই ঘটনা ৭০ হিজরির শুরুর দিকের।[৪১০] বনু উমাইয়ার এই বড় রাজনীতিবিদ ইতিহাসের পাতায় কিছু জমা না রেখেই নিজেদের তরবারির লক্ষ হয়ে হাজারো আফসোস নিয়ে মৃত্যুবরণ করল।

---

[৪০৯] তারিখুত তাবারি : ৬/১৪০-১৪৭ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১১৪-১২০

[৪১০] তারিখে খলিফা : ২৬৬

খোরাসানের অবস্থা

ইরাকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত খোরাসানের আমিরদের সাথে রক্তপাতের ধারা অব্যাহতভাবেই চলছিল। এরপর যখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. খলিফা হলেন তখন খোরাসানের হাকিম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম তার আনুগত্য মেনে নেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের পূর্ণ সময়কাল ধরে তিনিই খোরাসানের আমির ছিলেন। দক্ষিণ আফগানিস্তানে—যাকে সিজিস্তান বলা হয়—হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান আবদুল আজিজকে আমির নিযুক্ত করা হয়। আবদুল আজিজের আগমনের পর মুসলমানগণ যারাঞ্জ-এর রণাঙ্গনে রুতবিলের সাথে যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে রুতবিল নিহত হয় এবং পারসিকরা পিছপা হয়ে যায়।[৪১১] এই ছিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়কালে খোরাসানের সংক্ষিপ্ত চিত্র।

---

[৪১১] ফুতুহুল বুলদান : ৩৮৫

আবদুল মালেক ও মুসআব ইবনে যুবাইরের মধ্যকার বিরোধ

ভেতরের শত্রুদেরকে পূর্ণমাত্রায় দমন করে বাইরের শত্রু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং তার ভাই হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে মনোনিবেশ করল। আবদুল মালেক একথা ভালো করেই জানতো যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মূল শক্তি হলো ইরাক। তাই সে প্রথমে ইরাকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। এজন্য সে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রোমানদের সাথে প্রত্যেক সপ্তাহে এক হাজার দিনার আদায়ের বিনিময়ে সন্ধি করে নিলো।[৪১২] এই পদ্ধতিটা সাহাবিদের নিয়ম-নীতির সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। কারণ হজরত মুয়াবিয়া রা. এমন অবস্থায় হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মিলে রোমানদের উপর আক্রমণের আশা প্রকাশ করেছিল। আর তাতেই রোমানরা ভয় পেয়ে পিছু হটে গিয়েছিল। আবদুল মালেকের এই চুক্তির ব্যাপারে হাফেজ জাহাবি রহ. বলেন, "এটাই প্রথম ফাটল ছিল, যা ইসলামি ইতিহাসে প্রবেশ করল। আর এর কারণ শুধু ছিল পারস্পরিক মতানৈক্য।"[৪১৩]

ইরাকের আমিরদের সাথে আবদুল মালেকের গোপন চাল

আবদুল মালেক এখন হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জেনারেলদের সাথে চালবাজি শুরু করল। প্রথমে আবদুল মালেক প্রথম সারির আমির—পারস্যের হাকিম মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা, খোরাসানের হাকিম আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম এবং কুফার সিপাহসালার ইবরাহিম ইবনে মালেককে নিজের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের কেউই আবদুল মালেকের ডাকে সাড়া দিলো না।[৪১৪]

---

[৪১২] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫০

[৪১৩] আলইবার ফি খাবরি মান গাবার : ১/৫৮

[৪১৪] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৭, ১৭৬ আনসাবুল আশরাফ : ৭/৮৫

এরপরও আবদুল মালেক জানতো যে, ইরাকিদের শরীরে গাদ্দারির রক্ত আছে এবং তাদের অনেককেই খুব সস্তায় কিনে ফেলা যায়। সেজন্য সে ৭১ হিজরিতে নিজের এক প্রতিনিধিকে গোপনে তার পক্ষে বাইয়াত গ্রহণের জন্য পাঠায়।[৪১৫] সেসময় হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. হিজাজে গিয়েছিলেন।[৪১৬] তার অনুপস্থিতিতে বসরার অনেক আমিরই আবদুল মালেকের আহ্বানে সাড়া দেয়। এরপর এসব কথা যখন হজরত মুসআব রহ.-এর কাছে পৌঁছল, তিনি দ্রুত বসরায় ফিরে এলেন এবং আবদুল মালেকের দিকে ঝুঁকে যাওয়া আমিরদের খুব শাসালেন।[৪১৭]

বেঁকে বসল ইরাকের আমিরগণ

আবদুল মালেক ইরাকের আমিরদের বিশ্বস্ততাকে এক এক করে কিনে ফেলছিল। আর তারাও আবদুল মালেকের কাছে গোপন চিঠি চালাচালি করে খুব সস্তায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল।[৪১৮] তাদের কয়েকজন ছিল বংশীয় সূত্রে আমির। আর কেউ কেউ ছিল বনু উমাইয়ার সময়কাল থেকেই সরকারি অঙ্গীকারে আবদ্ধ। তারা হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং পূর্ব সম্পর্ক সব ভুলে গাদ্দারি করে বসল। আবদুল মালেক হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর ডান হাত ইবরাহিমের কাছেও একটি সিলমোহর-করা চিঠি পাঠিয়েছিল। হজরত ইবরাহিম সেই চিঠি পেয়ে নিজে না পড়ে অঙ্গীকার রক্ষার প্রমাণ দিতে গিয়ে সরাসরি হজরত মুসআব রহ.-এর হাতে তুলে দেন। সেই চিঠিতে ইবরাহিমকে শামের হুকুমতের সাথে মিলে যাওয়ার পরিবর্তে ইরাকের গভর্নরের দায়িত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার ছিল। হজরত ইবরাহিম তখন মুসআব রহ. কে বললেন, "এই ধরনের চিঠি ইরাকের সকল আমিরকেই দেওয়া হয়েছে।" তাই ইবরাহিম হজরত মুসআবকে এই পরামর্শ দিলেন যে, "যদি আমার কথা ভালো মনে করেন তাহলে সেইসব আমিরকে হত্যা করে ফেলুন।"

---

[৪১৫] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৪

[৪১৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৩৫

[৪১৭] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৪

[৪১৮] আনসাবুল আশরাফ : ৭/৮৫

হজরত মুসআব রা. তখন বললেন, "যদি আমরা এটাই করি তাহলে তাদের গোত্রের লোকেরা আমাদের থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে।"

"আচ্ছা! তাহলে অন্তত তাদেরকে কিসরার শ্বেতপ্রাসাদে বন্দি করে রাখুন।" হজরত ইবরাহিমের এই পরামর্শ হজরত মুসআব রহ. শুনলেন। কিন্তু তার স্বভাবগত সম্ভ্রান্ততা এবং মানবতার খাতিরে একসময় এই পরামর্শও গ্রহণ করতে পারলেন না। তবে একথা হজরত মুসআব ভালো করেই বুঝতে পারলেন যে, ইবরাহিম নিজেও গাদ্দারদের প্ররোচনায় ফেঁসে গেছে এবং যেকোনো সময় ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে।[৪১৯]

৭১ হিজরির এই সময়ে হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর অবস্থা সমুদ্রে পড়ার মতো ছিল। কারণ একে তো জারিফের মহামারিতে তার সেনাশক্তিতে অনেক ধস নেমেছিল। অপরদিকে যারা বেঁচে ছিল, তারা পারস্যে খারেজিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আর এখন নিজ আমিরদের গাদ্দারি নতুন করে যোগ হলো। সেইসাথে তখন বাহরাইনে নাজদা ইবনে আমেরের স্থানদখলকারী আবু ফুদাইক খারেজির দল মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. এই বেহাল দশায় ইরাক থেকে কিছু সৈন্য কমিয়ে খারেজিদের পরাজিত করার জন্য বাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন ছিল। অবশেষে তারা জুওয়াসার ময়দানে পরাজিত হলো।[৪২০] ফলে হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শক্তি আরো একবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো।

ইরাকে আবদুল মালেকের চূড়ান্ত আক্রমণ

সর্বোপরি আবদুল মালেক যখন হজরত মুসআব রহ. এর বিরুদ্ধে ইরাকের সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ণ আশ্বাস পেলো তখন সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দামেশক থেকে ইরাকের দিকে যাত্রা করল। পথিমধ্যে ছিল আলজাজিরার শহর 'কারকিসিয়া'। সেখানে তখন নিযুক্ত ছিল

---

[৪১৯] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৭

[৪২০] তারিখে খলিফা : ৬২৭

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুগত যুফার ইবনে হারেস। নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্য এই শহরটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই আবদুল মালেক ৪০ দিন পর্যন্ত শহরটি ঘেরাও করে রেখে বিজয় ছিনিয়ে আনলো।[৪২১] আর ৭২ হিজরিতে ইরাক-সীমান্তে নিজেদের তাঁবু গাড়লো।[৪২২] এই এলাকাটা দজলা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ইরাকের শহরতলী তিকরিতের মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল। এখানেই 'দায়রে জাসালিক'-এর সেই ঐতিহাসিক ময়দান অবস্থিত, যেখানে আবদুল মালেক এবং হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর মাঝে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।[৪২৩] হজরত মুসআব রহ. সৈন্য নিয়ে পূর্ণপ্রস্তুত হয়ে রওনা করে দিলেন এবং 'বাজুমাইরা' নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন। সেসময় সেনাপ্রধান ইবরাহিম ইবনে মালেক ছাড়া বাকি সকল আমিরই আবদুল মালেকের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছিল। খোরাসানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধি আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম রহ. যখন এই যুদ্ধযাত্রার কথা শুনলেন তখন অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা! মুসআবের সাথে কি উমর ইবনে আবদুল্লাহ গিয়েছে?" উত্তর পেলেন, "না। সে তো এখন পারস্যে।"

"আচ্ছা! তার সাথে কি মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা গিয়েছে?"
"না। সে তো এখন মুসেলে।"
"আচ্ছা! তাহলে তার সাথে কি আব্বাদ ইবনে হুসাইন গিয়েছে?"
"না। সে তো এখন বসরায় অবস্থান করছে।"
এরপর আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম খুব আফসোস করে বললেন, "আর আমি এখন আছি খোরাসানে।"

অতঃপর তিনি একটি পঙ্ক্তি পড়লেন, (অর্থ) "নাও, আমাকে ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাও, এবং এমন ব্যক্তির মৃতদেহের সুসংবাদ গ্রহণ করো, আজকে যার সাথে কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৪২৪]

---

[৪২১] আনসাবুল আশরাফ : ৭/৪১-৪৯
[৪২২] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৭
[৪২৩] আররাওজুল মাতার : ২৫১
[৪২৪] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৮

হজরত মুসআব রহ.-এর শাহাদাত

হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. পাগড়ি বেঁধে সৈন্যবাহিনীর একেবারে সামনে চলে এলেন। তিনি খুব ভালো করে ডানে-বাঁয়ে লক্ষ করলেন এবং সৈন্য ও সেনাপ্রধান ভাগ্যলিপি খুব স্পষ্টই দেখে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি যা বুঝার বুঝে নিলেন। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এর উত্তরাধিকার উরওয়া রহ.-এর উপর। তিনি তাকে কাছে ডাকলেন এবং কারবালার ময়দানে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনা শুনতে চাইলেন। এরপর উরওয়া যখন হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব, সাহসিকতা ও বুক টান করে হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের বর্ণনায় এলেন তখন হজরত মুসআব রহ. এই পঙ্ক্তি আবৃত্তি করলেন, (অর্থ) "নিশ্চয় 'তফ' নামক স্থানে অর্থাৎ কারবালায় বনু হাশেম একটি ইতিহাস তৈরি করেছেন এবং সম্ভ্রান্তদের জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন।"

এই পঙ্ক্তি শুনে উরওয়া বুঝতে পারলেন, পরাজয়ের বেলায় তিনি পলায়নের চেয়ে শহিদ হয়ে যাওয়াকেই প্রাধান্য দেবেন।[৪২৫]

সর্বশেষ ৭২ হিজরির ১৩ জুমাদাল উলায় 'দায়রে জাসালিক' ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ও দুঃখজনক যুদ্ধ হলো, যা খেলাফতে যুবাইরিয়াকে একেবারে ধ্বংসের সদর দরজায় এনে দাঁড় করালো।[৪২৬]

আবদুল মালেক ডানে-বাঁয়ে সৈন্যদের নেতৃত্বে রাখলেন ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার ছেলে আবদুল্লাহ এবং খালেদকে। আর প্রত্যেক দলের কমান্ডার নিয়োগ দিলেন তার ভাই মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ানকে।[৪২৭]

এরপর উভয় দল যখন মুখোমুখি হলো তখন হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ. নিজের সিপাহসালার ইবরাহিমকে শামের সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিলেন। ইবরাহিম খুব ভয়ঙ্কর মাত্রায় আক্রমণ চালালো। এতে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ানের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ল।[৪২৮] এবং শামি সরদার মুসলিম ইবনে আমর বাহেলি (কুতাইবা

---

[৪২৫] তারিখে দিমাশক : ৫৮/২৪০

[৪২৬] তারিখুত তাবারি : ৬/১৬২ তারিখে খলিফা : ২৬৪

[৪২৭] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৬

[৪২৮] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৭

ইবনে মুসলিমের পিতা)-সহ অনেক মারওয়ানি মারা পড়ল। কিন্তু সেখান থেকে ইবরাহিমেরও আর বেঁচে ফেরা সম্ভব ছিল না। আর মুসআব ইবনে যুবাইরের অন্যান্য আমির যেহেতু পূর্ব থেকেই আবদুল মালেকের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল; তাই তখন ইবরাহিমের এই অবস্থা দেখেই ইরাকের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান পলায়ন করল। হজরত মুসআব এ দৃশ্য দেখে আরেকজনকে ডেকে আদেশ দিলেন, "আবু উসমান, তুমি তোমার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।"

আবু উসমান উত্তর দিল, "আমি আমার গোত্রের লোকদেরকে কোনো কারণ ছাড়া কেন হত্যা করব?"

একথা শুনে তিনি আরেকজন সিপাহসালারকে ডেকে বললেন, "তুমি তোমার সৈন্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হও।"

সে উত্তর দিল, "আমি এই নাপাক লোকদের কাছে কেন যাবো?"

এরপর তিনি আরো একজন আমিরকে নির্দেশ দিলে সে উত্তর দিলো, "যখন অন্যরা নির্দেশ মানছে না তখন আমি কেন মানবো?"

হজরত মুসআব রহ. বুঝে গেলেন যে, পরিণাম খুবই কাছে এবং তার সাথে সবাই প্রতারণা করছে। তখন তার মুখ থেকে অনিচ্ছাতেই বেরিয়ে এলো, "হায়! ইবরাহিম যদি এখন বেঁচে থাকতো!"

তখন তার এক হিতাকাঙ্ক্ষী বলল, "আপনি আপাতত দুর্গে আত্মরক্ষাব্যূহ তৈরি করে অবস্থান করুন। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরার মতো কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে একত্র করে তারপর পুনরায় আক্রমণ করুন।"

উত্তরে হজরত মুসআব রহ. রণসজ্জিত হয়ে এই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এলেন, (অর্থ) "তোমরা কেন বলছো, তরবারি আমার কাঁধ ঝুলিয়ে দিয়েছে, যখন আমি তা নিয়ে ময়দানে অবতরণ করছি! আমি তোমাদের হেফাজতের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করে যাবো। আর যে ব্যক্তি সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করে তার উপর না আসে কোনো অপবাদ আর না কোনো নিন্দা।"

এরপর তিনি তার ছেলে ঈসাকে ডেকে বললেন, "তুমি এখনই তোমার সাথিদের নিয়ে তোমার চাচার কাছে মক্কায় চলে যাও এবং দ্রুত গিয়ে তাদেরকে আমার সাথে ইরাকবাসীদের গাদ্দারির কথা জানিয়ে দাও। আর

আমি তো মরেই যাবো। সুতরাং আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করো না।"

বাবার এসব কথা শুনে ঈসা বলল, "আপনি বসরায় চলে যান। সেখানে আপনার অনেক ভক্ত আছে। অথবা আপনিও মক্কায় আমিরুল মুমিনিনের কাছে চলে যান।"

হজরত মুসআব রহ. তখন বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই কুরাইশকে আমার ব্যাপারে একথা বলার সুযোগ দেবো না যে, মুসআব তার সাথি-সঙ্গীদের ফেলে রেখে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেছে। আমি লড়াই করতে থাকব। যদি যুদ্ধের ময়দানে তরবারি নজরানা দিতে হয়, তাহলে তাতে অপমানের কিছু নেই। পলায়ন করা আমার স্বভাবে নেই। আর যদি তুমিও পলায়ন করতে লজ্জাবোধ করো তাহলে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।"
ঈসা এই কথা শোনামাত্র তরবারি কোষমুক্ত করে ফেললো এবং যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলো। আবদুল মালেকের সাথে হজরত মুসআবের পুরাতন বন্ধুত্ব ছিল; তাই সে মুসআবকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছিল। সে তার ভাই মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ানকে তার জীবনের নিরাপত্তার প্রস্তাব দিয়ে পাঠালে হজরত মুসআব বললেন, "আমার মতো লোকেরা হয়তো বিজয় নিয়ে যুদ্ধময়দান থেকে ফিরে যায় অথবা পরাজিত হয়ে।"[৪২৯] ততক্ষণে শত্রুপক্ষ একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছিল। তাই হজরত মুসআব রহ. তলোয়ারের খাপ খুলে শত্রুদের সাথে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করলেন। এরপর পাশ থেকে প্রথমে একজন তার দিকে তির নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে মুখতার কাজ্জাবের এক মুরিদ যায়েদা ইবনে কুদামা "হায় মুখতারের প্রতিশোধ" বলে তার শরীরে বর্শা ঢুকিয়ে দিলো। এরপর আরেকজন এসে তরবারি দিয়ে তার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলো।[৪৩০]

আবদুল মালেক যখন হজরত মুসআব রহ.-এর শাহাদাতের কথা জানতে পারল তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে ফেলল, "আমার এবং তার মধ্যকার বন্ধুত্ব অনেক গভীর ও পুরাতন ছিল। কিন্তু এই রাজনীতি বড় অবিশ্বস্ত ও

---

[৪২৯] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৭, ১৫৮, ১৫৯
[৪৩০] তারিখে দিমাশক : ৫৮/২৪১ তারিখুত তাবারি : ৬/১৫৯

অকৃতজ্ঞ। মুসআব, তোমার মতো পুত্র আর কোন মায়ের ভাগ্যে জুটবে![৪৩১]

এরপর যে ব্যক্তি হজরত মুসআব রহ.-এর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল সে মাথা নিয়ে এসে আবদুল মালেককে বলল, "হায়! আপনি যদি ডানে বাঁয়ে তরবারি ও বর্শা চালানোর ক্ষিপ্রতাটা দেখতেন! তার এই একটা দৃশ্যই চোখ, মন ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যখন তার সকল সাথিই পাশ থেকে পলায়ন করে চলে যাচ্ছিল এবং তাকে ঘেরাওকারীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল তখন সে এই পঙ্‌ক্তি পড়তে পড়তে একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, (অর্থ) "আমি ফেতনাবাজদের ব্যাপারে মন্দ দিয়েই প্রতিঘাত তৈরি করি। আর আমার অনুগতদের বেলায় মাটি থেকেও অনেক নরম হয়ে যাই।"

এই কথা শুনে আবদুল মালেক বলল, "আল্লাহর শপথ, সে এমনই ছিল।"[৪৩২]

কুফার রাজপ্রাসাদ : কর্তিত মাথার প্রদর্শনী

এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল মালেক ইবনে উমাইর বলেন, "আমি আমার জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় এই দেখেছি যে, একবার আমি যখন কুফার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলাম তখন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে একটি সিংহাসনে দেখলাম। আর তখন হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত মাথা একটি পাত্রে করে তার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পর সেখানেই এই দৃশ্য দেখলাম যে, মুখতার সাকাফি সিংহাসনে বসা আর তার সামনে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কর্তিত মাথা। তারও কিছুদিন পর সেই প্রাসাদেই দেখলাম মুখতার সাকাফির মাথা হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর সামনে। আর সর্বশেষ সেখানেই বসা দেখলাম আবদুল মালেককে আর তখন সামনে ছিল হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর কর্তিত মাথা।[৪৩৩]

---

[৪৩১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১৬/১৪০

[৪৩২] তারিখে বাগদাদ : ১৩/১০৭

[৪৩৩] তারিখে দিমাশক : ৫৮/২৪৪, ২৪৫

শহিদ হওয়ার সময় হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর বয়স ছিল মাত্র ৪০ বা ৪৫ বছর।[৪৩৪] তিনি হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামাতা ছিলেন। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে সুকাইনা তার স্ত্রী ছিলেন। ইমাম শা'বি রহ. তার ব্যাপারে বলেছেন, "আমি হজরত মুসআব রহ. ছাড়া আর কাউকে এমন দেখিনি, যার সময়কালে উম্মত বিক্ষিপ্ত থাকা সত্ত্বেও একত্র হয়েছিল। তিনি অন্যান্য হাকিমের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি কঠোরতার স্থানে কঠোরতা আর নম্রতার স্থানে নম্রতার আচরণ করতেন।[৪৩৫]

মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর পরাজয়ের কারণ

হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর পরাজয়ের মৌলিক কিছু কারণ হলো :

১. তার ভালো ভালো সিপাহসালাররা দূরবর্তী স্থানগুলোতে নিয়োজিত ছিল। আর তিনি ছিলেন গাদ্দার আমিরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

২. হজরত মুসআব রহ. স্বভাবের দিক থেকে অনেক উঁচুমাপের হলেও রাজনীতিতে ছিলেন তুলনামূলক কাঁচা। পুরো বাহিনীতে কাজের মতো ইবরাহিম ছাড়া তেমন কেউই ছিল না। বিপরীতে আবদুল মালেক ছিল মাত্রাতিরিক্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। সে যুদ্ধ এবং রাজনীতি উভয় বিষয়েই পারদর্শী ছিল। ফলত যা হবার ছিল তা-ই হয়েছে।

৩. হজরত মুসআব রহ.-এর যুদ্ধের পূর্ণপ্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও তিনি শুধু জজবার মধ্যে পড়ে যুদ্ধজয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অথচ তিনি তখন জানতেন যে, শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা অনেক আর নিজের সাথে যেসব গভর্নর ছিল, তারাও আবদুল মালেকের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছে। তখন কুফা থেকে বের না হওয়াই তার জন্য উচিতকাজ হতো। বরং সেখানেই তিনি আত্মরক্ষাব্যূহ বানিয়ে লড়াই করতেন এবং পারস্য ও খোরাসান থেকে সৈন্য ও যোগ্য আমিরদের ডেকে নিতেন। সেই সাথে তাদের পরামর্শ নিয়ে চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতেন।

---

[৪৩৪] তারিখে দিমাশক : ৫৮/২৫০

[৪৩৫] তারিখে দিমাশক : ৫৮/২৩৯

৪. মূল কেন্দ্র থেকে তাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছেনি। যদি হিজাজ থেকে সৈন্য এসে যেতো তাহলে শামিদের দুইদিক থেকেই ঘিরে ফেলা যেতো।

৫. মুখতার কাজ্জাবের অনুসারীরা তার সহচর হয়েছিল, যারা নিজেদের ক্রোধ ছাই চাপা দিয়ে রেখেছিল। বিদ্রোহ ও মুসআব রহ. কে শহিদ করায় এদেরই হাত ছিল।

বিজয়ের পর ইরাকে আবদুল মালেকের নতুন বিন্যাস

এই বিজয়ের পর আবদুল মালেক কোনো হৈ-হুল্লোড় ছাড়াই পূর্ণ ইরাক এবং পারস্যকে নিজের আয়ত্তে এনে নিজের পক্ষ থেকে প্রশাসক নিযুক্ত করে দিলো। কুফার গভর্নর নিযুক্ত করল তার ভাই বিশির ইবনে মারওয়ানকে আর বসরায় খালেদ ইবনে আবদুল্লাহকে। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা নীরবে এই নতুন হুকুমত মেনে নিলো। কিন্তু আবদুল মালেক সতর্কতাস্বরূপ তাকে এখান থেকে সরিয়ে আহওয়াজে স্থানান্তরিত করে দিলো।[৪৩৬] তবে খোরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম রহ. আবদুল মালেকের বাইয়াত স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করলেন। আবদুল মালেক কালবিলম্ব না করে তার প্রতিনিধি বুকাইর ইবনে উয়িশামকে খোরাসানের গভর্নর পদের লোভ দেখিয়ে সেখানে বিদ্রোহ করার জন্য উসকে দিলো। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে খাযেম এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন। এভাবে খোরাসানও আবদুল মালেকের আয়ত্তে এসে গেলো।[৪৩৭]

মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর শাহাদাতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

হজরত মুসআব রহ.-এর শাহাদাতের সংবাদ মক্কায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছলে তিনি মিম্বরে উঠলেন ভাষণ দেওয়ার জন্য। তখন তার চেহারায় ছিল চরম চিন্তার ছাপ। কপালে জমে উঠেছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি প্রথমে কিছুক্ষণ নীরব

---

[৪৩৬] তারিখে খলিফা : ২৬৮

[৪৩৭] তারিখুত তাবারি : ৬/১৭৬, ১৭৭

থেকে বলতে শুরু করলেন, "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যার কবজায় সকল সৃষ্টি, যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে চান ক্ষমতা দান করেন। যাকে চান তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। যাকে চান সম্মান দান করেন। যাকে চান অসম্মানিত করেন। কল্যাণকর সবকিছুই তার ক্ষমতাধীন। তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতা রাখেন। হে লোকসকল, স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি হকের উপর আছে সে কখনোই অসম্মানিত হতে পারে না, যদিও সে একা থাকে। আর শয়তানের সাথিদেরকে আল্লাহ তায়ালা কখনোই সম্মান দান করেন না, যদিও সকলে তার সহযোগী হয়ে যায়। আমাদের কাছে ইরাক থেকে এমন সংবাদ এসেছে, যার কারণে আমরা চিন্তিত আবার একইসাথে খুশিও। হ্যাঁ, মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর শাহাদাতের সংবাদ। আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন। যে বিষয় আমাদের চিন্তিত করেছে তা হলো, আমাদের এক আত্মার আত্মীয় সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। যদিও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ধৈর্যকেই প্রাধান্য দেবে। আর যে বিষয় আমাদের খুশি করেছে তা হলো, আমরা জানি মুসআব শহিদ হয়েছে। এতে আল্লাহ তার জন্য এবং আমাদের জন্য কল্যাণকর বিষয়ই রেখেছেন।

শোনো! ইরাকিরা নেফাকি ও গাদ্দারিতে পূর্ব থেকেই অভ্যস্ত। মুসআবকে তারা শত্রুর হাওলা করে দিয়েছে। বরং একটি উটের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে। অতঃপর মুসআবকে শহিদ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে, তার বাবা (যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.) তার ভাই, চাচা, মামা সকলেই তো শহিদই হয়েছিলেন। এরা সকলেই ছিলেন ভালো ও আদর্শবান মানুষ। আজকে যদি মুসআবের শাহাদাত আমাকে দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে হজরত উসমান রা. কে নিজের সামনে শহিদ হতে দেখার ব্যথা এখনো জ্বলছে। তার বাবা হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুঃখজনক শাহাদাতও আমাদের সামনেই হয়েছে। মুসআব আমার যুবা-বন্ধুদের একজন ছিলেন।"

এই পর্যন্ত বলেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. অশ্রুকাতর হয়ে পড়লেন। তার চোখ দিয়ে পানি ছলকে বেরিয়ে এলো। এরপর তিনি

আবার বলতে শুরু করলেন, "আল্লাহর শপথ, আমরা অকস্মাৎ মৃত্যুবরণকারীদের মতো নই। আমরা তো লড়াই করতে করতে এবং তরবারির ছায়ায় থেকে মৃত্যুবরণ-করা মানুষ। মনে রেখো, দুনিয়া এমন এক বাদশাহর দেওয়া ঋণ, যার বাদশাহির কোনো পতন নেই। সুতরাং দুনিয়া যদি আমার কাছে আসে তাহলে আমি তাকে মন্দ ও পলায়নপর ব্যক্তির মতো গ্রহণ করব না। আর যদি দুনিয়া আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে নির্বোধ ব্যক্তির মতো সেই কারণে কান্নাকাটি করব না।[৪৩৮]

এরপর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. একজন আনসারির হাতে ইরাকিদের উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি দিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার খেলাফতের প্রধান কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য করার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সেখানে আবদুল মালেকের গভর্নর বিশির ইবনে মারওয়ান এই সংবাদ জেনে সেই আনসারিকে বন্দি করে হত্যা করে দেয়।[৪৩৯]

[৪৩৮] তারিখে দিমাশক : ৫৮/২৪৬-২৪৮

[৪৩৯] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩৮

হিজাজে আবদুল মালেকের দখলদারত্ব

হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর হত্যা শুধু ইরাকই নয়; বরং হিজাজ থেকেও খেলাফতে যুবাইরিয়ার পতনের রাস্তা করে দিয়েছিল। মদিনায় বনু মারওয়ানের জেনারেল তারেক ইবনে আমর স্থান করে নিলো। সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নায়েব তালহা ইবনে আবদুল্লাহকে সেখান থেকে বের করে দিলো।[৪৪০]

আবদুল মালেকের জন্য এখন রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল। সে ইরাক নিজের আয়ত্তে আনার পর দামেশকে ফিরে এসেই শামের আমিরদেরকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য উসকে দিলো। কিন্তু সকলেই হারাম শরিফের পবিত্রতার দিকে লক্ষ করে সম্মত ছিল না।[৪৪১]

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আত্মপ্রকাশ

আবদুল মালেকের তূণীরে আরো একটি নতুন তির বিদ্যমান ছিল। সেই তিরটা হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। ৩২ বছরের এই টগবগে যুবকের ভেতর কঠোরতা একেবারে ঠেসে ভরা ছিল। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের বছর ৪০ হিজরিতে হাজ্জাজ তায়েফে জন্মগ্রহণ করে।[৪৪২] তার যোগসূত্র ছিল বনু সাকিফ গোত্রের সাথে। সে কুরআন মাজিদের কারি হওয়ার পাশাপাশি বেশ ভালো হাদিসও জানতো। ফাসাহাত, বালাগাত ও সমরশাস্ত্রে তার যোগ্যতা ছিল প্রবাদপ্রতীম। কিন্তু তার মধ্যে এমন দুটি দোষ ছিল, যার নিচে তার সকল ভালো গুণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। প্রথমত, সে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সীমাহীন ও মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা রাখতো। তার এই চিন্তাধারার বিপরীতে যদি কোনো বড় সাহাবির মধ্যেও হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু

---

[৪৪০] তারিখে খলিফা : ২৬৮

[৪৪১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৬৪

[৪৪২] আল আ'লাম লিয যিরাকলি : ২/১৬৭

আনহুর প্রতি সামান্যও অবজ্ঞা বা অনীহা দেখতো তাহলে হাজ্জাজ তার জন্য আপাদমস্তক গজব হয়ে উঠতো। দ্বিতীয়ত, সে সরকারি নির্দেশ বা নীতির প্রতি দীন এবং ঈমানের মতোই শ্রদ্ধাশীল ছিল। সরকারি নীতির বিরোধিতাকে কুফুরি মনে করতো। আর সেই নীতির বাস্তবায়নের জন্য লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলতো। এতে যদি বড় থেকে আরও বড় কোনো সাহাবি সামনে চলে আসতেন, তাহলে তাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে তার সামান্য চিন্তা করতে হতো না। সম্ভবত হাজ্জাজই এমন নেতা, যাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, ইয়াজিদ এবং মারওয়ানের ক্ষতিপূরণ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। ইবনে জিয়াদের স্থানে আবদুল মালেক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পেয়ে গেলো। সে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ থেকেও বেশি রক্তপিপাসু, নির্দয় ছিল। হাজ্জাজ মূলত একটি গরিব পরিবারের সন্তান ছিল। তার পূর্বপুরুষরা ছিল গায়ে-খাটা লোক। তারা পাথর এনে দেওয়া, কূপ খনন করাসহ বিভিন্ন রকমের কাজ করতো। তবে হাজ্জাজ আর তার বাবা তায়েফে ছোট বাচ্চাদেরকে পড়াতো।[৪৪৩] কয়েকজন আরব কবির কবিতা থেকে এটা বুঝা যায় যে, হাজ্জাজ সকাল-সন্ধ্যা ঘরে ঘরে গিয়ে বাচ্চাদের পড়াতো। তখন তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ।[৪৪৪] একসময় হাজ্জাজকে নিয়ে তার বাবা দামেশকে চলে আসে এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামের সেনাবাহীনিতে যোগ দেয়। ৬৫ হিজরির রমজান মাসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দামেশক থেকে আসা সৈন্যদের মাঝে সে এবং তার বাবাও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিল।[৪৪৫] হাজ্জাজের মেজাজ সামান্য একটি ঘটনা থেকেই বুঝে ওঠা যায়। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হাফেজ ইবনে কাসির রহ.। তিনি লেখেন, "মিসরের কাজি সুলাইম ইবনে ইতির রহ. একজন মুত্তাকি, পরহেজগার ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাজ্জাজের পিতার নিকট আবেদন করলেন, তাকে যেন এই পদ থেকে অবসর দেওয়া হয়। হাজ্জাজের পিতার তার এই পরহেজগারি এবং অমুখাপেক্ষিতা অনেক ভালো লাগল। তাই তিনি তার ছেলে হাজ্জাজের

---

[৪৪৩] আল ইকদুল ফারিদ : ৫/২৭৫

[৪৪৪] আল ইকদুল ফারিদ : ৫/২৭৫ দিওয়ানুল হামাসা : ২৩৫

[৪৪৫] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৩

কাছে সুলাইমের অনেক প্রশংসা করলে হাজ্জাজ রেগে গিয়ে বলল, "এরাই আমাদের রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। কারণ, তাদেরকে দেখে লোকেদের হজরত আবু বকর ও উমরের কথা স্মরণ হয়ে যায়। ফলে তাদের আশপাশে ধীরে ধীরে তারা ভিড়তে থাকে। এরপর তারা শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ করে বসে। আল্লাহর শপথ, যদি আমার সুযোগ থাকতো তাহলে আমি এই কাজিকে হত্যা করে ফেলতাম।" ছেলের এমন কথা শুনে বাবা বলল, "বেটা, আমার তো মনে হয় তোমাকে আল্লাহ দুর্ভাগা হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন।" এরপর হাফেজ ইবনে কাসির রহ. লেখেন, "তার বাবার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।"[৪৪৬]

আবদুল মালেক ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তার উজির রাওহ ইবনে যিম্বার সুপারিশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় যে, সে যেন সৈন্যদের কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হওয়ার বেলায় সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে। হাজ্জাজ এই দায়িত্ব পালনে নিজের পৃষ্ঠপোষক রাওহ ইবনে যিম্বাকেও ছাড় দেয়নি। যখন হাজ্জাজ দেখল, সৈন্যদের রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে; অথচ তখনো রাওহ ইবনে যিম্বার তাঁবুতে দস্তরখান বিছানো তখন সে সৈন্যদেরকে বেত্রাঘাত শুরু করে দিলো এবং তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিলো। রাওহ ইবনে যিম্বা পেরেশান হয়ে আবদুল মালেকের কাছে গিয়ে সব বলল। আবদুল মালেক তখন হাজ্জাজকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে হাজ্জাজ বলল, "এটা আমি নই, আপনি করেছেন। কারণ আমার হাত মানেই আপনার হাত। আমার আঘাত মানেই আপনার আঘাত। আপনি রাওহের এক তাঁবুর বদলে দুটি তাঁবু দিয়ে দিন। কিন্তু আপনি যেই কাজ আমাকে করতে দিয়েছেন তাতে আমি কিছুতেই এদিক-সেদিক করতে পারবো না।"[৪৪৭]

এরপর থেকেই মূলত হাজ্জাজ আবদুল মালেকের দৃষ্টিতে আসে। আবদুল মালেকের অভিজ্ঞ দৃষ্টি যাচাই করে নিলো যে, একে অনেক কঠিন কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং অপরাজেয় শক্তিকে পরাজিত করার ক্ষেত্রেও হাজ্জাজ ভালো কাজে আসবে।

---

[৪৪৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৫১১

[৪৪৭] আল ইকদুল ফারিদ : ৫/২৭৫, ২৭৬

দরবারের লোকদেরকে যখন আবদুল মালেক জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের মধ্যে কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে নিঃশেষ করে দিতে পারবে?"

তখন শামের বড় বড় আমিরগণ এই দুঃসাহস না করলেও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঠিকই করল। সে বলল, "আমিরুল মুমিনিন, এই কাজের জন্য আমি রাজি আছি।"

আবদুল মালেক তাকে তখন চুপ করিয়ে দিয়ে আবার লোকদেরকে একথাই জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তখনো হাজ্জাজ ছাড়া কেউ সাড়া দিলো না। সে তখন আবার বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জুব্বা খুলে আমি পরিধান করে নিয়েছি।"

এই কথা শুনে আবদুল মালেক তার কাছেই এই দায়িত্ব অর্পণ করল।[৪৪৮]

আবদুল মালেক প্রথমেই মক্কার অধিবাসীদেরকে এই সংবাদ জানায় যে, যদি তারা অস্ত্র রেখে দেয় তাহলে তাদের উপর কোনো আক্রমণ করা হবে না। এরপর হাজ্জাজ দুই হাজার সৈন্য নিয়ে ৭২ হিজরির জুমাদাল উখরার শেষদিকে আক্রমণের কাজ শুরু করে দেয়। সে আবদুল মালেকের নির্দেশনা অনুযায়ী মক্কা-মদিনার রাজপথ ছেড়ে ইরাকের রাজপথে চক্কর দিয়ে শাবান মাসে তায়েফ পৌঁছে। সেখানে তার গোত্র বনু সাকিফ তাকে সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা করছিল। হাজ্জাজ এখান থেকে আক্রমণের জন্য কিছু কিছু অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাচ্ছিল। আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে প্রতিরোধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দল পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এভাবে যখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক শক্তি একেবারে শেষের পথে তখন হাজ্জাজ মক্কা ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নিলো। তাই সে আবদুল মালেকের কাছে এর অনুমতি ও সাহায্যের আবেদ চেয়ে একজন লোক পাঠিয়ে দিলো। আবদুল মালেক আনন্দচিত্তে অনুমতি দিলো এবং মদিনার হাকিমকে পাঁচ হাজার সৈন্য

---

[৪৪৮] আল-মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ১৩/৯২; আখবারি মাক্কা : ২/৩৩৭; তারিখে দিমাশক : ২৭/২৩১

দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। ৭২ হিজরির শাওয়াল মাসে হাজ্জাজ তার পূর্ণ বাহিনী নিয়ে তায়েফ থেকে রওনা হয়ে গেলো এবং যিলকদ মাসের এক তারিখে মক্কা ঘেরাও করে নিলো। [৪৪৯]

মক্কায় অবরোধ

শামবাসীদের সৈন্যসংখ্যা এমনিতেই ছিল অনেক। তার উপর আবার সাহায্যও আসছিল। রসদপাতির ব্যবস্থাও ছিল পর্যাপ্ত। মক্কা থেকে মদিনা এবং মদিনা থেকে শাম পর্যন্ত আসা-যাওয়া ছিল অব্যাহত। অপর দিকে মক্কাবাসীদের সৈন্যসংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। ছিল খাবারের সংকট। হাজ্জাজ তাই অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলছিল। যাতে মক্কাবাসীরা খাদ্যসংকটে পড়ে আত্মসমর্পণ করে। [৪৫০]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বারবার তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, শত্রুরা যেন কোনোভাবেই 'আবু কুবাইস ও কুয়াইকাআন ' পর্বত দখল করতে না পারে। তিনি বলছিলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা শত্রুদের এই দুই পাহাড় দখল করা থেকে বিরত রাখতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অপরাজেয় থাকবে।" কিন্তু মক্কাবাসীদের শক্তি ও সাহসে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে হাজ্জাজ এই উভয় পাহাড়ই নিজের দখলে নিয়ে এলো। [৪৫১] এরপর ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল। তখন মূলত হজের সময় এসে যাওয়ায় হাজিরাও মক্কায় অবস্থান গ্রহণ করছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরও ছিলেন। তিনি এই অবস্থাতেও হজ ছেড়ে দেননি। [৪৫২] আর আগে থেকেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হাজিদেরকে হারামে প্রবেশ ও তাওয়াফের ব্যাপারে আম অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু পাথর বর্ষণের কারণে তাওয়াফ করা বা কাবার কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। হাজিদের মধ্যে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হজরত আবু সাঈদ খুদরি, হজরত সালামা ইবনে আকওয়া এবং রাফে ইবনে খাদিজ

---

[৪৪৯] তারিখুত তাবারি : ৬/১৭৪, ১৭৫

[৪৫০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৭৮

[৪৫১] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৩৯ আল মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ১৩/৯২

[৪৫২] আলজামে' লিইবনে আবি ওয়াহাব: ১৩২

রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো বড় বড় সাহাবিরা শামিল ছিলেন। তারা হাজ্জাজকে আপাতত পাথর বর্ষণ বন্ধ রাখার আবেদন করলেন। যেন হাজিগণ তাদের কাজ ভালোভাবে আদায় করতে পারেন।[৪৫৩] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নিজেও আবেদন করলেন। হাজ্জাজ তখন তাদের এই আবেদন মেনে নিলো।[৪৫৪] তবে যুদ্ধরত দুই দলের কারোই অন্যদলের সীমানায় প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ফলে হাজ্জাজ এবং তার সাথিরা তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারল না। অপর দিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং তার সাথিরাও আরাফার ময়দানে যেতে পারলেন না।[৪৫৫] হজ আদায়কারীদের অনেকেই মক্কাকে রক্ষা করার জন্য থেকে যেতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু তাদের সকলের থাকার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন ছিল সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাদেরকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। এদিকে হজের রুকন পূর্ণ হতেই হাজ্জাজ ঘোষণা দিয়ে দিলো যে, সবাই যেন নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। কারণ হারামে পাথর বর্ষণ শুরু হবে।[৪৫৬]

হাজিদের চলে যাওয়ার পরই উভয় পাহাড় থেকে হাজ্জাজের সৈন্যরা ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়ে পাথর বর্ষণ শুরু করে দিলো। একপর্যায়ে কাবার সেই অংশটাও তাদের দখলে এসে গেলো, যেখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং তার সাথিরা ছিলেন। এই ক্ষেপণাস্ত্র চালানোর জন্য সে হাবশা থেকে লোক আনিয়েছিল।[৪৫৭] যখন ৭৩ হিজরি শুরু হলো তখনো এই যুদ্ধ চলছিল। একদিন পাথর বর্ষণের সময় হঠাৎ আকাশে ঘন মেঘ জমে উঠল। প্রবল বর্ষণের সাথে সাথে এমন জোরে বিজলি চমকাচ্ছিল যে, পাথর বর্ষণের আওয়াজ থেমে গেলো। শামি সৈন্যরা ভয় পেয়ে ক্ষেপণাস্ত্র বন্ধ করে দিলো। হাজ্জাজ এই অবস্থা দেখে নিজে উঠে এসে পাথর মিনজানিকে বসিয়ে দিলো এবং পাথর বর্ষণ চালু রাখার কঠোর

---

[৪৫৩] আখবারি মাক্কা : ২/৩৭৩

[৪৫৪] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১১৯

[৪৫৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৬৫; আনসাবুল আশরাফ : ৭/১১৯

[৪৫৬] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১১৯

[৪৫৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৭৮

আদেশ দিলো। এসময় দুবার এমনই বিজলি চমকালো যে, শামের অনেকেই এতে মারা গেলো। পুরা বাহিনীর ভেতর এই ভয় ঢুকে গেলো যে, এটা নিশ্চয় আসামানি শাস্তি। হাজ্জাজ তখন সবাইকে শান্ত করার জন্য বলল, "ভয় পেয়ো না। এটা তিহামার বিজলি। এখন বিজয় আমাদের সন্নিকটে।" তা ছাড়া সেদিন বিজলির কারণে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সেই কারণে শামের সৈন্যদের ভয় তুলনামূলক অনেকটাই কমে এলো এবং আগের চেয়ে দ্বিগুণ উদ্যম নিয়ে আক্রমণ চালালো।[৪৫৮] একবার তো বিজলির প্রকোপের কারণে একটি ক্ষেপণাস্ত্র একেবারে ছাই হয়ে গেলো। সিপাহিরা যখন ভয় পেয়ে গেলো তখন হাজ্জাজ বলল, "এটা কবুলিয়তের আলামত। কারণ পূর্বের উম্মতদের থেকে কুরবানি এমনভাবেই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে কবুল করা হতো।" একথা শুনে সিপাহিরা কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলো।[৪৫৯] এই পূর্ণ সময়জুড়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. খুব শান্তভাবে কাবা-চত্বরে নামাজ আদায় করছিলেন। অনেক সময় পাথর তার পাশে এসে পড়তো। কিন্তু এসবের প্রতি তিনি সামান্য ভ্রুক্ষেপ করেননি।[৪৬০]

মসজিদে হারামের দিকে নামার রাস্তায় শামের সৈন্যদের আক্রমণ অব্যাহতই রইলো। হাবশার কিছু লোক তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন। তারা ফেরানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু এরা তরবারি চালানো জানতো না। তাই শত্রুরা যখন একেবারে কাছে এসে যেতো তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নিজে তাদের উপর আক্রমণ করে পিছু হটিয়ে দিতেন।[৪৬১]

শামের সৈন্যদের জন্য দামেশক থেকে পর্যাপ্ত ছাতু, কেক ও বিস্কুট আসতে থাকল।[৪৬২] সেইসাথে তারা অপেক্ষায় ছিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজুদকৃত যব ও খেজুর কখন শেষ

---

[৪৫৮] তারিখুত তাবারি : ৬/১৮৭

[৪৫৯] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২২, ১২৩

[৪৬০] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২১

[৪৬১] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১১৯, ১২০

[৪৬২] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১১৮

হয়ে যায়। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. খাবার খুব হিসাব করে খরচ করছিলেন এবং সবাইকে খুব সতর্কতার সাথে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দিচ্ছিলেন। তিনি তখন একথা বলেছিলেন, "যতক্ষণ খাবার থাকবে ততক্ষণ সাথিদের এই প্রতিরোধ টিকে থাকবে।"[৪৬৩]

পরিবেষ্টিত সৈন্যরা অনাহারের শিকার

অবশেষে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদের মাঝে অনাহার-অবস্থা দেখা দিলো। সৈন্যরা একেবারে ঝিমিয়ে পড়ল। যমযমের পানি ছাড়া তাদের কাছে খাবারের মতো তেমন কিছুই অবশিষ্ট্য রইলো না।[৪৬৪] ফলে সৈনরা নিজেদের বাহনজন্তু জবাই করতে বাধ্য হলো। শুধু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি ঘোড়া ছিল, যা তিনি বিশেষ কাজে ব্যবহার করতেন। কিন্তু অবশেষে সাথিদের অনাহার-অবস্থা দেখে সেই ঘোড়াটিও জবাই করে ফেললেন। এরপর যখন খাওয়ার মতো জীবিত আর কিছুই পাওয়া গেলো না তখন মৃতপ্রাণী খাওয়ার মাসআলা সামনে চলে এলো।[৪৬৫] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যুদ্ধের এই কঠিন সময়েও শরিয়তের নিয়ম-নীতির উপর এমন অবিচল ছিলেন যে, সৈন্যরা তার কাছে শত্রুর উপর রাতে আক্রমণ করার অনুমতি চাইলো। কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "রাতে অতর্কিত হামলা বৈধ নয়। সুতরাং আমরা তা হালাল মনে করি না।"[৪৬৬] যেহেতু এখন জীবন বাঁচানোর কোনো পথ খোলা রইলো না; তাই প্রায় অধিকাংশ সাথিই জীবন বাঁচানোর বিষয়ে চিন্তা শুরু করলেন। কেউ কেউ হজরত

---

[৪৬৩] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২১; এই কারণেই তিনি শামি সৈন্যদের সাথে টানা ছয়মাস টিকে থাকতে পেরেছিলেন। অথচ অনেকে তার এই অসাধারণ কর্মপন্থাকে না বুঝে উলটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাদের মতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ছিলেন অনেক কৃপণ, লোভী ও ছোট মনের মানুষ, যিনি নিজের সাথিদের পেট ভরে খাওয়ানোর বদলে নিজের সাথিদেরকে অল্প আহার দিতেন এবং ক্ষুধার্ত রাখতেন। ইতিহাসের পাঠকগণ প্রায়ই এমন কিছু বর্ণনার সম্মুখীন হবেন, যা বর্ণনার দিক থেকে খুবই দুর্বল এবং মিথ্যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

[৪৬৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৭৮

[৪৬৫] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২০, ১২১

[৪৬৬] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৬

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে গোপনে মক্কা ছেড়ে নিরাপদ কোনো স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি তখন বললেন, "তখন তো আমি ইসলামি ইতিহাসে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেতা হিসেবে পরিচিত হবো। যে তার কওমকে যুদ্ধে জড়িয়ে দিলো এবং যখন তারা মৃত্যুবরণ করল তখন তাদের লাশ ফেলে পালিয়ে গেলো।"

আবার কেউ কেউ তাকে কাবাঘরের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বললেন, "হাজ্জাজের কাছে কাবার ভেতর আর বাইরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আমি চাই না যে, আমাকে পলায়নপর শেয়ালের মতো ধরে নেওয়া হোক। আমি তরবারি দিয়ে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করব।" তখন তার এক ভাই হামজা বলল, "আপনি কাবাঘরের ছাদে উঠে যান। আমরা নিচে থেকে আমৃত্যু লড়াই করে যাবো।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. উত্তরে এই বললেন, "আমি জীবনকে কোনো অপমানের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাই না এবং মৃত্যুকে ভয় পেয়ে কোনো সিঁড়িতেও আরোহণ করতে চাই না।"[৪৬৭] আসলে বাঁচার জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা ছিল শত্রুদের সাথে সন্ধি করে নেওয়া। কিন্তু এই পরামর্শও যখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে দেওয়া হলো তখন তিনি কঠোরভাবে তা নিষেধ করে দিলেন। কারণ সন্ধি মানেই আবদুল মালেকের অবৈধ খেলাফত মেনে নেওয়া। তাই তিনি ঘুণাক্ষরেও এটা চিন্তা করতে পারছিলেন না। কারণ তার এই পর্যন্ত এতো কিছু করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল অবৈধ খেলাফত ও ক্ষমতার শেকড় উপড়ে ফেলা। অথচ আবদুল মালেক ছিল একজন স্পষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দাগি অপরাধী। সুতরাং তার সামনে মাথানত করে তার ক্ষমতার বৈধতার স্বীকৃতি তিনি কেন দিতে যাবেন! এজন্য লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে ভুল কাজকে কেয়ামত পর্যন্ত ভুল হিসেবে আখ্যা দিয়েই ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকাই পছন্দ করেছেন। এজন্য যখন কেউ তাকে এই পরামর্শ দিলো যে, আপনি হাজ্জাজের সাথে সন্ধি করে নিন। এর বিনিময়ে আপনাকে কোনো এলাকার গভর্নর বানিয়ে দেওয়া হবে। তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো কেন

---

[৪৬৭] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৭; আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২

সম্মানের মৃত্যু গ্রহণ করব না!"[৪৬৮] দ্বিতীয়ত, তিনি শামিদের পক্ষ থেকে জীবনের নিরাপত্তা গ্রহণের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। কারণ শত্রুপক্ষ বিজয়ী হওয়ার পর অবশ্যই এর কোনো প্রতিশোধ নেবে। তাই তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর শপথ, যদি এইসব লোক তোমাদেরকে কাবার একেবারে কাছেও পায় তাহলে তোমাদেরকে জবাই করেই তারপর শান্ত হবে।"[৪৬৯]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর একা থেকে যাওয়ার কারণ

অবরোধের প্রায় সাড়ে ছ' মাস কেটে গেছে। মক্কাবাসীরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে মন থেকেই মহব্বত করতো এবং একথাও জানতো যে, তিনিই আসলে হকের উপর আছেন। আর যেহেতু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শরিয়তসম্মত খলিফা; তাই তার বিরুদ্ধে আবদুল মালেক ও হাজ্জাজের এই আন্দোল রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছাড়া কিছুই না। এজন্য মক্কাবাসীরা অনেক কষ্ট সত্ত্বেও কয়েক মাস তার সাথেই থেকেছেন এবং শহর রক্ষা করেছেন। কিন্তু সবাই যখন অনাহার, যখম এবং ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে পড়ার সাথে সাথে সফলতারও কোনো রাস্তা দেখছিলেন না তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তার অবস্থানেই ছেড়ে দিলেন। ওদিকে হাজ্জাজ আবার বারবার এই ঘোষণা দিয়েই যাচ্ছিল যে, "হে লোকসকল, তোমরা নিজেদের কেন ধ্বংস করে দিচ্ছো! যারা অবরোধ থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে, তারা নিরাপদ থাকবে।"[৪৭০]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. জীবন বাঁচানো শরিয়তসম্মত মনে করতেন। তাই তিনি তার সাথিদেরকে এই অনুমতি দিয়ে দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা চায় তারা যেন হাজ্জাজের কাছে গিয়ে জীবনের নিরাপত্তা গ্রহণ করে। তখন তার এক সাথি আবদুল্লাহ ইবনে যুহাইর বলল, "যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে আমরা আপনার জন্য নিরাপত্তা আনতে পারি।"

---

[৪৬৮] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩৭

[৪৬৯] আল মু'জামুল কাবির লিততাবারানি : ১৩/৯২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৭৮

[৪৭০] তারিখুত তাবারি : ৬/১৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৭৯; তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৪৫

উত্তরে তিনি জানিয়ে দিলেন, "তোমার মনে চাইলে নিজে গিয়ে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে নাও। আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

এরপর তিনি তার ছেলে যুবাইরকেও খুব শক্ত করে বললেন, "বেটা, যদি চাও তাহলে তুমিও চলে যাও। নিহত হওয়ার চেয়ে তোমার জীবিত থাকা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।" যুবাইর বলল, "যদি আমি আপনার উপর অবতীর্ণ মুসিবতে অংশ না নিয়ে আপনাকে একা ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমার চেয়ে খারাপ ছেলে আর কে আছে।"[৪৭১]

সর্বোপরি লোকজন নিজেদের আত্মরক্ষাব্যূহ ছেড়ে হাজ্জাজের কাছে গিয়ে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে নিলো। তাদের অধিকাংশই ছিল মক্কার সাধারণ জনগণ আর কিছু সৈন্য ও সেনাপ্রধান। এভাবে প্রায় দশ হাজার মানুষ যুদ্ধের আওতা থেকে বের হয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে গেলো। শেষদিন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুই ছেলে হামজা এবং খুবাইবও বের হয়ে জীবনের নিরাপত্তা গ্রহণ করল। হাজ্জাজ তাদের সকলকেই জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে দিলো।[৪৭২]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ভুল নাকি আযিমতের উপর ছিলেন?

কারো কারো ধারণা হলো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শরয়ি এবং চারিত্রিক দিক থেকে ভুলের উপর ছিলেন। কারণ এই যুদ্ধটা শুধু তিনি তার একগুঁয়েমি ও কওমি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য করে যাচ্ছিলেন। যদি তিনি হকের উপরই থাকতেন তাহলে তিনি আর একা থাকতেন না। কমপক্ষে ছেলেরা তার সাথে অবশ্যই থাকতো।

তাদের এই ধারণা শতভাগই ভুল। হকের পথে কুরবানি করার সময় কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যখন অধিকাংশ লোক সেই আযিমতকে রেখে রুখসতের উপর আমল করে। হাতেগোনা কয়েকজনই তখন শুধু নিজের জীবন, সম্মান ও সবকিছু উপেক্ষা করে সঠিক অবস্থানেই অটল ও অনড় থাকে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তেমনই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার সত্যনিষ্ঠতা ও

---

[৪৭১] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩৯

[৪৭২] তারিখুত তাবারি : ৬/১৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৭৯; তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি : ৫/৪৪৫

ন্যায়পরায়ণতা সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। আর তাদের সাথিরা আপন স্থানে অপরাগ ছিলেন। কারণ তারা পরাজয়কে দেখছিলেন চোখের সামনে। তা ছাড়া এখন এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মানে মৃত্যু ছাড়া কিছুই না। এজন্যই তারা প্রথমে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে সন্ধির পরামর্শ দিয়ে তার জীবন রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যখন তিনি মেনে নিচ্ছিলেন না তখন তারাই বাধ্য হয়ে চলে যান। হয়তো তারা ভেবেছিলেন যে, সবাই যখন চলে যাবে এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. একা হয়ে যাবেন তখন অন্তত তিনি হাতিয়ার রেখে দেবেন। কিন্তু এমন হলো না। কারণ হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি এবং হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার তরবিয়তপ্রাপ্ত ভাগিনা আল্লাহ ব্যতীত কারো সামনেই মাথানত করতে জানতেন না।

শাহাদাতের প্রস্তুতি

দূরদর্শী খলিফা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যুদ্ধের ফল এবং নিজের পরিণাম তিনি ভালোই জানতেন। তিনি এটাও জানতেন যে, তাকে হত্যা করেই শত্রু ক্ষান্ত হবে না; বরং অন্যদের শিক্ষার জন্য লাশ প্রদর্শনও করা হবে।[৪৭৩] ৭৩ হিজরির জুমাদাল উলার ১৬ তারিখে হাজ্জাজ বিপরীত পক্ষের ক্ষয়ে পড়া প্রত্যক্ষ করছিল আর নিজের সৈন্যদের বলছিল, "আমাদের বিজয় অত্যাসন্ন। ইবনে যুবাইরের সাথে এখন অল্পকিছু মানুষ আছে। তাও আবার তারা ক্ষুধার কারণে খুবই দুর্বল ও ক্লান্ত।" হাজ্জাজের নির্দেশে শামি সৈন্যরা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে মসজিদুল হারামের দরজা পর্যন্ত চলে গেলো।[৪৭৪]

এদিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নিজের মাকে বলেছিলেন, "আম্মা, আমার খুব ভয় হচ্ছে যে, তারা আমাকে হত্যা করার পর আমার নাক-কান কেটে ফেলবে এবং লাশ ঝুলিয়ে অসম্মান করবে।"

সাহসী মা উত্তরে বললেন, "যখন বকরি জবাই করা হয়ে যায় তখন তার চামড়া ছাড়ানোতে কোনো কষ্ট হয় না। তুমি তোমার অবস্থানের উপর মজবুত ও দৃঢ় থাকো এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।"[৪৭৫]

---

[৪৭৩] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৮
[৪৭৪] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৩
[৪৭৫] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৩

জীবনের শেষরাত

এই রাতে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাতিজা আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ এসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং খুব জোর আবেদন করলেন যে, আমি আপনার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে হাজ্জাজের কাছে যেতে চাই। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. স্পষ্ট ভাষায় না করে দিলেন।[৪৭৬]

জুমাদাল উলার ১৭ তারিখ সুবহে কাজিবের সময় হাজ্জাজের সৈন্যরা মসজিদুল হারাম বেষ্টন করে ফেলেছিল। প্রত্যেক দরজায় ৫০০ সৈন্য মোতায়েন ছিল, যাতে সুযোগ পেলেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে পরাজিত করে ফেলা যায়। কাবার সামনের দরজায় হিমস, বনি শাইবা দরজায় দামেশক, সাফা দরজায় জর্ডান, বনি জামআয় ফিলিস্তিন এবং বনি সাহাম দরজায় কিন্নাসরিনের বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। আর হাজ্জাজ নিজে মারওয়ার দিকে আবতাহের কিনারায় পর্যবেক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে রইলো।[৪৭৭] এদিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সারারাত নফল পড়ছিলেন। সুবহে কাজিবের সময় তিনি তরবারির বাট কোমরে বেঁধে বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেন। এরপর অভ্যাসমতো ফজরের নামাজের জন্য নিজে নিজেই ঘুম থেকে উঠে গেলেন।[৪৭৮]

মায়ের সাথে শেষসাক্ষাৎ এবং আসমা বিনতে আবু বকর রা. এর ঐতিহাসিক কথোপকথন

ফজরের নামাজের পূর্বে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মায়ের কাছে গেলেন। তিনি মসজিদুল হারাম সংলগ্ন একটি আলাদা সংরক্ষিত স্থানে বসবাস করতেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসস্থান এখানেই ছিল।[৪৭৯]

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স তখন একশোর কোঠায় ছিল। কিন্তু এরপরও তার দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঠিক তেমনই ছিল যেমনটা ছিল নিজ পিতা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কে নবীজির সাথে মদিনায়

---

[৪৭৬] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৫

[৪৭৭] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯০

[৪৭৮] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯১

[৪৭৯] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১

পাঠানোর দিন।[৪৮০] এখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে ও নাতির মাঝে যেই কথোপকথন হলো এর প্রতিটি অক্ষর সোনার কালিতে লিখে রাখার মতো। প্রথমেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সালাম দিলেন এবং মায়ের সামনে সম্মানের সাথে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি তার মায়ের হাতে চুমো দিয়ে বললেন, "আম্মা, আমি আপনার সাথে বিদায়ী কথা বলতে এসেছি। কারণ কেন জানি না মনে হচ্ছে আজই আমার জীবনের শেষদিন।[৪৮১]

হজরত আসমা রা. জিজ্ঞেস করলেন, "যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি কী?"

তিনি বললেন, "শত্রুরা আমাকে ঘিরে ফেলেছে।" এরপর একটু হাসি মুখে বললেন, "মৃত্যু অনেক আরামের জিনিস।"

"বেটা, তুমি হয়তো আমার মৃত্যুও কামনা করছো। কিন্তু আমি চাচ্ছি মৃত্যুর পূর্বে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি দেখে যাই। হয়তো তুমি জয়ী হয়ে আমার চক্ষু শীতল করবে নয়তো তুমি নিহত হয়ে আমার জন্য ধৈর্য ও সাওয়াবের দ্বার খুলে দেবে।"[৪৮২]

"আম্মা, লোকেরা আমার সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। এখন যারা আছে, তারা হাতেগোনা কয়েকজন। অপরদিকে শত্রুরাও সুযোগ দিচ্ছে যে, আমি যা চাইবো তারা তাই দেবে। এখন আপনার সিদ্ধান্ত কী?"

শোনো বেটা, যদি তুমি এটা মনে করো যে, তুমি হক ও সত্যের উপর আছো এবং সেদিকেই মানুষকে আহ্বান করছো তাহলে তুমি তোমার অবস্থানে পাহাড়সম দৃঢ় থাকো। কারণ একারণেই মূলত তোমার সাথিরা জীবন দিচ্ছেন। আর যদি তোমার এই সকল চেষ্টা দুনিয়ার জন্য হয়ে থাকে তাহলে তোমার চেয়ে মন্দ লোক কেউ নেই। কারণ তুমি নিজেকেও ধ্বংস করছো, সাথে যারা সত্যে জন্য জীবন দিচ্ছে তাদের

---

[৪৮০] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৩৯
নোট : মুসনাদে আহমদে এসেছে যে, তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আবার মুসতাদরাকে হাকিমে এসেছে যে, তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি সবই ঠিক ছিল। মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৩৯ এই বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসনাদে আহমাদের সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ। কিন্তু মুসতাদরাকের এই বর্ণনার রাবিগণ দুর্বল। সুতরাং মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

[৪৮১] তারিখুত তাবারি : ৬/১৮৯

[৪৮২] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৩/৯২; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১

রক্তও বৃথা করে দিচ্ছো। আর যদি তুমি একথা বলো যে, আমি তো হক ও সত্যের উপরেই আছি; কিন্তু আমার সাথিবর্গ যেহেতু শত্রুদলে ভিড়ে গেছে; তাই আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছি, তাহলে শোনো, আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের এসব নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। তুমি দুনিয়াতে সবর্দা থাকবে না। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করাই ভালো।”[৪৮৩]

“আর শোনো, মৃত্যুভয়ে দীনের একটি কথাও ছেড়ে দিয়ো না।”[৪৮৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সম্মানিত মাতার এমন বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রেরণা-উদ্দীপক কথা শুনে খুশিতে তার মাথায় চুমো দিলেন এবং বললেন, “আল্লাহর শপথ, আমার চিন্তা এমনই ছিল। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম, আপনার সিদ্ধান্তও যেন জানা হয়ে যায়। আপনি আমার ইচ্ছা ও আগ্রহ দ্বিগুণ দৃঢ় করে দিলেন। আম্মা, দেখুন, হয়তো আমাকে আজই শহিদ করে দেওয়া হবে। আপনি কিন্তু সেকারণে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়বেন না। সবকিছু আল্লাহ তায়ালার হাতে সঁপে দেবেন। কারণ আপনার ছেলে জেনে-বুঝে কোনো গুনাহ করেনি। কখনো নির্লজ্জতার কাছেধারে যায়নি। আল্লাহ তায়ালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করেনি। কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার পর তার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেনি। কোনো মুসলমান ও জিম্মির উপর জুলুম করেনি। অধীনস্থ কারো বাড়াবাড়িকে ছাড় দেয়নি। সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির উপর অন্যকিছুকে প্রাধান্য দেয়নি।”

এরপর বললেন, “হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ভালো করেই জানো যে, আমি এই বাক্যগুলো নিজের প্রশংসার জন্য নয়; বরং আমার মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছি।” এরপর তিনি মায়ের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করলে মা বললেন, “হে আল্লাহ, তুমি এর দীর্ঘ রাত্রি জাগরণ, মদিনা এবং মক্কায় উত্তপ্ত দুপুরের রোজা, ইবাদতে কান্নাকাটি এবং মা-বাবার খেদমতের কারণে হলেও এর উপর রহম করো। তার ভার আমি তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম। যা তোমার সিদ্ধান্ত তার উপরই আমি সন্তুষ্ট। সুতরাং আমার ছেলে আবদুল্লাহর বিনিময়ে আমাকে

---

[৪৮৩] তারিখুত তাবারি : ৬/১৮৮, ১৮৯

[৪৮৪] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৩/৯২; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১

ধৈর্যধারণকারী ও শোকর আদায়কারীদের সাওয়াব অর্জন করার তাওফিক দান করো।"[৪৮৫]

এরপর বললেন, "বেটা, আরেকটু কাছে এসো। আমি তোমাকে বিদায় দেবো।" এই বলে তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে চুমু দিলেন এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলালেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তখন পাতলা কুর্তার নিচে লুঙ্গি পরে ছিলেন। তার মা যখন এটা বুঝলেন তখন বললেন, "যারা জীবন নিয়ে খেলা করে তারা এমন পোশাক পরিধান করে না। বরং এমন পোশাক পরে যাও, যাতে তোমাকে বীর বীর দেখাবে।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তৎক্ষণাৎ সেই পোশাক খুলে অন্য পোশাক পরে নিলেন। সবশেষে মা তাকে এই বলে বিদায় দিলেন, "ধৈর্যধারণ করো। মনে রেখো, তোমার নানা আবু বকর সিদ্দিক এবং বাবা যুবাইর। আর তোমার দাদি সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব।"[৪৮৬] এরপর বললেন, "হে আমার প্রিয় ছেলে, নিজের অবস্থানেই অটল থেকো এবং তার উপরই মৃত্যুবরণ করো।"[৪৮৭] এই পর্যন্ত বলার পরেই তিনি নামাজ এবং দোয়ায় লিপ্ত হয়ে গেলেন।[৪৮৮]

হারামে সর্বশেষ নামাজ এবং নামাজের মুসতাহাবের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদুল হারামে এলেন।[৪৮৯] মুয়াজ্জিনকে আজানের নির্দেশ দিয়ে তিনি অজু করলেন। এরপর দুই রাকাত সুন্নাত খুব ধীরস্থিরতার সাথে পড়লেন।[৪৯০] মসজিদের দরজায় শামি সৈন্যরা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই ভয়ানক অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথিরা চাচ্ছিলেন খুব দ্রুত নামাজ শেষ করতে। তাই যখন তাকে কেউ বলল, "আমিরুল মুমিনিন, নামাজ পড়িয়ে ফেলুন।" তখনো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে

---

[৪৮৫] তারিখুত তাবারি : ৬/১৮৮, ১৮৯

[৪৮৬] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯০

[৪৮৭] আখবারি মাক্কা : ২/৩৩৭

[৪৮৮] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৩

[৪৮৯] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১

[৪৯০] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯১

যুবাইর রা. খুব শান্তভাবেই বললেন, “আগে তো সকাল হতে দাও।” কিছুক্ষণ পর আবার তাকে নামাজ পড়ানোর কথা বললেন তিনি একই উত্তর দিলেন। এরপর যখন ঠিক মুসতাহাব সময় এলো, প্রতিদিনই তিনি যে-সময় নামাজ শুরু করতেন, তখন তিনি সামনে গেলেন এবং নামাজ পড়ালেন।[৪৯১] নামাজে তিনি ধীরে-সুস্থে ‘সুরা কলাম’ তেলাওয়াত করলেন।[৪৯২] তার রুকু, সেজদা, তাকবিরসহ সবকিছু অন্যান্য দিন যেমন ছিল আজ তার সামান্য ব্যতিক্রমও হলো না।[৪৯৩]

জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি সর্বশেষ বক্তব্য

সালাম ফেরানোর পর তিনি হাতিমে চলে এলেন এবং সাদা খাপ থেকে তরবারি বের করলেন। এরপর তিনি তার সাথিদের দিকে দৃষ্টি দিলেন, যারা নিজেদেরকে আড়াল করে রেখেছিল এবং পাগড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বললেন, “রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আকাশের একটি দরজা খুলে গেলো এবং আমি সেখান দিয়ে প্রবেশ করলাম। আল্লাহর শপথ, আমি দুনিয়া থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছি। বয়সও ৭২ হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত যে, আজ আমি শহিদ হয়ে যাবো। হে আল্লাহ, আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করি। আপনিও আমার সাথে সাক্ষাৎকে আপনার পছন্দনীয় বানিয়ে নিন।” এইসময় তার মন চাইলো, যারা এই কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তেও তার সঙ্গ ছাড়েননি, তাদের চেহারা শেষবার একটু ভালো মতো দেখে নেওয়ার। তাই তিনি সাথিদের বললেন, “তোমাদের চেহারাগুলো আমাকে একটু দেখাও।” সকলেই তখন কাপড় সরিয়ে চেহারা বের করল। তিনি তাদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেরণা দিলেন এবং বললেন, “হে আমার বন্ধুগণ, তরবারির আঘাতকে ভয় করো না। তরবারি দিয়ে প্রথমে নিজেদেরকে সামনে থেকে হেফাজত করবে। সতর্ক থাকবে, যেন তরবারি হাতছাড়া না হয়ে যায়। কারণ তরবারি ছাড়া সৈন্য একজন অবলা নারীর মতো। সকলেই নিজেদের হেফাজতের দিকে খেয়াল রাখবে। আমার কথা চিন্তা করবে না। একথা জিজ্ঞেস করবে না

---

[৪৯১] আখবারি মাক্কা : ২/৩৩৭

[৪৯২] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯১

[৪৯৩] আখবারি মাক্কা : ২/৩৩৭

যে, আমি কোথায়। আমি ইনশাআল্লাহ সকলের সামনেই থাকব।[৪৯৪] আল্লাহর শপথ, আমি সর্বদা প্রথম কাতারে থেকেই লড়াই করি।[৪৯৫]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর শেষযুদ্ধ

সকাল হতেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আওয়াজ ভেসে এলো, "দরজায় খুব কড়াভাবে নজর রাখো। ইবনে যুবাইর যেন কোনোভাবেই পালিয়ে যেতে না পারে!"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হাজ্জাজের একথা শুনে বললেন, "এই দুর্ভাগা আমাকে তার আর তার বাবার মতো মনে করে, যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিল।[৪৯৬]

শামি সৈন্যরা বিভিন্ন দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথিরা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সিসাঢাল প্রাচীরের মতো। কেউ কেউ মসজিদুল হারামের ছাদ থেকে ইট পাথর মেরে শামের সৈন্যদেরকে প্রতিহত করছিল। সর্বপ্রথম একজন হাবশি মসজিদে ঢুকে গেলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তরবারি দিয়ে তার পায়ে আঘাত করলেন। হাবশি ব্যথায় চিৎকার করে বলতে লাগল, "হায়রে পাপাচারীর সন্তান!" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তখন উত্তরে বললেন, "ধ্বংস হও তুই! হজরত আসমাকে পাপাচারী বলছিস!!" এই বলে তিনি এমন আক্রমণ করলেন যে, হাবশির সাথি-সঙ্গী সকলেই মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হলো।[৪৯৭]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর প্রবাদপ্রতীম বীরত্ব

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যে দরজা দিয়ে আক্রমণ করতেন সেখান থেকে শামি সৈন্যরা পিছপা হতে বাধ্য হতো। হিমসের এক

---

[৪৯৪] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৮৩; আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২

[৪৯৫] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১

[৪৯৬] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৫; এটা ৬৫ হিজরির সেই যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত, যা মদিনার নিকটবর্তী স্থানে সংঘটিত হয়েছিল, যেখান থেকে হাজ্জাজ এবং তার বাবা পালিয়ে গিয়েছিল। তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৩

[৪৯৭] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১; আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২

সিপাহির বর্ণনা—"আমাদের দরজার সৈন্যরাই সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. একাই আমাদেরকে মেরে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং পিছু ধাওয়া করতে করতে একাই মসজিদের বাইরে চলে এসেছিলেন। তখন তার মুখে এই পঙ্‌ক্তি ছিল : (অর্থ) "আমি যখন আমার নির্ধারিত দিন সম্পর্কে জেনে যাই তখন দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটাই। আর সম্মানিত ব্যক্তিরাই তার এই নির্ধারিত দিন সম্পর্কে জানতে পারে। অথচ অনেকেই এমন অবস্থা জেনে-বুঝেও অস্বীকার করে বসে।" এই পঙ্‌ক্তি শুনে আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, সত্যিই আপনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান মানুষ।"[৪৯৮] বাবে বনি মাখযুম এবং বাবে বনি সাহাম দিয়ে জর্ডান ও হিমসের আলাদা আলাদা সৈন্যরা আক্রমণ করে কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাদেরকেও পিছপা করে দিলেন।[৪৯৯] এরপর তিনি সাথিদের জিজ্ঞাসা করলেন, "হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী মিসরের অধিবাসীরা কোন দিকে?" সাথিরা তখন বনুজামহের দিকে ইশারা করল। এরপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "আপনার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট এবং যেসব মুমিন আপনার অনুসরণ করেছে।" একথা বলে তিনি মিসরিদের উপর এমন আক্রমণ করলেন যে, তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে একেবারে 'দারে উম্মে হানি'তে নিয়ে তারপর থামলেন।[৫০০] এভাবে তিনি সৈন্যদেরকে ধাওয়া করতে করতে কয়েকবার আবতাহে পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে একাই সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন; কিন্তু কেউ সামনে আসার সাহস করতে পারল না। তার মুখে তখন এই পঙ্‌ক্তি ছিল- (অর্থ) "যদি আমার প্রতিপক্ষ একজনও থাকতো, তাহলে আমিই তার জন্য যথেষ্ট ছিলাম।" এই পঙ্‌ক্তি শুনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান বললেন, "আল্লাহর শপথ, যদি এক হাজারো থাকতো তাহলে আপনি একাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতেন।"[৫০১] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি রা. নিজেও খুব বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলেন। তখন তার মুখে ছিল এই পঙ্‌ক্তি- (অর্থ) "আমি সেই ব্যক্তি, যে হাররার

---

[৪৯৮] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯০; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩৩

[৪৯৯] আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২

[৫০০] আখবারি মাক্কা : ২/৩৩৭

[৫০১] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯০, ১৯১

যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরেছিল; কিন্তু উত্তপ্ত যুদ্ধ থেকে পলায়নের সুযোগ একবারই আসে। সুতরাং আমি আজ লড়াই করে সেই পলায়নের ক্ষতিপূরণ করছি।"[৫০২] হাজ্জাজ যখন দেখল, তার এতো এতো সৈন্য থাকা সত্ত্বেও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে কাবু করতে পারছে না তখন সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নিজে দৌড়ে এলো এবং সৈন্যদেরকে মসজিদের দিকে হাঁকাতে থাকল। আর পতাকাবাহীকে সামনে অগ্রসর হতে বলল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শত্রুদের উপর তেমনই আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করছিলেন। এরপর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মাকামে ইবরাহিমের কাছে এসে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে দাঁড়ালেন। এই ফাঁকে শত্রুবাহিনী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পতাকাধারীর উপর উপর্যুপরি আক্রমণ করে পতাকা ছিনিয়ে নিলো। ততক্ষণে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নামাজ শেষ করে ফেলেছিলেন। সালাম ফিরিয়েই তিনি আবার শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।[৫০৩]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর শাহাদাত

শামের সৈন্যদের আক্রমণ অব্যাহতভাবে চলতে থাকল এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথিরাও এক এক করে শহিদ হতে থাকলেন। এরপর যখন প্রায় সকলেই শহিদ হয়ে গেলো তখন শত্রুরা একত্রে ভেতরে প্রবেশ করে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে রুকনে ইয়ামানি এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি জায়গায় ঘিরে ফেলল।[৫০৪] এসময় একটি ইট এসে তার মাথায় লেগে

[৫০২] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৭

[৫০৩] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৫

[৫০৪] তাবারানি ইবরাহিম থেকে, তিনি ইসহাক থেকে যে বর্ণনা করেছেন, সেই অনুযায়ী এই পাথর বা ইটটি মূলত ভেঙ্গে যাওয়া ছাদ থেকে ছিটকে এসে পড়েছিল। আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯১; তবে তাবারানি কাসেম ইবনে মিআন থেকে যে বর্ণনা করেছেন, সেই অনুযায়ী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর কিছু সাথি যারা মসজিদের ছাদ থেকে প্রতিপক্ষের উপর পাথর নিক্ষেপ করছিল সেখান থেকে একটি ইট ভুলে এদিকে ছুটে আসে এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর মাথায় লেগে যায়। আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯৩; তাবারানি কাসেম থেকে, তিনি কাসেম ইবনে মিআন থেকে যে বর্ণনা করেছেন, বর্ণনাটি হাসান। এটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। তাই বলে শামবাসী কর্তৃক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর

যায়।[৫০৫] ফলে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের ধারা। রঞ্জিত হয়ে পড়ে তার পবিত্র চেহারা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তখন এই পঙ্‌ক্তি পড়ছিলেন- "আমরা তেমন নই, যাদের যখম থেকে রক্ত গড়িয়ে পেছনে পড়বে; বরং আমাদের রক্ত তো গড়িয়ে আমাদের পায়ে এসে পড়ে।"[৫০৬] এরপর তিনি ধীরে ধীরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন এবং মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেলেন। তখন তার মুখে এই পঙ্‌ক্তি ছিল- (অর্থ) "হে আসমা, যদি আমাকে শহিদ করে দেওয়া হয় তাহলে আমার জন্য ক্রন্দন করো না। কারণ আমার বংশ ও দীন ছাড়া কিছুই বাকি থাকবে না এবং সেই তরবারি যা আমার ডান হাত সহজেই ভালো চালাতে পারে।"[৫০৭] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. দাঁড়ানোর অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ একজন শামি সৈন্য তাকে এমন অবস্থায় দেখে আক্রমণ করে বসল। তখন তিনি ডান হাতে তরবরি নিয়ে শত্রুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তার দুই পা কেটে গেলো। ততক্ষণে অনেক সৈন্যই এসে গিয়েছিল এবং সকলেই একযোগে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর হামলে পড়েছিল। কিন্তু তখনো তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করে তরবারি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[৫০৮] এরপর তিনি যখন একেবারেই নিস্তেজ হয়ে গেলেন তখন দুজন হাবশি গোলাম এই কথা বলতে বলতে সামনের দিকে অগ্রসর হলো যে, "গোলামদের কাজ হলো নিজের মনিবকে সহায়তা করা।" এরপর তারা উভয়ে একের পর এক আঘাত করতে করতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে শহিদ

রা. কে শহিদ করার বিষয়টি মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ নেই। যেমন ইট লাগার কারণে কেউ কেউ এই দাবি করে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে শামিরা নয়; বরং তার সাথিদের আঘাতেই শহিদ হয়েছেন। প্রথমত এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কারো থেকে এমন ভুল হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, এই বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকু সাব্যস্ত হয় যে, ইট লাগার কারণে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কিছুটা আহত হয়েছিলেন। কিন্তু এরপর এটাই প্রমাণিত বিষয় যে, শামিরা তাকে শহিদ করে দিল এবং দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলল।

[৫০৫] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩২

[৫০৬] আল-মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১; মাজমাউয যাওয়াইদ : ৭/২৫৫ তারিখুত তাবারি : ৬/৯২

[৫০৭] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩২; মাজমাউয যাওয়াইদ : ১২০৮৫

[৫০৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৮৪

করে দিলো।[৫০৯] ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দুঃখজনক এই ঘটনা ৭৩ হিজরিতে জুমাদাল উখরার ১৭ তারিখ সংঘটিত হয়েছিল। তার সাথে যারা শহিদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে তার ছেলে উরওয়া, ভাই হামজা, ভাতিজা মুয়াবিয়া ইবনে মুনযির, আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে উমারা, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বংশধর আবদুল্লাহ এবং প্রসিদ্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মুতি রা. শামিল ছিলেন।[৫১০]

মক্কায় আহাজারি

হজরত আসমা রা. জানতেন নিজের ছেলের পরিণাম কী হবে। তাই তিনি একটি কাফনে সুগন্ধি লাগিয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সেইসাথে মসজিদুল হারামের দরজায় কয়েকজন পরিচারিকাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, যাতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. শহিদ হতেই তাকে খবর দেওয়া হয়।[৫১১] যখন হজরত

---

[৫০৯] আল মু'জামুল কাবির : ১৩/৯২; হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩১; হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৭/২৫৫; হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, "হাইসামি বলেছেন, বর্ণনায় রয়েছেন আবদুল মালেক ইবনে আবদুর রহমান আযযিমারি। তাকে ইবনে হিব্বান রহ. সিকাহ বলেছেন আর আবু যুরআ এবং অন্যরা যয়িফ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমার কথা হলো : ইমাম হাইসামি এখানে ভুল করেছেন। বর্ণনায় যিনি আছেন তিনি হলেন আবদুল মালেক ইবনে আবদুর রহমান আশশামি। আর আবদুল মালেক ইবনে আবদুর রহমান আযযিমারি হলেন আরেকজন। আর এই পার্থক্যটাকে হাফেজ ইবনে হাজার আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, আবু হাতেম এবং বুখারি এই শামি এবং যিমারির মাঝে পার্থক্য করেছেন। আর তারা উভয়েই আমর ইবনে আলি থেকে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে আসলে সঠিক হলো দুজনকে অর্থাৎ শামি এবং যামিরিকে পৃথক ও আলাদা ব্যক্তি ধরা। কারণ শামির কুনিয়্যাত হলো আবুল আব্বাস। তিনি আউযায়ি এবং ইবরাহিম ইবনে আবি ইলাহ থেকে বর্ণনা করতেন। আর বুখারি তার থেকে বর্ণিত হাদিসকেই মুনকার বলেছেন। আর আবু যুরআহ তার অনুসরণ করেছেন। তা ছাড়া আমর ইবনে আলি তাকে যয়িফ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আর যিমারি যার কুনিয়াত ছিল আবু হিশাম। আর তার দাদার নামও ছিল হিশাম। আবু হাতেম যাকে শায়েখ বলেছেন। আর বুখারিও তাকে নিয়ে কোনো জরাহ বা তাদিলে যাননি। তবে ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। তা ছাড়া আমর ইবনে আলিও তাকে সিকাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

[৫১০] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩৪ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান রহ.-এর মাথাও কেটে শামে পাঠানো হয়েছিল। আখবারি মাক্কা : ২/৩৩৯

[৫১১] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৮

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কিছুটা আঘাত পেয়ে পড়ে গেলেন তখন এইটা দেখে একজন পরিচারিকা মসজিদুল হারামের দিকে ইশারা করে দুঃখপ্রকাশ করে বলল, "হায়, আমিরুল মুমিনিন!"[৫১২] এই কথা ছড়িয়ে পড়তেই ভারী হয়ে উঠল মক্কার আকাশ-বাতাস। আহাজারিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল চারিদিক।[৫১৩] তখন সাথে সাথেই এক শামি সৈন্য জয়ধ্বনি উচ্চকিত করল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হজ শেষ করে মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন। তার তখন সেইদিনের কথা স্মরণ হয়ে গেলো যেদিন মদিনায় নবীজির সাহাবি হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর ঘরে একটি শিশুজন্মের আনন্দে সাহাবিগণ তাকবিরধ্বনি তুলেছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. সেই দৃশ্য স্মরণ করে নিজের অনিচ্ছাতেই বলে উঠলেন, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম আনন্দে তাকবির দানকারী সেইসব সাহাবি তার হত্যায় জয়ধ্বনি প্রকাশকারী লোকদের চেয়ে কতো উত্তম ছিলেন!"[৫১৪] হজরত আসমা রা. নিজের ছেলের কাফন-দাফনের জন্য অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু ততক্ষণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা কেটে নিয়েছিল, যা সে আবদুল মালেকের কাছে পৌঁছানোর জন্য দামেশকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেইসাথে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ মহাসড়কে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দিলো।[৫১৫] এরপর মক্কা উপত্যকায় যাওয়ার পথে 'সানিয়াতুল কাদা' নামক ঘাঁটিতে একটি খাম্বা গেড়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা-কাটা লাশ উলটো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[৫১৬] আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এমনটাই ছিল। এটাই ভাগ্যের লিখন ছিল, যেভাবে গারে সাওরের দুই বন্ধু সফর ও হজরে একসাথে হাশর পর্যন্ত ছিল তেমনই তাদের দুই নাতির জীবন থেকে শাহাদাত পর্যন্ত তারা একইভাবে ও একই অবস্থানে অটল ছিল।

---

[৫১২] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯২ হয়তো এই বাঁদি মসজিদুল হারাম থেকে একটু দূরের কোনো পাহাড়ে অবস্থান করছিল। তাই তার আওয়াজ দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল।

[৫১৩] তারিখে দিমাশক : ১২/১২০

[৫১৪] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩০

[৫১৫] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৮

[৫১৬] সহিহ মুসলিম : ৬৬৬০; মুসনাদে আহমাদ : ২৬৯৭৪

লাশের সাথে হাজ্জাজের নির্মমতা

হজরত আসমা রা. হাজ্জাজ থেকে লাশ কাফন-দাফনের অনুমতি চাইলেন; কিন্তু সে লাশের আশপাশে কঠোর পাহারাদারির আদেশ দিয়ে বলল, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত আছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই লাশ যেন এখানেই ঝুলে থাকে।"[৫১৭]

একথা যখন হজরত আসমা রা. জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ তায়ালা যেন এই নিষ্ঠুরকে ধ্বংস করে দেন, যে আমার ছেলেকে দাফনের অনুমতি পর্যন্ত দিলো না।"[৫১৮]

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই কষ্ট দেখে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার কাছে এলেন এবং সমবেদনা জানিয়ে বললেন, "আসলে এই শরীর কিছুই না। কারণ রুহ তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই চলে যায়। সুতরাং আপনি এখন ধৈর্যধারণ করুন।"

একথা শুনে হজরত আসমা রা. বললেন, "আমি ধৈর্যধারণ করব না কেন! অবশ্যই করব। কারণ, হজরত ইয়াহইয়া আ.-এর মাথাও কেটে একজন নিকৃষ্ট ও পাপাচারী মহিলার কাছে পাঠানো হয়েছিল।"[৫১৯]

নবীজির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সর্বশেষ খলিফা, আফ্রিকা-বিজেতা, সাহাবি-যুগের শেষশাসক এবং কুরাইশ বংশোদ্ভূত এই মহান মনীষীর লাশ সানিয়াতে কাদায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। কুরাইশরা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখতে দেখতে পথ পাড়ি দিচ্ছিল।[৫২০] এরপর তৃতীয় দিন হজরত আসমা রা. একটি সওয়ারিতে আরোহণ করে সেখানে গেলেন। কিন্তু বীরত্বে ভরা এই মায়ের ভেতর সামান্য কোনো পরিবর্তন এলো না। তবে তিনি শুধু একথা বললেন যে, "এখনো কি এই শাহসওয়ারকে নামানোর সময় হয়নি?"[৫২১]

---

[৫১৭] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৯
[৫১৮] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১২৮
[৫১৯] আখবারি মাক্কা : ২/৩৫১
[৫২০] সহিহ মুসলিম : ৬৬৬০
[৫২১] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩৩

হাজ্জাজের বেআদবি এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মেয়ের দৃষ্টান্তহীন সত্যকথন

হাজ্জাজ যখন হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই মনোভাবের কথা জানতে পারল তখন তার খুব রাগ হলো। কারণ সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশটা মূলত ঝুলিয়েছিল তাকে অপমানিত করার জন্য। কিন্তু হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটিমাত্র কথা তার সবকিছুর গোড়ায় পানি ঢেলে দিলো। তাই হাজ্জাজ হজরত আসমা রা. কে ডেকে আনার নির্দেশ দিলো। কিন্তু তিনি এই অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তাই হাজ্জাজের কাছে আর গেলেনও না।

এরপর হাজ্জাজ আবার এই সংবাদ দিয়ে একজন লোক পাঠাল যে, "যদি নিজে নিজে এসে যান তাহলে তো ভালো। নয়তো আমি এমন লোক পাঠাবো, যারা আপনাকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে আসবে।" হজরত আসমা রা. উত্তরে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাদেরকেই পাঠাও, যারা আমাকে চুলে ধরে নিয়ে যাবে।" একথা শুনে হাজ্জাজ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। রেগেমেগে নিজেই হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে চলে গেলো এবং বলল, "দেখেননি, আপনার পথভ্রষ্ট ছেলের পরিণাম আমি কী করেছি!"

হজরত আসমা রা. বললেন, "আমি তো শুধু এটা দেখলাম যে, তুই তার দুনিয়া বরবাদ করে দিলি আর সে তোর আখেরাত বরবাদ করে দিয়েছে।" এই উত্তরের পর হাজ্জাজ নির্বাক হয়ে গেলো। আর একটি বাক্যও উচ্চারণ করতে পারল না। হজরত আসমা রা. আবার বললেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, তুই নাকি তাকে দুই ফিতাওয়ালি মহিলার ছেলে বলে ব্যঙ্গ করতিস। আল্লাহর শপথ, আমিই সেই দুই ফিতাওয়ালি। কিন্তু তুই আমাকে কোন দুই ফিতার কথা বলে লজ্জা দিচ্ছিস, যেগুলোর একটি দিয়ে আমি নবীজি ও হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামানা বেঁধে দিয়েছিলাম নাকি সেই ফিতা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত নারীই ঘরের কাজের সুবিধার্থে গায়ে বেঁধে থাকে?"[৫২২] সত্য কথার এই ধারালো অস্ত্র হাজ্জাজের ভেতর

---

[৫২২] সহিহ মুসলিম : ৬৬৬০; এবং ইমাম আহমাদ রহ. তার মুসনাদেও বর্ণনা করেছেন, ২৬৯৬৭

পর্যন্ত কেটে দু টুকরা করে দিলো। হাজ্জাজ তখন শুধু এই কথাটা বলল যে, "সে তো মুনাফিক ছিল।"

হজরত আসমা রা. তখন বললেন, "নারে, মুনাফিক নয়। সে ছিল রোজাদার, তাহাজ্জুদগুজার এবং সৎকর্মশীল।"

হাজ্জাজ একথারও কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে বলল, "বুড়ি কোথাকার! যা তুই চলে যা। কারণ তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

হজরত আসমা রা. আবার উত্তরে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমার মাথা ঠিকই আছে।"[৫২৩] এরপর হাজ্জাজের মুখে ছাই-কালি মাখানোর জন্য এই হাদিসটি পড়লেন, "নবীজির সেই কথা আমার খুব স্মরণ আছে যে, বনু সাকিফ থেকে একজন কাজ্জাব এবং রক্তপিপাসু বের হবে। কাজ্জাবকে তো আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু এখন তোকেই মনে হচ্ছে বনু সাকিফের সেই রক্তপিপাসু।"[৫২৪] হাজ্জাজ এই কথা অস্বীকার করতে পারল না। বরং বলল, "আমি রক্তপিপাসু ঠিক; কিন্তু মুনাফিকের রক্তপিপাসু।"

হজরত আসমা রা. তৎক্ষণাৎ বললেন, "আরে তুই নিজেই তো মুনাফিকদের সরদার।"

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ধৈর্য এবং ইনতেকাল

হজরত আসমা রা. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশের পাশে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া-দরুদ পড়তে থাকলেন। কিন্তু এর মধ্যে চোখ থেকে একটা ফোঁটা পানিও বেরিয়ে আসেনি। অতঃপর এই বলতে বলতে চলে গেলেন, "লোকেরা মিথ্যার জন্য প্রাণ দিয়ে দেয়; কিন্তু বেটা, তুমি তো হক ও সত্যের জন্য জীবন দিয়েছো।"[৫২৫] সন্তানের শাহাদাতের পাঁচ কি দশদিন পর তিনি নিজেও ইনতেকাল করলেন।[৫২৬]

---

[৫২৩] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৩৩ তারিখে দিমাশক : ২৮/২২৭

[৫২৪] সহিহ মুসলিম : ৬৬৬০

[৫২৫] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩০; এবং ইমাম হুমাইদি তার মুসনাদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন, ৩২৮

[৫২৬] তারিখে দিমাশক : ২৮/২৩৭

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর বাণী

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একটি উটে করে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেই খাম্বার কাছে গিয়ে উটনিটি অস্থির হয়ে উঠল, যেখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ ঝুলানো ছিল। এটা দেখে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কেঁদে দিলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে ফেললেন, "আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা খুবায়েব! আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। আল্লাহ সাক্ষী। আমি তোমাকে এই বিপজ্জনক পথ থেকে আগেই সতর্ক করেছিলাম। আল্লাহর শপথ, আমি যতদূর জানি, তুমি অনেক রোজা রাখতে, নফল পড়তে এবং সবার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে। যে উম্মতের সবচেয়ে খারাপ লোকটাও তোমার মতো হবে সেই উম্মতের মধ্যে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণই থাকবে।"[৫২৭]

শেষ এই উক্তির উদ্দেশ্য হলো, তোমার হত্যাকারী তোমাকে সবচেয়ে খারাপ বলছে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে মন্দ আখ্যাদানকারীরা যদি তোমার মতো ফেরেশতাসুলভ মানুষকে এমন বলে তাহলে উম্মতের মধ্যে যারা ভালো ও নেককার হিসেবে পরিচিত তাদের অবস্থা কেমন হবে!

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর লাশের অমর্যাদা এবং কাফন-দাফন ব্যতীতই নিক্ষেপ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ অপমানিত করার জন্য এমনিতে তো মহাসড়কেই ঝুলিয়ে রেখেছিল; কিন্তু এরপর যখন দেখল যে, এই মহান ব্যক্তির লাশের সামনে এসে অনেক বড় বড় সাহাবি ও তাবেয়ি প্রশংসা করছেন তখন সে আরো রেগে গেলো এবং লাশ সেখান থেকে নামিয়ে তার পরিবারকে না দিয়ে ইহুদিদের কবরস্থানে নিক্ষেপ করে দিলো।[৫২৮] কিন্তু এরপরও সে কাফন-দাফন ও জানাজার নামাজের অনুমতি দেয়নি। এটা ছিল জুলুমের শেষচূড়া।

---

[৫২৭] তারিখুত তাবারি : ৬/১৯০

[৫২৮] সহিহ মুসলিম : ৬৬৬০

আবদুল মালেকের সাথে উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. এর সাক্ষাৎ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর শহিদ হওয়ার পরপরই তার ভাই হজরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. একটি দ্রুতগামী বাহনে আরোহণ করে দামেশকের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।[৫২৯] কারণ হাজ্জাজের দিক থেকে অনেক আশঙ্কা ছিল যে, সে হয়তো এবার তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদে হাত দেবে। এ ছাড়াও নিজ ভাইয়ের কাফন-দাফন করার অনুমতিও আনার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া আবদুল মালেকের সাথে যেহেতু অনেক পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল; তাই তার থেকে সহনশীল আচরণ আশা করাটাও তেমন বোকামি ছিল না। এদিকে হাজ্জাজ যখন এই সংবাদ জানলো তখন আবদুল মালেকের কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠাল, যেখানে উরওয়া দামেশকে গেলে তাকে বন্দি করে আবার হিজাজে পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ ছিল।

এরপর উরওয়া যখন আবদুল মালেকের কাছে গেলো তখন তিনি আবদুল মালেকের ক্ষমতা মাথানত করে মেনে নিলেন এবং নিজের জীবনের নিরাপত্তা আদায় করে নিলেন। সেইসাথে ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ দিয়েও এই আবেদন করলেন যে, আমার ভাইয়ের লাশ যেন কাফন-দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়। এখনো আলাপ-আলোচনা শেষ হয়নি এমন সময় হাজ্জাজের চিঠি এসে দরবারে পৌঁছল। আবদুল মালেক পড়ে জানতে পারল যে, হাজ্জাজ উরওয়াকে গ্রেফতার করতে চায়। তাই সে সৈন্যদের ডেকে বলল, "উরওয়াকে হাতকড়া পরাও।" তখন উরওয়া বলল, "আমি তো তোমার কাছ থেকে নিরাপত্তা নিয়েছি।"

আবদুল মালেক তার উত্তরে বলল, "অবশেষে আমাকে তো হাজ্জাজের কথা শুনতেই হবে।" একথা শুনে রাগে হজরত উরওয়া দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, "যাকে তোমরা হত্যা করে দাও সে অপমানিত বা লাঞ্ছিত

---

[৫২৯] হজরত উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহ. মহান তাবেয়ি এবং অনেক বড় একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। হজরত আয়েশা রা.-এর অধিকাংশ বর্ণনা তার মাধ্যমেই এসেছে। সিহাহ সিত্তা এবং মুওয়াত্তা মালেকে তার বর্ণিত এমন কিছু হাদিস আছে, যেগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা রা. থেকে। সেই হাদিসের সংখ্যা হলো ১২৫৯টি। শুধু বুখারিতেই এমন আছে ৩৭৭টি।

নয়। বরং লাঞ্ছিত হলো তারা, যাদের উপর তোমাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।" হজরত উরওয়ার এই কথা শুনে আবদুল মালেক নিরুত্তর ও নীরব হয়ে গেলো। তারপর তার হাতকড়া খোলার আদেশ দিয়ে হাজ্জাজকে এই আদেশ দিলো যে, উরওয়াকে কোনো কষ্ট দিয়ো না। সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ তার মায়ের হাওলা করে দাও।[৫৩০]

এক মাস পর ইবনে যুবাইর রা. এর কাফন-দাফন

হজরত উরওয়া রহ. এক মাস পর ঘরে ফিরলেন। নিজ ভাইয়ের লাশ এবার তার হাওলা করা হলো। এরপর তিনি জানাজা পড়িয়ে হুজুন নামক কবরস্থানে দাফন করলেন।[৫৩১] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর থেকে প্রায় এক মাস পর্যন্ত সুগন্ধি আসতে থাকল, যা তার নিখুঁত ব্যক্তিত্বের সূর্যসম স্পষ্ট প্রমাণ। [৫৩২]

(অর্থ) আকাশ যেন তোমার সমাধিতে শিশির বর্ষণ করে,
সবুজ গালিচা যেন এ ঘরকে ছায়া দান করে।

উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশ, বোধ ও বুদ্ধিতে প্রখর, বীরত্ব ও সাহসিকতায় অদ্বিতীয় এবং ইলম ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত এই মহান মনীষীর দেহ বিলীন হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের নেতৃত্বের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে, যে যুগ নিয়ে মানুষজন গর্ব করতো, যে যুগের শুরু হয়েছিল হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আর শেষ হয়েছিল তারই নাতি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে।

---

[৫৩০] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩১

[৫৩১] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৩১; এই বর্ণনায় একথাও আছে যে, তার গোসল দিয়েছিলেন তার মা। এটা সম্ভবত বর্ণনাকারীর ভুল ধারণা। কারণ, প্রথমত এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য বর্ণনা থেকে যেটা জানা যায়, ততদিনে হজরত আসমা রা.-এর ইনতেকাল হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া একজন ভাই এবং সন্তান থাকতে বৃদ্ধ এবং অন্ধ মাকে গোসল করানোর মতো কষ্টকর কাজে ঠেলে দেওয়াটাও আমাদের চিন্তা পরিপন্থি। লাশের কাফন দাফনের ক্ষেত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সুপারিশেরও অনেক ভূমিকা রয়েছে।

[৫৩২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/২১১

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং মুসআব ইবনে যুবাইর রা. এর শাহাদাতে মুসলমানদের দুঃখ ও আফসোস

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্মন্তুদ শাহাদাতের ঘটনায় মুসলমানরা চিন্তা, অস্থিরতা ও দুঃখের বানে ভেসে গেলো। সাধারণ মানুষ কেঁদে আর কবিরা তাদের কবিতার মাধ্যমে সেই দুঃখ কিছুটা উপশমের চেষ্টা করেছে। নুয়াইম ইবনে মাসউদ শাইবানি বলেছিল, "শোনো, হজরত মুসআব এবং তার ভাইয়ের পর দীন ও ধর্ম একদম অপরিচিত হয়ে পড়েছিল। তাই আমি তাদের মৃত্যুর পর আমার কান বন্ধ করে নিয়েছি এবং আমার নাক কেটে দিয়েছি। তারা এমন সুপুরুষ ছিলেন যে, বছরে দু'বার করে তোহফা ও বখশিশ দিতেন। তারা এমন বৃষ্টি ছিলেন যে, তাতে আমরা সজীব ও শ্যামল হয়ে উঠতাম। নবীজির সঙ্গীর ছেলের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। কারণ আল্লাহ তায়ালাই দান করেন এবং তিনিই দেওয়া বন্ধ করে দেন।"[৫৩৩]

আমর তার কবিতায় বলেছিল, (অর্থ) "তোমাদের কসম, আমি লোকদের কোনো প্রয়োজন বাকি থাকতে দিইনি। আর না আমি এতে কামনার বশবর্তী হয়েছি আর না দোদুল্যমান হয়েছি। সেই সকালে মুসআব যখন আমায় ডাকলেন তখন সাথে সাথে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং বলেছি, আহলান ওয়া সাহলান ওয়া মারহাবা। আপনার বাবা নবীজির সঙ্গী এবং তার তরবারি ছিলেন। আর তিনি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত অনুগ্রহে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন। তিনি আপনার ভাই, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে থেকে আলোকিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কায় আমাদের ডাকলেই আমরা বলে উঠতাম লাব্বাইক। অথচ এই যুগ মুসআবকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আপনি মানুষের জিম্মায় থেকেই মৃত্যুর পেয়ালা থেকে পানি পান করে নিয়েছেন, যদিও তাদের সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।"[৫৩৪]

---

[৫৩৩] আখবারি মাক্কা : ২/৩৫২

[৫৩৪] তারিখে দিমাশক : ২৮/২৫৬

সুওয়াইদ ইবনে মানজুফ তার কবিতায় বলেছিল, (অর্থ) "শোনো, এই তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারী উগ্রপন্থিদের বলে দাও, মুসআবের পর এই রাত অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। তার ভাইয়ের পর, যিনি মক্কায় মুকিম ছিলেন, আমরা হয়ে উঠেছি অপমান ও অপদস্থতার মূল নিদর্শন, যা সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কলুষিত করেছে। এখন আমরা সেই বকরিপালের মতো হয়ে গেছি, যার রাখাল হারিয়ে গেছে এবং ওরা অন্ধকার রাতে নেকড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তাই এখন আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই দুজনের জন্য কাঁদতেই থাকব এবং প্রশংসা করেই চলবো। আর এ অবস্থান থেকে আমি কখনোই সরে আসবো না। তারা যে-দুজনই ছিলেন, তারা ছিলেন লোকদের মধ্যে নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সুতরাং এখন কি আর চাওয়া-পাওয়ার মতো কিছু বাকি আছে! আমি স্পষ্টই দেখছি যে, তারা চলে যাওয়ার পর দীন ও দুনিয়ার সবকিছু হয়ে উঠেছে আনকা পাখির মতো দুর্লভ। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে এসব গুণগান তাদের জন্য রহমতের দোয়াস্বরূপ এবং এমন উত্তপ্ত বস্তুস্বরূপ, যা সবর্দা আমার মনে দুঃখ হয়ে বাকি থাকবে।[৫৩৫]

কায়েস ইবনে হাইসাম, যিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং হজরত মুসআব রহ. এর বন্ধু ছিলেন। তিনি তার জজবা প্রকাশ করেছেন এইভাবে—"আমরা মুসআব এবং তার ভাইকে হারিয়েছি তখন, যখন অবলা আকাশ তাদের সঙ্গ দেয়নি। আমাদের নিয়ে কেউ কখনো সামান্য মন্দ কিছু করার দুঃসাহস দেখানোর চিন্তাও করতে পারেনি। তখন আমরা নিজেদের মহলে চাদর টেনে টেনে ঘুরে বেড়াতাম। এ ছিল তখনকার অবস্থা, যখন আমরা পূর্ণ নিরাপদে থাকতাম। আর যখন আমরা বিপদসঙ্কুল অবস্থায় থাকতাম তখন ঘোড়ায় আরোহণ করতাম এবং বর্মের নিচে ছোট পোশাক পরিধান করার কষ্ট করতাম না। যারা আমাকে শত্রুতার নিশানা বানাতো আমরাও তাদেরকে শত্রুতার নিশানা বানাতাম। হায়, এই দুজনের পর (আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং মুসআব) আমরা তো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে গেছি। হায় আফসোস,

---

[৫৩৫] আখবারি মাক্কা : ২/৩৫৯; তারিখে দিমাশক : ২৮/২৫৬, ২৫৭

আমার থেকে যা কিছু ছুটে গেছে। যদিও আমি সেইসকল শহিদের সাথে শামিল হয়ে যেতে পারতাম![৫৩৬]

ইবনে যুবাইর রা. খলিফায়ে হক এবং তার বিরোধিতাকারীরা রাষ্ট্রদ্রোহী

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ছিলেন তার যুগের খলিফায়ে হক এবং তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী শামি সৈন্যরা নিঃসন্দেহে অবাধ্য ও রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল। অধিকাংশ আলেম এ মতাদর্শই গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনে হাযম জাহেরি রহ. লিখেছেন, "মারওয়ান আমিরুল মুমিনিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং নিজে খেলাফতের দাবি করেছিল।"[৫৩৭]

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনচরিত আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে এই শিরোনাম কায়েম করেছেন, "তরজামায়ে আমিরুল মুমিনিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.।"[৫৩৮] এরপর তিনি লিখেছেন, "তার বাইয়াত ৬৪ হিজরিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর লোকেরা তার সময়কালে কল্যাণই পেয়েছিল।"[৫৩৯] হাফেজ ইবনে কাসির রহ. প্রায় ২০ পৃষ্ঠাজুড়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। একপর্যায়ে তিনি বলেছেন, "তিনি আলেম ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন, প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, নামাজ ও রোজায় অভ্যস্ত ছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক মজবুত অবস্থানে ছিলেন।"[৫৪০]

এরপর শেষদিকে বলেছেন, "তিনি সব উত্তম গুণের আধার ছিলেন। তার ক্ষমতা লাভের পদক্ষেপগুলো ছিল একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।

---

[৫৩৬] তারিখে দিমাশক : ২৮/২৫৫, ২৫৬ কায়েস ইবনে হাইসামকে অধিকাংশ আলেমই সাহাবি হিসেবে গণ্য করেছেন। যদিও তার থেকে কোনো রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়নি। ইমাম বুখারিও একথাই বলেছেনে যে, তিনি সাহাবি ছিলেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার এবং আবু নুয়াইম ইসপাহানিও একথাই বর্ণনা করেছেন। তবে কেউ কেউ তাকে তাবেয়িদের মধ্যে গণ্য করেন।

[৫৩৭] আনসাবুল আরব : ৮৭

[৫৩৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৮৬

[৫৩৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৮৭

[৫৪০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/২০৪

মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের পরে তো তিনিই খলিফা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মারওয়ান থেকে অনেক উত্তম ছিলেন। কারণ সে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তার বিরোধিতা করেছিল।"[৫৪১]

ইমাম নববি রহ. বলেন, "হকপন্থিদের বিশ্বাস হলো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মজলুম ছিলেন। হাজ্জাজ এবং তার সাথিরা রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত ছিল।"[৫৪২]

হাফেজ জাহাবি রহ. লিখেছেন, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহাবিদের মধ্যে গণ্য করা হয়; কিন্তু আসলে তিনি ইলম, আমল, জিহাদ ও ইবাদতে ছিলেন অনেক বড়মাপের ব্যক্তিত্ব।" এরপর তিনি লিখেছেন, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার যুগে কুরাইশদের শাহসওয়ার ছিলেন। আর তার যুদ্ধ-জীবনের অবদান অনেক প্রসিদ্ধ।"[৫৪৩]

মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য করে হাজ্জাজের ভাষণ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতে মক্কাবাসীরা ছিল অনেক চিন্তিত, পেরেশান ও পর্যুদস্ত। আর হাজ্জাজ যেহেতু এতে শতভাগ অংশীদার ছিল; তাই লোকেরা তাকে সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু হাজ্জাজ তাদেরকে শান্ত করার জন্য বক্তৃতা-ভাষণসহ যা করা যায় তার সবই করল। একপর্যায়ে এক সমাবেশ ডেকে সে তাতে বলল, "হে মক্কাবাসী, আমি জানতে পেরেছি তোমরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতে খুবই ব্যথিত ও চিন্তিত। মেনে নিলাম তিনি উম্মতের অনেক বড় ও ভালো একজন ছিল। কিন্তু সে আসলে ভেতরে ভেতরে খেলাফত লাভের লোভ করতো এবং সে কারণে খলিফায়ে হকের বিরোধিতাও করতো। ফলে সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের পথ থেকে সরে গিয়েছিল। হজরত আদম আ. তার শ্রেষ্ঠত্ব

---

[৫৪১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/২০৬

[৫৪২] শরহে মুসলিম : ২৫৪৫

[৫৪৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৬৩, ৩৬৪

এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের কারণে ফেরেশতাদের সিজদা পেয়েছিল আবার ঠিক আল্লাহর কথার অবাধ্যতার কারণে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এখন চিন্তা করো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তো আর আদম আ. থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। তা ছাড়া সে মূলত আল্লাহ তায়ালার কিতাব পরিবর্তন করে দিয়েছিল।" সেই মজলিসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাজ্জাজের এসব অনৈতিক কথা সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "তুমি মিথ্যা বলছো, মিথ্যা বলছো, মিথ্যা বলছো। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. আল্লাহ তায়ালার কিতাব কখনোই পরিবর্তন করেননি। এমন সে কখনোই করতে পারে না।[৫৪৪] বরং তিনি তো আল্লাহ তায়ালার কিতাবের অনুসরণ এবং তার উপর আনুগত্যকারী ছিলেন।"[৫৪৫] হাজ্জাজ তখন বলল, "চুপ থাকো। তুমি এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছো। তোমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। সাবধান! এমন যেন না করতে হয় যে, তোমাকে গ্রেফতার করে গর্দান উড়িয়ে দিই এবং তোমার লাশ টেনে টেনে নিয়ে শিশুদের খেলা দেখাই।"[৫৪৬]

---

[৫৪৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৮৪; বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

[৫৪৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৮৫

[৫৪৬] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৮৪ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা

১. খালেদ ইবনে সামির: আবু দাউদ এবং নাসায়ির বর্ণনাকারী: ইমাম নাসায়ি রহ. তাকে সিকাহ রাবি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে হিব্বান রহ. তাকে সিকাহ হিসেবেই গণ্য করেছেন।

২. আল আসওয়াদ ইবনে শাইবান: মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসঈর রাবি। তার ওয়াফাত হলো ১২০ হিজরিতে। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন তাকে সিকাহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আবু হাতেম তার ব্যাপারে বলেছেন, সালেহুল হাদিস। তাহযিবুল কামাল : ৩/২২৫

৩. মুসলিম ইবনে ইবরাহিম: বুখারি এবং মুসলিমের রাবি। তার ইনতেকাল হয়েছে ২২১ হিজরিতে। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন তার ব্যাপারে বলেছেন, "সিকাতুন, মামুনুন। তাহযিবুল কামাল : ২৭/৪৯০

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর সময়কালের উপর দৃষ্টিপাত

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ইসলামি ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামের সর্বশেষ অধ্যায় ছিল। তার সময়ে সম্পত্তি, প্রাসাদ ও অট্টালিকার ক্ষেত্রে খুব একটা সমৃদ্ধি না হলেও কাবাঘর তিনি হজরত ইবরাহিম আ.-এর ইচ্ছার অনুরূপ নির্মাণ করেছিলেন।

কাবাঘরের পুনঃনির্মাণ ইবনে যুবাইর রা. এর এক অনবদ্য অবদান

মক্কায় প্রথম অবরোধ হয়েছিল ইয়াজিদের যুগে। তখন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে পাথর বর্ষণ ও কাবাঘরে আগুন ধরে যাওয়ায় কাবাঘর ধসে গিয়েছিল। তার শাসনকালেই তিনি অনুভব করলেন যে, এই কাবাঘর পুনরায় নির্মাণ করা প্রয়োজন। তিনি তার খালা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শুনেছিলেন। সেখানে তিনি হজরত ইবরাহিম আ.-এর আশা অনুযায়ী কাবাঘর নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ হাতিমের যেই অংশটি কুরাইশরা বাইরে রেখে দিয়েছিল, সেই স্থানটি কাবাঘরের চার দেয়ালের ভেতরে নিয়ে আসা। তা ছাড়া কুরাইশরাও কাবার দরজা অনেক উঁচু করে দিয়েছিল, যেন সম্মানিত ব্যক্তিরাই ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ছিল, কাবাঘরের দরজা যেন জমিন-লাগোয়া থাকে এবং সকলের জন্য প্রবেশ করা সহজ হয়ে যায়, যেন লোকেরা একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অপর দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে এবং সকলের জন্য কাবার বরকত নেওয়ার সুযোগ থাকে। তবে তিনি তার এসব ইচ্ছা পূরণ করতে পারছিলেন না এজন্য যে, লোকেরা যেন কুরাইশদের বারবার কাবাঘর নির্মাণ করতে দেখে ভুল না বোঝে এবং মন্দ বিশ্বাসের শিকার না হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রা. কে বলেছিলেন, "তোমাদের গোত্র যদি নওমুসলিম না হতো তাহলে আমি

বর্তমানের এই কাবাঘর ভেঙে নতুনভাবে হজরত ইবরাহিম আ.-এর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্মাণ করতাম।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নবীজির সেই ইচ্ছামতোই কাবাঘর নতুনভাবে নির্মাণ করলেন।[৫৪৭] হাতিমকে চার দেয়ালের ভেতর নিয়ে এলেন। আর দরজা মাটি বরাবর করে দিলেন।[৫৪৮]

আফসোস, তার এই কীর্তি বাকি থাকতো; কিন্তু শামের সৈন্যদের দ্বিতীয়বারের আক্রমণে কাবাঘর আবার ধ্বংস হয়ে গেলো। যুদ্ধ শেষ হলে আবদুল মালেক যখন হাজ্জাজকে হিজাজের গভর্নর বানালো তখন সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্মিত কাবাঘরের গঠনপ্রক্রিয়ার কথা আবদুল মালেককে লিখে জানালো। আবদুল মালেক সেই চিঠির উত্তরে লিখল, "যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।" তাই তার ইচ্ছামতো হাজ্জাজ আবার কুরাইশের মতো করেই কাবাঘরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করল। সেই থেকে এখন পর্যন্ত কাবাঘর সেভাবেই অক্ষত রয়েছে।[৫৪৯]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সেই প্রথম খলিফা ছিলেন, যিনি কাবাঘরে রেশমের গিলাফ লাগিয়েছিলেন। তারই নির্দেশে সেই গিলাফে এতো অধিক পরিমাণ সুগন্ধি লাগানো হতো যে, পূর্ণ হারাম ম-ম করতো।[৫৫০]

তার আরেকটি স্মরণীয় কীর্তি ছিল এই যে, ইসলামি ইতিহাসে তিনিই প্রথম মক্কাকে দারুল খিলাফাহ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন এবং ধর্মকর্মের সাথে সাথে রাজনৈতিক গুরুত্বের জায়গাতেও দাঁড় করিয়েছিলেন। তার পূর্বে এবং পরে কেউই মক্কাকে এই স্থানটায় নিয়ে যেতে পারেনি। যদিও একারণে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে; কিন্তু এরপরও তিনি মক্কাকেই খেলাফতের রাজধানী হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

---

[৫৪৭] সহিহ মুসলিম : ৩৩০৮, ৩৩১০

[৫৪৮] সহিহ বুখারি : ১২৬

[৫৪৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৬৯২

[৫৫০] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৪৩

ইবনে যুবাইর রা. এর উপর কৃপণতার অপবাদ এবং বাস্তবতা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে যতদূর ধারণা করা যায় হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। এজন্য তিনি নৈকট্যভাজন লোকদের অতিরিক্ত সম্মান ও মর্যাদাদান এবং আমিরদের উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাদিয়া প্রদান থেকে বিরত থাকতেন। যদিও তিনি নিজে অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন; কিন্তু সম্পদ নিজের হোক বা বাইতুল মালের, তিনি এই আমিরদের উপর খরচ করার চেয়ে সাধারণ মানুষের উপর খরচ করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। তার এই নীতি অনেকেই আড়চোখে দেখেছে এবং তার উপর কৃপণতার অপবাদ দিয়েছে। সেইসাথে এ নিয়ে অনেক অনেক গল্প-কাহিনি রটিয়েছে, যেগুলোর আসলে কোনো ভিত্তি নেই। যদিও সেসব ভিত্তিহীন ঘটনা অনেক ঐতিহাসিকই লিখে দিয়েছে; কিন্তু এই বর্ণনাগুলো দুর্বল ও সন্দেহপূর্ণ হওয়া স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, হজরত আব্বাস রা. নাকি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কৃপণতার জন্য নিন্দা করতেন।[৫৫১] এই বর্ণনার কিছু রাবি যেমন : লাইস ইবনে আবু সুলাইম একজন যয়িফ ও মাতরুক রাবি। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেইসব ঘটনা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অনুরূপ কিছু কবি তাদের কবিতায় এই সাহাবিকে কৃপণতার অপবাদ দিয়ে অপমানিত করেছে।[৫৫২] কিন্তু এটা তো প্রকাশ্যই যে, কবিরা কাউকেই ছাড় দেয় না। তাদের অপমানের হাত থেকে অনেক ভালো ভালো মানুষ রেহাই পায়নি। এমন দুর্বল বর্ণনা ও পরিত্যাজ্য পঙ্‌ক্তির বিপরীতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে অনেক ভালো ভালো বিষয়ও প্রসিদ্ধ আছে। একবার দুর্ভিক্ষের সময় কবি নাবেগা ইবনে জা'দা এসে তার কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি সাতটি উটনি ও একটি উট এবং খেজুর, গমসহ অনেক কিছু দিয়ে তাকে বিদায় করেছিলেন।[৫৫৩] এক সফরে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এক দরিদ্র লোক এসে কিছু চাইলে তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু

---

[৫৫১] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৪৪৪

[৫৫২] আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৪০

[৫৫৩] তারিখে দিমাশক : ২৮/১৯২

আনহু সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন।[৫৫৪] একবার হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জনৈক কবি এসে বদান্যতা সংক্রান্ত অনেক কবিতা আবৃত্তি করল। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, "এমন ব্যক্তি তো শুধু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. হতে পারে।"[৫৫৫] ৭০ হিজরিতে তার ভাই মুসআব ২০ হাজার বকরি এবং ১ হাজার উট কুরবানি করে মক্কার লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিল। মক্কাবাসীরা তখন অনেক খুশি হয়েছিল। একথা প্রকাশ্যই যে, এই কাজটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধীনেই হয়েছিল।[৫৫৬]

ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ধ্বংসের কারণ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ছিল ৮ বছর দশ মাস। তার সেই খেলাফত ধ্বংসের পেছন-পর্দায় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়াও বেশ কিছু বাহ্যিক কারণ ছিল। যেমন :

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগটা বিভিন্ন ফেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। খারেজি, মুখতার সাকাফি এবং তার চেয়ে বড় শামবাসীদের কঠিন বিরোধিতা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণশক্তি ব্যয় হয়ে গিয়েছিল এসব দমনের পেছনে।

২. সেসময়ের রাজনীতি মূলত চলছিল স্থানীয় আমিরদের খুশি করার এবং তেল মেরে তাদের অন্তর জয় করার উপর। এমনকি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীরা এই কাজটা খুব জোরেশোরেই করছিল এবং এর জন্য হাত খুলে খরচও করতো। কিন্তু তখনো তিনি এসবের প্রতি সামান্য ভ্রুক্ষেপও করেননি এবং এগুলোর ধার ধারেননি। এদিক থেকে তিনি শামিদের থেকে কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন।

৩. খেলাফতের মূল কেন্দ্রের সাথে প্রদেশগুলোর তেমন যোগাযোগ ছিল না। প্রাদেশিক প্রশাসকরা নিজেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতো।

---

[৫৫৪] তারিখে দিমাশক : ২৮/১৯৩

[৫৫৫] তারিখে দিমাশক : ২৮/১৯৩

[৫৫৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৩০; তারিখুত তাবারি : ৬/১৫০

বিশেষ কোনো বিষয় ছাড়া কেন্দ্রের কোনো নির্দেশনা তাদের কাছে পৌঁছত না।

৪. খেলাফতের মূল কেন্দ্র থেকে সৈন্যদের কোনো রিজার্ভ বাহিনী এসে সাহায্য-সহযোগিতা করতো না। বরং মূল কেন্দ্রই পদে পদে ইরাক থেকে সহযোগী সৈন্যের অপেক্ষায় থাকতো। হিজাজে কখনো এমন সময় পার হয়নি যে, ১৫ বা ২০ হাজার সৈন্য সবসময় সেখানে থাকবে। ফলে হাজ্জাজের সর্বশেষ আক্রমণের সময় হিজাজ রক্ষার মতো তেমন বড় কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না। এমনকি মদিনাতেও না। আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষমতার শক্তি যেহেতু ইরাকে সঞ্চিত ছিল; তাই ইরাক হাতছাড়া হওয়ার সাথে সাথে হিজাজও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

৫. খেলাফতের মূলকেন্দ্রের প্রধান দুই শহর—মক্কা এবং মদিনা সংরক্ষণের জন্য তেমন কোনো দুর্গ ছিল না। ফলে যখনই কেউ আক্রমণ করতো তখন অবস্থা খুব দ্রুতই খারাপ হয়ে উঠতো।

৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের মূলকেন্দ্র মক্কা পুরো মুসলিমবিশ্ব থেকে পৃথক ছিল। ফলে এখানে যুদ্ধ ও সংঘাত, রসদ ও খাবারদাবার এবং বিভিন্ন সংবাদ খুব বিলম্ব করে এসে পৌঁছত। একারণেই প্রতিবেশী শত্রুরা তাদেরকে খুব সহজে বাগে পেতো।

৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মতো বনু হাশেমের কিছু বুজুর্গ ব্যক্তি তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি। এবং এই পূর্ণ সময়টা বিপরীত দিকেই অবস্থান করেছিলেন। এজন্যও তার গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল এবং সহযোগিতাও খুব কমই পেয়েছিলেন।

৮. ইরাকে হজরত মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর নেতৃত্বে মুখতার এবং তার অনেক সহচর নিহত হয়েছিল। ফলে সেখানে ভেতরে ভেতরে আরেকটি দল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যারা যুদ্ধের ময়দানে ধোঁকা দিয়ে হজরত মুসআব রহ. কে শহিদ করেছিল এবং পরবর্তীতে এরাই আবদুল মালেকের ডান হাতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

৯. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তার খেলাফতকালে শামের সৈন্যদেরকে শুধু প্রতিহতই করা হয়েছিল। ওদেরকে শেকড়সহ

উপড়ে ফেলাকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়নি। বরং শামের সীমান্ত এলাকা নিরাপত্তার জন্য পাহারা দেওয়া হতো। সেখানে কখনোই আগে বেড়ে আক্রমণের সিদ্ধান্ত কেউ গ্রহণ করেনি। অথচ তখনো তারা হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই যাচ্ছিল এবং খেলাফতকে যেকোনো উপায়ে তারা নিঃশেষ করে দিতে চাচ্ছিল।

১০. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে ব্যাপক করার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রচার-মাধ্যম, আহ্বানকারী, কবি-সাহিত্যিক এবং গোপন প্রতিনিধির মাধ্যমে মানুষের মন জাগ্রত করা ও আনুগত্যের উপযোগী করার ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও এসব করা ছাড়াই তার খেলাফতের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কিন্তু শত্রুরা এসব ব্যবহার করে অনেককেই নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল।

১১. শামিরা রাজনীতিতে অনেক প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিল। যেকোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত তারা দিল নয়, দেমাগ খাটিয়ে নিতো। সমরজ্ঞানও ছিল অসাধারণ। তাদের জেনারেল ছিল দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ ও সতর্ক ব্যক্তি। অথচ উলটো পিঠে আলো ফেললে দেখা যাবে, হকপন্থিদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই হতো আবেগ থেকে, দেমাগ থেকে নয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা শত্রুপক্ষের চেয়ে ছিল অনেক দুর্বল। অভিজ্ঞতাতেও ছিল অনেক কম। যদিও ওলামা, সালেহিন, আউলিয়া ও নেককারদের আধিক্যই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে পোক্ত করেছে। কিন্তু সমস্যাকালীন সময়ে তাদের দোয়া করা ছাড়া তারা কোনোই কাজে আসতো না।

১২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল এই যে, মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণের মাধ্যমে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা। কোনো চাপাচাপি বা জোরপ্রয়োগ করা হবে না। এতে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে অমুখাপেক্ষিতার সাথে গ্রহণ করা হবে আর যারা এই দলে আসতে চাইবে না কিংবা টালবাহানা করবে, তাদের সাথে তেমন কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আসলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই কর্মপন্থার আওতায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং হজরত

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রহ.-এর মতো ব্যক্তিরা এসে গেছেন, যারা আসলে বছরের পর বছর ধরে শাসকদের থেকে সম্মান-মর্যাদা ও আন্তরিকতা পেয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যদি তার এই কর্মপন্থা থেকে সামান্যও সরে আসতেন তাহলে এইসব ব্যক্তির সহযোগিতা তিনি শতভাগই পেতেন। কিন্তু তিনি যেহেতু কাউকে তোষামোদ বা জোরজবরদস্তি করতে পছন্দ করতেন না; তাই তারাও আজীবন দূরে দূরেই ছিলেন।

উম্মতের গর্বের ধন

জয়-পরাজয় থেকে আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি সামান্য সরিয়ে নিই তাহলে দেখবো যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর জীবনচরিত উম্মতের জন্য সত্যিই এক অমূল্য সম্পদ। এখনো তাদের জীবনী পড়লে ঈমান জেগে ওঠে এবং চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

তারা আসলে দৃঢ়তা, বীরত্বে, ন্যায়পরায়ণতা এবং জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে সিদ্দিকি-বংশের যে লাজ রেখেছিলেন, ইনশাআল্লাহ হাশরের দিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত সাফিয়া, হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম, হজরত আসমা বিনতে আবু বকর এবং উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা এই দুজনকে নিয়ে গর্ব করবেন। নবীজি এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে যে-পরিমাণ মিল ছিল, ঠিক তেমনই হয়েছে তাদের দুই নাতির ক্ষেত্রে! হিম্মতে, চেষ্টায় এবং সর্বোপরি শাহাদাত বরণের ক্ষেত্রে। তাদের জীবন ও চিন্তাধারায় যেমন মিল ছিল তেমন ছিল শাহাদাতের ক্ষেত্রেও।

আল্লাহ তায়ালা উম্মতের এই দুই মহান অনুগ্রহকারীর উপর কেয়ামত পর্যন্ত অশেষ ও অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন।

সাহাবিদের যুগ এবং পরবর্তীদের মধ্যকার রাজনীতির তুলনা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ধ্বংসের মাধ্যমে যেহেতু সাহাবায়ে কেরামেরই খেলাফতের স্বর্ণযুগ সমাপ্ত হয়েছিল; তাই আমরা যদি এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অবস্থা ও ইতিহাস সামান্য নেড়েচেড়ে দেখি তাহলে দেখবো যে, ৩৪ হিজরি থেকে হজরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা শুরু হয়েছে এবং ৭৩ হিজরিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। আর এই সময়কালের রাজনৈতিক নেতৃত্বে যেহেতু ছিলেন সাহাবিগণ; তাই এই সময়টাকে হেলাফেলা বা যা-তা করে দেখলে চলবে না। কারণ এই ইতিহাস আমাদের বিশ্বাস ও চেতনার ইতিহাস। এ কারণেই এই সময়টাকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ক্ষেত্রেও খুব সতর্কতা অবলম্বন ও মুহাদ্দিসদের কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা ইতিহাসের এই নাজুক অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি মুহাদ্দিসদের নির্দেশিত পথে পূর্ণ সতর্কতার সাথে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই অধ্যায়পাঠে যেইসব অবস্থার সম্মুখীন আমরা হবো, সেগুলো সকলের জন্য সত্যিই খুব কার্যকরী ও শিক্ষণীয়। এর মাধ্যমে অনেক উপদেশের আলো আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে এবং চিন্তা-চেতনার অনেক বন্ধ দরজা খুলে যাবে।

এই চল্লিশ বছরে আমরা ৫ জন খলিফা, যথা হজরত উসমান গনি, হজরত আলি, হজরত হাসান, হজরত মুয়াবিয়া এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে মুসলমানদের নেতৃত্বে অবস্থান করতে দেখি। তাদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি, বিভিন্ন সময়ে দেওয়া তাদের সিদ্ধান্ত, নানান বৈরী সময়ে তাদের কার্যকর পদক্ষেপ, রাজনৈতিক মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের বুঝ ও বুদ্ধিমত্তা এবং ইসতিম্বাতের ক্ষমতা, বিরোধীশক্তির সাথে তাদের

সতর্ক ও সজাগ আচরণ মোটকথা তাদের প্রতিটা নড়াচড়া আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হয়ে রয়েছে। সে-কারণেই পরবর্তী ফকিহগণ শরয়ি মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর পর সাহাবিদের বর্ণিত বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষত যদি ইসলামি রীতি-নীতি, আদব, উসুল ও তাদের পথনির্দেশ মেনে চলি তাহলে আজীবন আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবো।

ইসলাম মূলত শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং প্রকৃত বিজয়ের বিশ্বস্ত ঠিকানা। সামগ্রিকভাবে মুসলমানগণ যখনই কোনো ষড়যন্ত্র ও পরাজয়ের শিকার হয়েছে তখনই মূলত তার পেছনে কাজ করেছে ইসলামি শিক্ষা থেকে বিমুখতা এবং সাহাবিদের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। আসলে কোনো অসুখ এমনি এমনিই সৃষ্টি হয় না। এর পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ থাকে। ঠিক তেমনই সমাজের কোনো ক্ষতি এমনিতেই হয় না। এর পেছনেও কারণ থাকে। আর সমাজ যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন একা একা হয় না। বরং সমাজের সব সদস্যকেই তার কষ্ট ভোগ করতে হয়।

আর ইসলামি ইতিহাসের কোথাও কোথাও মুসলমানদের দুরবস্থা বা পরাজয় দেখে কেউ যেন একথা মনে না করে যে, ইসলামের কোথাও হয়তো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। অসম্ভব! কখনোই এমনটা হতে পারে না। বরং কমতি রয়েছে সামষ্টিক সিদ্ধান্ত, তাদের চিন্তা-চেতনা ও ভাবাদর্শে। মুসলমানদের অনেকেই যেমন এর শিকার। সেইসাথে দুর্বল নেতৃত্ব এবং তাদের মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণেও পরাজয় হয়ে থাকে, যা ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ থেকে পূর্ণমাত্রায় সরে গিয়ে অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আর সেগুলোকেই আমরা রাজনৈতিক ভুল হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকি। সাহাবিগণের পরেও আরো দীর্ঘ এক সময় পর্যন্ত খলিফাদের নামাজ-রোজায় অভ্যস্ত দেখা যায়। তবে কিছু ক্ষমতাশালীর জীবনের ধারাপ্রবাহ খুব সহজেই দুই ভাগ করা যায়। প্রথমত, রাজত্ব পাওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা। দ্বিতীয়ত, রাজত্ব পাওয়ার পরবর্তী অবস্থা। রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তো সবাই প্রজাপরায়ণ ও জনদরদি হয়ে উঠেছিল; কিন্তু ক্ষমতা অর্জনের ধাপগুলোতে তারা ছিল খুবই কঠোর, নির্দয় ও বিচার-বোধহীন। এই চিত্রটা সাহাবিদের পরে প্রায় শাসকের ক্ষেত্রেই ছিল। তবে কেউ কেউ

ছিল এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের পর তারা যতটা খারাপ হয়ে উঠেছিল, মানুষের উপর যতটা জুলুম ও অত্যাচার চালিয়েছিল, ক্ষমতা পাওয়ার পূর্বে তারা তেমন ছিল না। যেমন : ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া। অবশ্য এমন শাসকের সংখ্যা তখন অনেক কম ছিল। কারণ তখন মূলত অধিকাংশকেই রাজনৈতিক কিছু ভুলের শিকার এবং জুলুমের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনের অবস্থানেই দেখা যেতো। এখানটায় এসে কারো ভেতরে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আচ্ছা, তাহলে কি ইসলামে এই ক্ষমতা দখলের পর্যায় বা স্তরগুলো অতিক্রমের ব্যাপারে সুন্দর কোনো সমাধান দিয়েছে না দেয়নি? যদি দিয়ে থাকে তাহলে উম্মতের নেতৃবর্গ সেখান থেকে কতটুকু ফায়দা অর্জন করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে কতটুকু করতে পারবেন?

অন্তরঙ্গতার নীতি : সন্তুষ্টি ও আগ্রহ

যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখবো ইসলাম আমাদেরকে 'ক্ষমতার পরিবর্তন' বিষয়ে অনেক সুন্দর শিক্ষা ও সবক দিয়েছে। এমনকি এই ক্ষমতা পরিবর্তন বা দখল করতে গিয়ে যেই ফেতনা ও সমস্যা সামনে আসে সেগুলোও সমাধান করার জন্য একটি অসাধারণ কার্যকর নিয়মের কথা বলে দিয়েছে। সেই নিয়মটা হলো "ইসতিনাস" অর্থাৎ লোকদেরকে অন্তরঙ্গ করে তাদের সন্তুষ্টি ও আগ্রহে নেতৃত্বের লাগাম হাতে তুলে নেওয়া। ইসতিনাস এজন্য জরুরি যে, যদি এমনটা না করা হয় এবং এই নীতির অনুসরণ না করা হয় তাহলে সমাজে সৃষ্টি হবে বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা, যা যেকোনো জাতির ধ্বংসের অনেক বড় কারণ। একারণেই নামাজে ইমামতির দায়িত্ব সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সম্মানিত ও কারির হাতে অর্পণ করা হয়েছে এবং তাকেই যোগ্য হিসেবে প্রধান সারির বিবেচনা করা হয়েছে। এখন এই গুণে যদি কয়েকজন বরাবর থাকে তাহলে যিনি অধিক পরহেজগার ও মুত্তাকি, তাকে দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। এতেও যদি কয়েকজন সমান সমান হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশি তাকে ইমামতির জন্য আগে বাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজের এই মাসআলায় কেন এতো স্তর রাখা হয়েছে? এর কারণ হলো মুসল্লিগণ যেন সন্তুষ্টি ও প্রশান্তচিত্তে নামাজ আদায় করতে পারে। ঘৃণা

বা অসন্তোষের উদ্রেক না হয়। বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য সৃষ্টি না হয়। ঠিক এই কারণেই মুসল্লিদের অসন্তুষ্টি ও অনাগ্রহে কাউকে ইমামতি করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এজন্যই নিজে নিজেই ইমামতি গ্রহণ ও খেলাফতের দাবি করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ স্বভাবতই যখন ক্ষমতার একটি আসন কয়েকজন দখল করতে চাইবে তখন নিশ্চিতভাবেই তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা এবং মতপার্থক্য দেখা দেবে। ফলে তৈরি হবে বিশৃঙ্খলা ও অনিরাপত্তা। সেজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোনো গোত্র এসে ইসলাম গ্রহণ করতো তখন তিনি সেই গোত্রের পূর্ব নেতাকেই বহাল রাখতেন। অন্য বা নতুন কাউকে সাধারণত নিয়োগ দিতেন না। কারণ লোকেরা তার উপরই সন্তুষ্ট এবং তার ব্যাপারেই আগ্রহী ছিল। 'আল আইম্মাতু মিন কুরাইশিন' এই কথাটা তিনি সেই কারণেই বলেছেন। কারণ তখনকার সময়ে আরবগোত্রগুলোর মাঝে এরাই সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ছিল। আর সামগ্রিকভাবে জাজিরাতুল আরবের প্রায় সকলেই তাদের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট ছিল। এজন্য তখন তাদের নেতৃত্ব সকলের জন্য ইসতিনাস এবং ঐক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শুরাইয়্যাত বা পারস্পরিক পরামর্শ-নীতি

ইসলামি খেলাফতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো শুরাইয়্যাত। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসতিনাস এই শুরাইয়্যাতের উপরই নির্ভর করে থাকে। সুতরাং ইসতিনাসের জন্য শুরাইয়্যাতটা আবশ্যক বিষয়। এই কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। সেইসাথে তাদেরকে শুধু কথাই নয়, কাজ করে দেখিয়েও শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলাম আসার পূর্বে ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতা স্থানান্তরিত হওয়ার মাধ্যম বা স্তর একটাই ছিল। আর তা হলো তরবারির জোরে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা পরিচালনা। আর যদি তখন কেউ শাসক হতো তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতো যে, তার দলই যেন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান হয়, তাদের আদব-আখলাক যেমনই থাকুক না কেন। এজন্য তাদের অধিকাংশই মনমতো জীবনযাপন করতো এবং কামনা-বাসনার গোলামি করতো।

খেলাফতে রাশেদার সময়কাল

ইসলাম পূর্বযুগের নিয়ম-নীতি ভেঙে গুড়িয়ে এমন এক রাজনৈতিক সংবিধানও দিয়েছিল, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের মতপ্রকাশ করে এবং পরামর্শের মাধ্যমে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে শাসক বানাতে পারে। সেকারণেই হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কোনোরকম রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই শুধু একটি বৈঠকের মাধ্যমে খলিফা হয়েছিলেন। এরপর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তো তেমন কোনো আলোচনারও প্রয়োজন হয়নি। কারণ তার খলিফা হওয়ার উপযুক্ততা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এতই স্পষ্ট ছিল যে, তিনিই তাকে খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করে গেলেন। আর এতে কোনো বিরোধ বা রক্তপাতও হয়নি। মুসলমানদের জন্য এটাই ছিল রাজনৈতিক স্তরগুলো অতিক্রম করা বা ক্ষমতার পরিবর্তন করার মূলমন্ত্র। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর হজরত উসমান রা. এবং হজরত আলি রা. মর্যাদা ও যোগ্যতার দিক থেকে কাছাকাছি ছিলেন। তাদের দুজনের কোনো চেষ্টা ছাড়াই হজরত উমর রা. খেলাফতলাভের উপযুক্ত ছয় ব্যক্তির মাঝে তাদের দুজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন এবং উম্মাহকে বিশেষ পরামর্শ গ্রহণের নিয়ম বলে দিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য জনসাধারণের পরামর্শও গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষে মুসলমানগণ হজরত উসমান রা. কে গ্রহণ করলেন এবং তাকেই খলিফা নিযুক্ত করলেন। এতেও কোনো রক্তপাত বা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়নি। হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর হজরত আলি রা. কে সবাই নিজেদের খলিফা হিসেবে গ্রহণ করলেন। এরপর হজরত আলি রা. হজরত হাসান রা. কে নিজ সিদ্ধান্তে নিজের প্রতিনিধি বানাননি; বরং ইরাকবাসীরাই তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. যদিও হজরত আলি রা. ও হজরত হাসান রা. এর বাইয়াত গ্রহণ করেননি; কিন্তু তিনি রাজনৈতিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও একটি নিয়মের আওতায় থেকে বিরোধীশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু হজরত হাসান রা. যখন খলিফা হলেন তখন তিনি উম্মতকে রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ফলে

এক্ষেত্রেও কোনোরকম রক্তপাত ছাড়াই অত্যন্ত নিরাপদে খেলাফতের স্থানান্তর হয়ে গেলো।

শুরাইয়্যাত থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে রাজত্বের পরিভ্রমণ

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও ইসলামের বিজয়, ইনসাফ ও ভারসাম্য এবং সমৃদ্ধি ও নির্মাণের দিক থেকেও প্রশংসারই উপযুক্ত ছিল। তবে খেলাফতে রাশেদার থেকে তুলনামূলক কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী পরিবর্তনগুলো একেবারেই কোনো কারণ ছাড়া বা অযৌক্তিক ছিল না। কেননা সেই সময়টারও পরিবর্তন হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সামনে আসছিল নতুন নতুন সমস্যা ও সংকট। শামের লোকজন যখন হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়ে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলো তখন এতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করল উমাইয়া বংশের আমিরগণ। কারণ নিহত খলিফা যেহেতু উমাইয়া বংশের ছিলেন; তাই তারা নিজেদেরকে তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তরাধিকারী মনে করতো এবং এই হত্যার বিচার-দাবিতে নিজেদেরকে বাদি মনে করতো। এই কেসাসের ঘটনায় যারা শরিক ছিলেন, তাদের নেক নিয়ত ও ইখলাসের ব্যাপারে নিশ্চয় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও একটা অমোঘ সত্য যে, রাজনীতিটা কোনো বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতো নয়। বরং সে একের পর এক ভুল সন্তান জন্ম দিতেই থাকে। বিশেষত যখন ভুলের কারণে অবস্থা ও পরিবেশ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায় তখন এর প্রভাব অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ায়। সিফফিনের যুদ্ধের পূর্বে ও পরে শামিদের মধ্যে ইরাক ও হিজাজের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার ছড়িয়েছিল আর দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা এটাকে মধু মিশিয়ে যেভাবে প্রচার করেছিল তাতে বনু উমাইয়ার কঠোর মানসিকতার লোকদের ভেতর বনু হাশেমের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে এবং পরস্পর শত্রুতা তৈরি হয়। ইরাকে এমনটাই ঘটেছিল। ফলে তাদের অনেকেই বনু উমাইয়াকে নিশ্চিতভাবেই বনু হাশেমের বিরোধীশক্তি হিসেবে ধরে নিয়েছিল। আসলে এগুলো প্রান্তিকতার শিকার হওয়া ছাড়া কিছুই না।

একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে অধিকাংশ মুসলমানই নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে যাচ্ছিল

অপরদিকে শামের একটি শ্রেণি এটাকে নিজেদের তরবারির খাজনা ভাবছিল এবং হুকুমতকে নিজেদের একমাত্র অধিকার বলে মনে করছিল। তবে একথা নিশ্চিত যে, নবীদের সাথে সম্পর্ক ও নৈকট্যের কারণে অন্যান্য মুসলমানের মতোই বনু উমাইয়ার অধিকাংশ আমির বনু হাশেমের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি পূর্ণ খেয়াল এবং তাদের সাথে সম্পর্ক সুন্দর রাখতো; কিন্তু এই সম্মান ও মর্যাদা সত্ত্বেও বনু হাশেম নিজেদেরকে রাজনীতির ময়দান থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখছিল। সেকারণেই হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্জনবাসের পর থেকে ৯২ হিজরি পর্যন্ত বনু হাশেমের কোনো সদস্যই খেলাফতের এসব কাজে অংশ নেননি। কারণ মূলত তাদের ভেতর ক্ষমতা লাভের কোনো আশা বা লোভ ছিল না। বরং পূর্ণ অমুখাপেক্ষিতার সাথেই জীবনযাপন করছিলেন। তাদের কেউ কেউ বনু উমাইয়ার পতাকাতলে থেকে জিহাদ করছিলেন। তবে বনু উমাইয়ার নেতৃবর্গ তাদের নেতৃত্বে আনাটাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে করছিল না। ফলে শুরাইয়্যাত ও ইসতিনাস এখানে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অথচ এসব অঞ্চলের কেউ কেউ গৃহযুদ্ধ চলাকালে ছিলেন হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে আর কেউ কেউ ছিলেন তার বিপক্ষে। তা ছাড়া রাজনৈতিক সুরক্ষা ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য তিনি বনু উমাইয়ার অধিকাংশকেই নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন।

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অক্ষমতা

সাধারণত এক্ষেত্রে অনেকেই হজরত মুয়াবিয়া রা. কে এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। অথচ তখনকার অবস্থা, অতীত হয়ে যাওয়া ঘটনার ইতিবৃত্ত ও বিশ্লেষণ এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অক্ষমতার দিকটার কথাও চিন্তা করা উচিত। সিফফিনের যুদ্ধে শামের অধিবাসীদের প্রায় ৩০-৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা হিসেব করতে গেলে লাখ ছাড়াবে। অথচ ইরাকবাসীদের সাথে রাজনৈতিক সন্ধি করেও এর ক্ষতিপূরণ হচ্ছিল না। এই যুদ্ধের পূর্বে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ এবং যুদ্ধপরবর্তী ছোটখাটো যুদ্ধমুখর পরিস্থিতিতে হাশেমি এবং শামে উমাইয়াদের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠেছিল। হজরত

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্ধি এবং হুকুমত থেকে অব্যাহতি সত্ত্বেও ইরাকবাসীদের একটি শ্রেণি দ্বিতীয়বার হাশেমিদের নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনার প্রতি আগ্রহী ছিল। আবার এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. বনু হাশেমিদের সাথে সম্পর্ক না রাখাকেই উম্মতের জন্য উত্তম মনে করছিলেন। যেন পুনরায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। এমন অবস্থায় হজরত মুয়াবিয়া রা. উসমানি আন্দোলনের পথপ্রদর্শন এবং বনু উমাইয়ার উপর আস্থা ও ভরসা রাখতেই বাধ্য হচ্ছিলেন। কারণ হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষমতা মূলত এদের কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন কোনো দল আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতি বিপ্লবী এবং অগ্রসেনানীদের হাতেই চলে আসে। হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধের আন্দোলন যে নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল, তার একটি হলো ইরাকবাসীর বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তার নেতৃত্ব দেওয়া। হজরত হাসান রা. এই বিপ্লবী জামাতের নেক নিয়ত এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যোগ্যতা দেখে উম্মতকে রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন। তখন নেতৃত্ব আপনা-আপনিই প্রথম সারির লোকদের হাতে চলে যায়। হজরত মুয়াবিয়া রা. ছিলেন সেই প্রথম সারির লোকদের মাধ্যমেই কাজ নিতে বাধ্য ছিলেন। এদেরকেই রাষ্ট্রের আমানতদার ও বিশ্বস্ত মনে করা হতো। একারণেই হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজের ক্ষমতা কিছুটা গুছিয়েই কুফায় হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এবং মিসরে হজরত উমর ইবনুল আস রা. কে গভর্নর বানালেন। তারা কিন্তু উমাইয়া বংশের কেউ ছিলেন না। বরং হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রনায়ক ছিলেন। বসরার গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমেরও ছিলেন সেই আন্দোলনের পথনির্দেশক। হিজাজে প্রথম গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয় মারওয়ান ইবনুল হাকামকে এবং ৪৮ হিজরিতে গভর্নর বানানো হয় হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. কে। তারাও ছিলেন উমাইয়া বংশের। এরপর ৫৪ হিজরিতে দ্বিতীয়বারের মতো গভর্নর বানানো হয় মারওয়ানকে এবং ৫৭ হিজরিতে তার স্থানে অন্য এক উমাইয়া-নেতা ওয়ালিদ ইবনে উতবাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি এই পদে ইয়াজিদের সময়কাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। ৫০ হিজরিতে হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহুর

ইনতেকালের পর হজরত মুয়াবিয়া রা. তার বৈমাত্রেয় ভাই জিয়াদকে পূর্ণ ইরাকের হুকুমত দিয়ে দেন। আর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এ পদেই বহাল থাকেন। ৫৩ হিজরিতে তার ইনতেকালের পর তার ছেলে উবাইদুল্লাহকে খোরাসানের গভর্নর বানানো হয়। এরপর ৫৫ হিজরিতে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে খোরাসান থেকে সরিয়ে বসরার গভর্নর বানানো হয়। আর খোরাসানের গভর্নরের পদ দেওয়া হয় সাঈদ ইবনে উসমানকে। তিনিও উমাইয়া বংশের ছিলেন।[৫৫৭]

এসব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ব্যাপারে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ করার সুযোগ নেই। কারণ তাদের অধিকাংশই মুত্তাকি, মুজাহিদ, আলেম এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন সিগারে সাহাবি কিংবা কিবারে তাবেয়ির অন্তর্ভুক্ত। হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এবং হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বড় বড় সাহাবিও এই গভর্নরের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। এতোসব আলোচনার মাধ্যমে শুধু এতটুকু দেখানোই উদ্দেশ্য যে, সেই তখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রায় সবটুকু স্পষ্টই বনু উমাইয়া এবং উসমানি আন্দোলনের নেতৃবর্গের হাতেই ছিল। ফলে কিছুদিন এই অবস্থা চলার পর বনু উমাইয়ারাই হয়ে যায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। এটা এমনই এক সত্য যে, যার অস্বীকার অনর্থক ও অকারণ ছাড়া কিছুই না। সুতরাং এসব কিছুর দিকে কেউ যদি ভালো করে মনোনিবেশ করে তাহলে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে সে অক্ষমই মনে করতে বাধ্য হবে। এই অক্ষমতার কারণেই হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে এমনসব গভর্নরের উপস্থিতি ছিল, যারা বনু হাশেমকে নিজেদের ক্ষমতার জন্য হুকমি মনে করতো। তাই তো হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকালের সংবাদ যখন হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে এলো তখন এক লোক নিজের অজান্তেই বলে বসল, 'আরে, সে তো ছিল আগুনের একটা ফুলকি, আল্লাহ যা নিভিয়ে দিলেন।'[৫৫৮]

---

[৫৫৭] তারিখে খলিফা ইবনে খাইয়াত : ২০৩-২২৫; যদিও বিভিন্ন এলাকায় অন্য অনেকেই ক্ষমতা পাচ্ছিল। বরং মধ্যম স্তরের অধিকাংশ নেতাই ছিল অন্যান্য গোত্রের।

[৫৫৮] আবু দাউদের এই বর্ণনা থেকে যেখানে একথা বুঝা যায় যে, শামে কিছু কট্টরপন্থি লোকও ছিল। সেখানে এই বর্ণনাই বলছে যে, সেখানে এসব অন্যায় থেকে বাধা দেওয়ার মতোও সবসময় কিছু লোক ছিল। যেমন এই ব্যক্তির কথার উপর সেই মজলিসেই আগত এক

হজরত আলি রা. মুসলিম উম্মাহর জন্য একদল মজবুত ও কর্মঠ লোক রেখে গিয়েছিলেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন বড় বড় সাহাবি এবং তাবেয়ি। তাদের মধ্যে সিপাহসালার, উজির এবং পরামর্শদাতা যেমন ছিলেন তেমনই ছিলেন রাজনৈতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু তারাও সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়ে গিয়েছিল। ফলে হাতেগোনা দু'একজন ছাড়া কেউ আর তেমন ভালো কোনো পদ পাননি। শুধু এতটুকুতেই শেষ নয়; অনেক সময় তারা মৌখিক নিন্দা ও তিরস্কারেরও শিকার হতেন।

হজরত উসমান ইবনে হুনাইফ রা. ছিলেন হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়কার বসরার গভর্নর। একবার তিনি হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজত্ব চলাকালে তার সাক্ষাতে গেলেন। খলিফাকে 'আইয়ুহাল আমির' বলে সম্বোধন করা তার পুরাতন অভ্যাস ছিল। খোলাফায়ে রাশেদিনকেও তিনি এভাবেই ডাকতেন। কিন্তু দামেশকের দরবারে তিনি 'আইয়ুহাল আমির' বলা ভালো মনে করলেন না। তাই তিনি 'আমিরুল মুমিনিন' বলে সম্বোধন করলেন। তখন অনেকে রেগে গিয়ে তাকে ভরা মজলিসে সকলের সামনে মুনাফিক বলে গালি দিলো। হজরত মুয়াবিয়া রা. তখন তার অক্ষমতা প্রকাশ করে বিনয়ের সাথে বললেন, 'শামের অধিবাসীরা বিভিন্ন ফেতনা অতিক্রম করতে করতে নিজেদের আমিরদের ব্যাপারে কিছুটা বেপরোয়া ও চরমপন্থি হয়ে উঠেছে।'[৫৫৯]

এই চরমপন্থার আবশ্যক ফল এই ছিল যে, বনু উমাইয়া নিজেদের আমির ব্যতীত কাউকে তেমন পাত্তা দিতো না এবং মানতোও না। (তবে দু'একজনকে মানতো, যা উদাহরণ হওয়ার উপযুক্ত) এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বনু উমাইয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই কারণে তিনি এমন অনেককে গভর্নর বানাতে বাধ্য হয়েছিলেন, যারা আসলে তার উপযুক্ত ছিল না।

মেহমান হজরত মিকদাদ ইবনে মা'দিকারাব কঠিন দলিল-প্রমাণ পেশ করেছিল। মুসনাদে আহমাদ : ১৭২২৮ আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ২০/২৬৯; সুনানে আবু দাউদ : ১৩৩; আলবানি এই হাদিসকে সঠিক ও শুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন।

[৫৫৯] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ৯/২৯; বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

যেমন : উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। ৫৩ হিজরিতে তার বয়স ছিল মাত্র ২০ বা ২১ বছর। এমন সময় তার বাবা জিয়াদের মৃত্যু হয়। উবাইদুল্লাহ তখন দ্রুত দামেশকে ছুটে যায়। এবং মুয়াবিয়া রা. এর নিকট গভর্নরের পদ প্রার্থনা করে। মুয়াবিয়া রা. তাকে খোরাসানের গভর্নর বানিয়ে দেন। দু বছর পরে তাকে বসরার গভর্নর বানানো হলো।[৫৬০] এরপর ৫৯ হিজরিতে আহনাফ ইবনে কায়েসের পরামর্শ অনুযায়ী উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো। কিন্তু তার পরিবর্তে বনু উমাইয়ার তেমন ভালো কাউকে পাওয়া গেলো না। ফলে কিছুদিন পর তাকেই আবার গভর্নর বানানো হয়।[৫৬১]

অন্যান্য উমাইয়ার মতো এই যুবকও খুব যুদ্ধবাজ এবং তরবারিপ্রিয় ছিল। সুন্দর আখলাক এবং উত্তম চরিত্র থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল। সকলেই এসব কারণে তার প্রতি খুব বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারণে সে তখন কিছুটা শান্ত ও নীরব থাকলেও ইয়াজিদের রাজত্বকালে হয়ে উঠেছিল একেবারে বেপরোয়া এবং লাগামহীন। ফলে সে জন্ম দিয়েছিল অনাকাঙ্ক্ষিত সব ঘটনা। তার এসব অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ আচরণের কারণে অনেকেই তখন ইসলামি রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ছোটদের নেতৃত্ব ও রাজত্ব

হাদিসের ব্যাখ্যাকারদের ভাষ্যমতে এটাই ছিল সেই যুগ, যাকে নবীজি 'ইমারাতুস সিবয়ান' (শিশুদের নেতৃত্ব) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আরবের লোকেরা অচিরেই একটি ফেতনার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই ফেতনা হলো 'ইমরাতুস সিবয়ান'। যদি লোকেরা তাকে মানে তাহলে সে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর যদি তাকে না মানে তাহলে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবে।"[৫৬২] একবার হজরত আবু হুরাইরা রা. মারওয়ানকে মুখের উপর

---

[৫৬০] তারিখুত তাবারি : ৫/২৯৫, ২৯৬, ২৯৯

[৫৬১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৪৪

[৫৬২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭৭৫১ এই হাদিসটি বিশুদ্ধ ও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

বলে দিয়েছিলেন যে, "আমি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত নবীজির কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কিছু শিশুর হাতে হবে।" মারওয়ান এ কথা শুনে বলল, "তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা লানত বর্ষণ করুন।" হজরত আবু হুরাইরা রা. তখন বললেন, "যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের নামধামসহ বলে দিতে পারি যে, তারা অমুকের ছেলে অমুক।"[৫৬৩]

অন্য বর্ণনায় হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশদের কিছু শিশু, অনভিজ্ঞ ও মূর্খের হাতে নিহিত রয়েছে।"[৫৬৪]

আরেক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, "৬০ হিজরির শিশুদের রাজত্ব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করছি।"[৫৬৫]

তার থেকেই বর্ণিত আরেকটি বর্ণনা হলো, "আমার এই থলেতে এমন এক হাদিস আছে, যদি আমি তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করি তাহলে তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করবে।" এরপর তিনি এই দোয়া

---

[৫৬৩] সহিহ্ বুখারি : ৩৬০৫ এই বর্ণনাটিই মুসনাদে আহমাদে কখনো সংক্ষিপ্তভাবে কখনো বিস্তারিতভাবে মারফু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে।
হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন, এই হাদিসে সেই বিষয়ের দলিল এসেছে যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ শাসক যদি জালিমও হয় তাহলেও তার বিরোধিতা করা যাবে না। এবং বিদ্রোহও করা যাবে না। কারণ নবীজি হজরত আবু হুরাইরা রা. কে সেই শাসকদের নাম এবং তাদের বাপ-দাদার নাম উল্লেখ করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি দেননি। কারণ বিদ্রোহের ফলে উপকারের চেয়ে বেশি অপকার হবে। তাই তিনি দুই খারাবির মধ্যে তুলনামূলক কম খারাপকে এবং দুই কাজের মধ্যে তুলনামূলক সহজ কাজকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। সতর্কতা: মারওয়ানের এই ছেলের উপর লানত করা বড়ই আশ্চর্যজনক বিষয়। কারণ এটা স্পষ্ট যে, এমন সন্তান তার নিজের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়ে এই কথা বলিয়েছিলেন এই জন্য যে, লোকদের মাঝে ভালোভাবে হুজ্জত কায়েম হয়ে যায় এবং সম্ভাবনা আছে যে, সে হয়তো উপদেশ গ্রহণ করবে। ফাতহুল বারি : ১৩/১১

[৫৬৪] সহিহ্ ইবনে হিব্বান : ৬৭১২ এই হাদিসের ব্যাপারে ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, শাইখাইনের শর্ত অনুযায়ী এই হাদিসের সনদ সহিহ। ঠিক অনুরূপভাবে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কুরাইশের সন্তান কেন অন্যদের ধ্বংসের কারণ হবে। অর্থাৎ সে ইলম এবং সুন্দর নেতৃত্বের গুণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। অদূরদর্শিতা এবং নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

[৫৬৫] কানযুল উম্মাল: ৩০৮৫৪

করেছেন, “হে আল্লাহ, আমি যেন ৬০ হিজরিতে পৌঁছতে না পারি।” লোকেরা তখন জিজ্ঞেস করল, “৬০ হিজরিতে কী হবে?” উত্তরে বললেন, “শিশুদের রাজত্ব চলবে, সন্ধি ও চুক্তির বেচাকেনা হবে, সেনা-আধিক্য দেখা দেবে, জীবন অভিজ্ঞানের কারণে আমানত এবং সাক্ষ্য গনিমত হয়ে যাবে, জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, কুরআনের তেলাওয়াতকে সঙ্গীতের বাদ্য বানিয়ে ফেলা হবে এবং রক্তবন্যা বয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে।”[৫৬৬]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনে আবি শাইবার বরাতে হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, “হজরত আবু হুরাইরা রা. বাজারে চলতে চলতে এই কথা বলতেন, “হে আল্লাহ, আমি যেন ৬০ হিজরিতে পৌঁছতে না পারি।”[৫৬৭]

এরপর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, “এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ছোটদের প্রথম রাজত্ব ৬০ হিজরিতে হবে এবং এটা ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার খলিফা হওয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল।[৫৬৮]

---

[৫৬৬] আল মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানি : ১৩৯৭ এর সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ; আলি ইবনে যায়েদ ইবনে জাদআন ছাড়া। ইবনে হাজার বলেছেন, যয়িফ। আর জাহাবি রহ. বলেছেন, এর কোনো প্রামাণ্যতা নেই। তাকরিবুত তাহযিব : তরজমা নং ৪৭৩৪

[৫৬৭] ফাতহুল বারি : ১৩/১০

[৫৬৮] ৬০ হিজরি সংক্রান্ত যেই সকল বর্ণনা হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে এসেছে সেগুলো তারই কথা। মারফু হাদিস নয়। তবে এমন বিষয়ে যেহেতু নিজের থেকে বলা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে কিয়াস হলো, তিনি নবীজি থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনে তারপরই বলেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার লেখেন : হজরত আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত “আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশদের ছোটদের হাতে নিহিত রয়েছে”। তিনি হয়তো নবীজির কাছ থেকে ফেতনার সেই সময়টার ব্যাপারেও জেনে নিয়েছিলেন। এইজন্যই তিনি এই দোয়া করতেন: হে আল্লাহ, আমাকে ৬০ হিজরির ছেলে শাসকদের কাল পর্যন্ত জীবিত রেখো না। ফাতহুল বারি : ১৩/১০; মোটকথা, হাফেজ ইবনে হাজারসহ প্রায় সকল মুহাদ্দিসই এই হাদিসকে ইয়াজিদের যুগের উপর প্রয়োগ করেছেন। সহিহ হাদিসগুলোতে ইমারাতুস সিবয়ানকে ফেতনার উৎসমূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ পূর্বাপর সব কিছু মিলিয়ে ইয়াজিদের যুগ অর্থাৎ ৬০ হিজরির উপরই প্রয়োগ করেছেন। কারণ এই যুগেই উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবং আমর ইবনে সা'দের মতো যুবকদের হাতে দুঃখজনক ঘটনাগুলোর জন্ম হয়েছিল। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এসব বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেন, এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই ছোটদের প্রথম হলো ইয়াজিদ। যে অধিকাংশ শহর থেকে বড়দেরকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে এবং তদস্থলে ছোটদেরকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ফাতহুল বারি : ১৩/১০

৭০ হিজরির ফেতনার দিকে হাদিসে ইঙ্গিত

কিছু হাদিসে ৭০ হিজরির ফেতনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন : এক বর্ণনায় হজরত আবু হুরাইরা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "৭০ হিজরির সূচনা এবং শিশুদের রাজত্ব থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।"[৫৬৯] ইতিহাসে একথা প্রমাণিত যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বিরুদ্ধে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের রাষ্ট্রদ্রোহী আন্দোলন এবং তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বছর আবদুল মালেক রোমবাসীদের সাথে সন্ধি করে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরদের হাত করার চেষ্টা চালায়। ফলে ৭১ হিজরিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের অবসান ঘটে। ৭২ হিজরিতে মক্কায় অবরোধ এবং ৭৩ হিজরিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত।[৫৭০] এসব যুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই কুরাইশের কঠোরপ্রকৃতির আমিরদের হাত ছিল। হাদিসে এই ফেতনার দিকে স্পষ্টই ইশারা রয়েছে এবং এই ফেতনায় অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা ও বাঁচিয়ে রাখারও নির্দেশনা রয়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ 'ইমারাতুস সিবয়ান' দ্বারা উমাইয়া বংশের এই সকল শাসককে এজন্য উদ্দেশ্য করা থেকে বিরত থেকেছেন যে, 'সিবয়ান' অর্থ হলো শিশু। আর ইয়াজিদ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদসহ অন্য শাসকরা বাচ্চা তো ছিলই না; বরং পূর্ণ যুবক ছিল।

এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। কারণ, হাদিসে যুবকদেরই সিবয়ান বলে সম্বোধন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজের প্রচলনও এটাই যে, বড়দের

---

[৫৬৯] মুসনাদে আহমাদ : ৮৩২০

বর্ণনাকারীদের অবস্থা

আবু সালেহ যাকওয়ান : একজন সিকাহ রাবি। তাকরিবুত তাহযিব : ১৮৪১

আবুল আলা কামেল: সদুক। তাকরিবুত তাহযিব : ৫৬০৪

ইয়াহইয়া ইবনে আবু বকর: একজন সিকাহ রাবি। তাকরিবুত তাহযিব : ৭৫৬১ এই হাদিসটি ইবনে আবি শাইবাও তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন। ৩৭২৩৫ এর সনদ সহীত এবং মুত্তাসিল। এই বর্ণনার সনদের প্রত্যেক রাবিই সিকাহ

[৫৭০] তারিখুত তাবারি : ৬/১৫০, ১৫৭, ১৭৬; আনসাবুল আশরাফ : ৫/৪৬৪

উপস্থিতিতে তুলনামূলক ছোটদেরকে বাচ্চা বলেই সম্বোধন করা হয়। অভিজ্ঞ এবং সম্মানিতদের সামনে অনভিজ্ঞ ও আনাড়িদেরকে বাচ্চা বলে সম্বোধন করা অমূলক কিছু নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হজরত হুসাইন, হজরত আনাস, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো বড়মাপের সাহাবিদের সামনে ইয়াজিদ এবং ইবনে জিয়াদ বাচ্চা সমতুল্যই ছিল। যদিও দেখতে তারা যুবকই ছিল।

যদি হাদিসের শব্দকে তারা হাকিকি অর্থ নাবালেগ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ধরা হয় তাহলে এটা অনেক দূরবর্তী হয়ে যাবে। কারণ মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ২৯৫ হিজরিতে একজন নাবালেগকে শাসক বানানো হয়েছিল। সে ছিল আব্বাসি খেলাফতের মুকতাদির বিল্লাহ। তার বয়স তখন ছিল মাত্র ১৩। অথচ হাদিসের সকল ব্যাখ্যাকারই এব্যাপারে একমত যে, 'ইমারাতুস সিবয়ান'-এর হাদিস দ্বারা মূলত প্রথম হিজরি শতক এবং উমাইয়া বংশই উদ্দেশ্য।[৫৭১]

বাচ্চাদের ক্ষমতা গ্রহণের মাসআলায় আবু বারযা আসলামি রা. কে অপমানিত করা

ইয়াজিদের কিছু গভর্নর সাহাবায়ে কেরামের অসম্মান করাকে নিজেদের অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। একবার সে হজরত আবু বারযা আসলামি রা. কে দেখে দরবারের লোকজনের সামনে বলে বসল, এই তোমাদের মেদবহুল মুহাম্মদি!

হজরত আবু বারজা রা. তার কথা বুঝে গেলেন। কিন্তু তিনি তার কথা নীরবে সহ্য করে নিলেন। কিন্তু মুহাম্মদি বলে যে গালি সে দিয়েছে, তা সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি বললেন, "আমি জানতাম না যে, আমি এমন লোকের জন্ম হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকব, যে আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে থাকার কারণে লজ্জা দেবে।" একথা শুনে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বলল, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত আপনার জন্য না সৌন্দর্য আর না কোনো দোষের।"[৫৭২]

---

[৫৭১] মুসনাদে আহমাদ : ৮৩২০

[৫৭২] সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৪৯

হজরত আয়েয ইবনে আমর রা. এর অবমাননা

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কঠোরতা দেখে বেশ ক'জন সাহাবি তাকে বোঝালেন; কিন্তু তার ভেতর তো কোনো পরিবর্তন এলো না। উলটো তাদেরকে আরো অপমান করে ছাড়লো। হজরত আয়েয ইবনে আমর বাইয়াতে রিদওয়ানে শামিল ছিলেন। তিনি উবাইদুল্লাহকে বোঝাতে গিয়ে একদিন বললেন, "হে আমার ছেলে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক সে, যে খুব কঠোরপ্রকৃতির হয়। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করো।"

এই মায়ামাখা দরদভরা উপদেশের জবাবে উবাইদুল্লাহ বলল, "আপনি বসে পড়ুন। আপনারা তো নবীজির সাহাবি নামের কলঙ্ক।" হজরত আয়েয ইবনে আমর বললেন, "আচ্ছা, সাহাবিদের মধ্যেও কেউ আবার কলঙ্কিত আছে নাকি?"

কলঙ্কিত তো তাদের পরবর্তী ও তাদের প্রত্যাখ্যানকারী লোকেরা।[৫৭৩]

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. এর সাথে ইবনে জিয়াদের বাড়াবাড়ি

হজরত হাসান বসরি রহ. ইতিহাসে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের আগমন এবং তার নেতৃত্বের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ গভর্নর হয়ে আমাদের কাছে এলো। সে একটা মূর্খ এবং কমবয়সি বালক ছিল, রক্ত ঝরানোর বিষয়ে যে খুবই নির্মম ও নিষ্ঠুর ছিল। আমাদের এখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. ছিলেন। তিনি সেই দশজনের একজন, যাদেরকে হজরত উমর রা. শিক্ষক বানিয়ে বসরায় প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এক জুমায় উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি

---

[৫৭৩] সহিহ মুসলিম : ৪৮৩৬ আয়েয ইবনে আমর রা. ৬১ হিজরিতে অর্থাৎ ইয়াজিদের যুগে ইনতেকাল করেছিলেন। আল-ইসতিয়াব : ২/৭৯৯; আর উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যদিও হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর যুগে বসরার গভর্নর হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু প্রবল ধারণা এটাই যে, বুজুর্গ সাহাবিগণের সাথে বেআদবি করার দুঃসাহস পেয়েছিল মূলত ইয়াজিদের যুগে। যখন তাকে বসরার সাথে সাথে কুফা অর্থাৎ পূর্ণ ইরাক, ইরান, খোরাসান এবং আলজাজিরার শাসক বানিয়ে দেওয়া হলো।

তোমার কর্মপন্থা থেকে ফিরে এসো। সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক সেই, যে খুব কঠোর হয়।" উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তার এ কথা উত্তরে বলল, "আপনারা তো নবীজির সাহাবি নামের কলঙ্ক।" হজরত আয়েয ইবনে আমর তখন বললেন, "আচ্ছা! সাহাবিদের মধ্যেও কেউ আবার কলঙ্কিত আছে নাকি?" আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে শাসক একটি রাতের জন্য হলেও তার প্রজাদের সাথে ধোঁকা দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"

এ কথা বলে তিনি উঠে চলে এলেন এবং মসজিদে গিয়ে বসে পড়লেন। তখন আমরা তার আশপাশেই ছিলাম এবং তার চেহারায় সেই কষ্ট প্রত্যক্ষ করলাম উবাইদুল্লাহ, যা তাকে দিয়েছে। এসব দেখে আমরা তাকে বললাম, "আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন। সকলের সামনে সেই আহাম্মককে এসব বলার কী প্রয়োজন ছিল?" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বললেন, "আমার কাছে নবীজির এই হাদিস সংরক্ষিত ছিল। তাই আমি চাচ্ছিলাম মৃত্যুর পূর্বেই আমি তা প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দিই। হায় আফসোস, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের সাথে কথা বলার সময় যদি সেখানে বসরার সকল লোক থাকতো এবং আমার ও ইবনে জিয়াদের কথা শুনতে পেতো!"

হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, এরপরই মূলত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাকে দেখতে এসে বলল, "আমি আপনার জন্য কিছু করি এটা কি আপনি চান?"

আচ্ছা! আমি যা বলবো তুমি কি সত্যিই তা করবে?

হ্যাঁ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায় ইবনে জিয়াদের উত্তর।

তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বললেন, "তুমি আমার জানাজার নামাজ পড়তে এসো না। আমার কবরে যেয়ো না। আমার এবং আমার সাথিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না।"[৫৭৪]

---

[৫৭৪] এটি ইবনে আবি আসেম 'আলআহাদ এবং আল-মাসানি'তে বর্ণনা করেছেন : ১০৯২ ও ইবনে হারুন আররুয়ানি 'মুসনাদে রুয়ানি'তে বর্ণনা করেছেন, ১১১৮ এবং হাকামুন আল-

ইয়াজিদ থেকে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ পর্যন্ত

হজরত মুয়াবিয়া রা. পূর্ণমাত্রায় নিরাপত্তা বজায় রাখার সদিচ্ছায় ইয়াজিদের উপর শাসনকার্যের ভার অর্পণ করলেন। হজরত হুসাইন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইসলামি রাজনীতিতে পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া ক্ষমতা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হওয়ার বিষয়টা হজরত মুয়াবিয়া রা. কে জানিয়ে সতর্ক করেছিলেন, যেন অযথা ও অন্যায় রক্তপাত থেকে সাধারণ মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে। এরপর যখন ইয়াজিদ ক্ষমতাসীন হলো তখন এসব ব্যক্তির মতাদর্শ লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল এবং ধীরে ধীরে তা যুদ্ধের রূপ নিলো। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতি থেকে এটাই বুঝা যায় যে, তিনি ক্ষমতার হস্তান্তর এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার সংশোধন উম্মতের 'ইসতিনাসে'র মাধ্যমেই করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি যখন কুফাবাসীকে ক্ষমতাসীনদের উপর অবিশ্বস্ত দেখলেন তখন তিনি নিজে ইয়াজিদের সাথে কথা বলতে চাইলেন এবং বিষয়টা সমাধানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ সে পর্যন্ত আর পৌঁছতে দিলো না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. নিজের ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে যদিও ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হননি; কিন্তু নিজেও আবার খেলাফতের দাবি তোলেননি। এবং উম্মতকে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। যদিও ইয়াজিদ না বুঝেই তার উপর সৈন্য নিয়োগ করে জুলুম ও অন্যায় করেছে।

হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যেই পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা পরবর্তীতে ভুলই সাব্যস্ত হয়েছিল। অথচ তার পৌত্র মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ এই পৈত্রিক ক্ষমতার ধারা

কাযায়ি "মুসনাদুশ শিহাবে" ৮০৬ মুসনাদুর রুয়ানিতে এই বর্ণনা হজরত হাসান বসরি রহ.-এর স্থানে ওয়াহাব ইবনে কায়সান থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আলবানি এই সনদকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নোট : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা.-এর ইনতেকাল নিয়ে তিন ধরনের কথা পাওয়া যায়। ৫৭ হিজরি ৬০ হিজরি ৬১ হিজরি। তবে এক্ষেত্রে প্রবল ধারণা মতে তিনি ৬১ হিজরিতে ইয়াজিদের যুগে ইনতেকাল করেছিলেন। আর এই ঘটনাটাও সম্ভবত ইয়াজিদের যুগেরই ঘটনা। কারণ হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর যামানায় শাসকরা এমনটা করতে পারতো না।

উচ্ছেদ করে উম্মতের মাঝে পুনরায় শুরাইয়্যাত ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর সাথে উমাইয়া আমিরদের লড়াই

মিসর থেকে খোরাসান পর্যন্ত উম্মতের প্রত্যেক সদস্যই এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে খলিফা মেনে নিলো। এর জন্য না কোনো সৈন্য নিয়োগ বা জোরজবরদস্তির প্রয়োজন ছিল আর না কোনো অন্যায় রক্তপাতের। সবখানে সবাই নিজেদের সন্তুষ্টিতেই বাইয়াত হয়েছিল। এই সময় উম্মতের ইতিহাসে অনেক ভাবনা-চিন্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ছিল। কারণ, তখন দ্বিতীয়বারের মতো উম্মতের রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরাইয়্যাতে ফিরে আসছিল। কিন্তু তখন বনু উমাইয়া ও শামের কিছু রাজনীতিবিদ আমির হঠকারিতা ও গোত্রপ্রীতির পরিচয় দিলো এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল। সেই সাথে তরবারির মাধ্যমে সবকিছু সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিলো। তাদের অবস্থান ছিল এমন যে, যদি খেলাফত আমাদের আয়ত্তে আনতে অনেক কঠোরতা ও জোরজবরদস্তি করতে হয় তাহলে তা-ই করব এবং তরবারি ও রাজনীতির প্যাঁচে ফেলে তাদের থেকে খেলাফত ছিনিয়ে আনবো।

তাদের এই নীতিটা মূলত ইসলামি রাজনীতির মৌলিক নিয়ম তথা ইসতিনাস এবং শুরাইয়াতের সাথে শতভাগ সাংঘর্ষিক। একদিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হজরত নুমান ইবনে বাশির, হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস, হজরত আনাস ইবনে মালেক এবং আখনাফ ইবনে কায়েস-এর মতো বড় বড় ব্যক্তি; অপরদিকে মারওয়ান, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবং আমর ইবনে সাঈদের মতো কিছু আমির। যদি এরা কেন্দ্রের সাথে মিলিত হয়ে যেতো, তাহলে ইসলামি ইতিহাসের চিত্র অন্যরকম হতো এবং বিজয় ও আনন্দের স্রোত তৈরি হয়ে যেতো। কিন্তু তাদের ভুল চিন্তার কারণে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো, যা বাহ্যত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আর বাস্তব সত্য হলো সেই যুদ্ধ আজও অব্যাহত আছে। কারণ সাধারণ জনগণের সন্তুষ্টি ও আগ্রহ উপেক্ষা করে শক্তি ও ক্ষমতার বলে রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া এটা মূলত জাহেলিযুগের নীতি ছিল। এতে যে

সম্পদের ক্ষতি, জীবনের ক্ষতি ও সর্বপ্রকার ক্ষতিই সাধিত হয় তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। ইসলাম এ সবকিছুই নিষেধ করে দিয়েছে। তাহলে যারা এসব করে সামনে বাড়ে ও ক্ষমতার মসনদ দখল করে তাদেরকে কীভাবে অনুমতি দেয়!

আফসোস, এমনটাই হয়েছে ও হচ্ছে। যখন এসব রাজনীতিবিদ ক্ষমতা দখলের জন্য তরবারিকেই উপযুক্ত হিসেবে বেছে নিলো তখন তাদের পরবর্তীরা সকলেই রাজ্যদখলের ক্ষেত্রে এই নীতিকেই আদর্শ ও সফলতার প্রধান পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করল।

রাজনৈতিক বিবাদ এবং গৃহযুদ্ধের শেকড়

তরবারির গুরুত্ব অস্বীকার নয়; বরং ইসলামের পয়গাম হলো, তরবারি অমুসলিমদের সাথে প্রতিরোধ ও আক্রমণাত্মক ভূমিকায় এবং দেশের সীমান্ত রক্ষায় ব্যবহার করা হবে। তাই বলে একজন শরিয়তসম্মত, ন্যায়পরায়ণ ও নেককার আমির থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার কোনো অনুমতি ইসলাম দেয়নি। ইসলামের এই সোনালি অধ্যায়ের পতনটা মূলত শুরু হয়েছে হিজরি প্রথম শতকে, যখন তারা সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের আদর্শ উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপরিচালনা করা হতে থাকল। এতে একের পর এক ঘটতে থাকল অন্যায় যুদ্ধ ও অযথা রক্তপাত। এভাবে যখন এসব রাজনীতিবিদ ইসতিনাস, শুরাইয়াত এবং জনগণের সন্তুষ্টি ও আগ্রহের ইসলামি রাজনীতি পরিত্যাগ করে শক্তি ও আগ্রাসী মনোভাবের রাজনীতিকে ধারণ করল তখন শান্তি ও নিরাপত্তা বলতে তেমন কিছু বাকি থাকল না। প্রজাসাধারণ শাসকদের ব্যাপারে আর শাসকরা প্রজাদের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়ল। প্রজা ও শাসকের মধ্যে এই দূরত্বের ফলে ঘরে ঘরে দেখা দিলো মতানৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রদ্রোহ। সারা দেশ ও সমাজ ভাগ হয়ে গেলো ছোট ছোট দল ও উপদলে। এতে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে গৃহযুদ্ধটা হয়ে পড়ল আবশ্যিক বিষয়। যেমনটা চলে আসছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মাঝে।

এতে আবার উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাবান হওয়াটা দাঁড়ালো একেবারে বিষকাঁটা হয়ে। যদিও এই নিয়মে কিছু কিছু ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু ব্যাপকভাবে নিয়ম এটাই ছিল যে, বাবার পর ছেলে, ছেলের পর তার ছেলে কিংবা ভাই অথবা খুব কাছের কোনো আত্মীয় ক্ষমতার

অধিকারী হবে। এটা ছিল তখনকার রাজনৈতিক নীতি। অথচ ইসলাম ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে। যদিও এই সাম্প্রদায়িক নীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে দেয় বিরাট সব সমস্যার সম্মুখীন। কারণ তখন সীমাবদ্ধতা চলে আসে এবং একটি বিশেষ শ্রেণিই এ থেকে ফায়দা লুটতে থাকে। এতে যদি তারা অযোগ্য ও অনুপযুক্তও হয় তবু রদবদলের কোনো দিক খোলা থাকে না। ফলে অনেক যোগ্য ও বড় বড় আমিরও থেকে যায় ক্ষমতাবঞ্চিত, থেকে যায় অবহেলিত।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা, সর্বব্যাপী সত্য, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া ইসলাম এটাকে কখনোই মেনে নেয় না। যদি ইসলামকে বিশ্বজয়ী করে তুলতে হয় তাহলে অবশ্যই এর পরিবর্তন আবশ্যক ছিল। কিন্তু উমাইয়া এটা করেনি। বরং পূর্বাপর কিছু না ভেবে এই নীতিকেই তারা পরবর্তীদের জন্য প্রবর্তন করে গিয়েছিল। এতে ঠিক তেমন ফলই বেরিয়ে এসেছিল যেমনটা ঘটেছিল পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। কারণ এই বংশের বাইরের যারা যোগ্য, কর্মঠ ও ক্ষমতাবান ছিল, তারা যখন দেখল এদের হাত থেকে স্বাভাবিকভাবে কোনোদিন রাজত্ব পাওয়া সম্ভব নয় তখন তারাও তরবারি হাতে বিষয়টার সমাধানে এগিয়ে আসলো। ফলে হিজরি দ্বিতীয় শতকে ইসলামের বিশ্বজয়ী ক্ষমতা হারিয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেলো এবং স্থানে স্থানে ছোট ছোট দল গড়ে উঠল। এই সুযোগে তৎকালীন অন্য ক্ষমতাসীনরা ভাগ বসাতে থাকল ইসলামি অঞ্চলগুলোতে। ধীরে ধীরে নিয়ে গেলো নিজেদের অধিকারে। তখন খেলাফত ও খলিফা শুধু নামেই থেকে গিয়েছিল। আর সুবেদাররা 'সুলতান' সেজে সর্বদিক গ্রাস করতে থাকল। এরপর তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, অভ্যন্তরীণ কলহ ও ক্ষমতার পালাবদল সে এক ভিন্ন দাস্তান। অথচ তারা যদি প্রকৃতপক্ষেই ইসতিনাস, শুরাইয়্যাত এবং জনগণের সন্তুষ্টি ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিতো তাহলে একথা হলফ করেই বলা যায় যে, এতো দ্রুত এবং কম সময়ে ইসলামি খেলাফতের দুরবস্থা ও দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

তাই বলে আমরা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে খারাপ কোনো মন্তব্য করছি না। কারণ, মারওয়ান, আবদুল মালেক এবং এই ঘরানার আরো কিছু

মানুষ আদব, আখলাক, নেতৃত্ব এবং জ্ঞানে-গুণে পরবর্তীদের থেকে অনেক উত্তম ছিল। আর ইসলামি খেলাফত ও ইতিহাসের এই যে পতন, এটা শুধু তাদের কিছু রাজনৈতিক ভুলের কারণে।

সর্বোপরি হিজরি প্রথম শতকে যা যা ঘটেছিল, সেটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ীই ঘটেছে। সৃষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়তো এটাই ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম জীবিত থাকতেই সবরকমের অবস্থা সামনে চলে আসবে। খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে আম্মাহ, নেতৃত্ব ও রাজত্ব, জিহাদ ও গৃহযুদ্ধসহ সবরকম পরিস্থিতির প্রথম সম্মুখীন তারাই হবেন। এজন্যই অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যাচ্ছিল।

হজরত আবদুর রশিদ নুমানি রহ. এই বাস্তবতা এভাবে উল্লেখ করেছেন, "খেলাফত রাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার জন্য কুদরতিভাবেই এই স্তরগুলো অতিক্রমের প্রয়োজন ছিল। ফলত খেলাফতে উসমানি ও আলি এবং অন্যান্য খেলাফতও অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যাদের দ্বারা এসব ফেতনা সংঘটিত হয়েছিল, সেসব হওয়া নিয়তিতেই লেখা ছিল, তা ভালো হোক বা মন্দ। আল্লাহ তায়ালার এক অপরিবর্তনশীল নিয়ম হলো, যার উত্থান আছে তার পতন হবেই। নববি খেলাফত শেষ হওয়ার জন্য প্রথম পদ্ধতি এই ছিল যে, নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যেতো। আর দ্বিতীয় রাস্তা ছিল এই যে, ধীরে ধীরে এতে দুর্বলতা আসবে এবং একপর্যায়ে শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু দ্বিতীয় নীতি অনুসারেই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী পরিচালনা করেন; তাই খেলাফত ধ্বংসের পেছনেও এই নীতি কাজ করেছে। কারণ এই খেলাফতে নবুওয়াতের সময়-সীমা আল্লাহ তায়ালার কাছে ৩০ বছরই নির্ধারিত ছিল এবং এরপরই ধ্বংস হওয়ার ফয়সালা ছিল।"[৫৭৫]

---

[৫৭৫] নাসেবিয়্যাত তাহকিক কি ভ্যাস ম্যে : ৩৪৯

সাহাবিদের যুগে কেন এতো যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল?

অধিকাংশ লোকই এই প্রশ্ন করে যে, আচ্ছা, সাহাবায়ে কেরামের যুগ ১১ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত ছিল। এই অল্প সময়ে তখন কেন এতো অধিক পরিমাণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? অথচ পরবর্তী সময়েও এতটা রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। তারা কি আসলে এমনই ছিলেন যে, সবসময় যুদ্ধ নিয়ে পড়ে থাকতেন?

এই প্রশ্নটা আসলে ভুল বুঝ ও অশুদ্ধ চিন্তার কারণে আসে। বাস্তবতা হলো, সত্যি বলতে সেই যুগে এতো রক্তপাত ও যুদ্ধ অবশ্যই হয়নি, যার বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন ইতিহাসের বইতে। মূলত তখনই সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা ও শান্তি ছিল ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রে। কারণ ঐতিহাসিক যেকোনো ঘটনাই সামগ্রিকভাবে তৈরি হয়। এবং কোনো ঘটনা তখনই বিশেষ হয়ে ওঠে যখন তা স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে। এজন্য যেকোনো ঘটনাতেই অধিকহারে পরিত্যাজ্য ও বাতিল বিষয়ের সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যদি কোনো শহরের মসজিদে প্রচুর পরিমাণ মুসল্লির উপস্থিতিতে নামাজ আদায় হয় তাহলে সেটা তেমন বিশেষ কোনো সংবাদ হয়ে ওঠে না এবং ইতিহাসেও স্থান পায় না। কিন্তু যদি কোনো এলাকায় দশজন চোর বা ডাকাত ধরা পড়ে কিংবা মোটামুটি কোনো নিহতের ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা রীতিমতো সমাজের শিরোনাম হয়ে যায় এবং আলোচনার মূল ও প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের বিশ্বস্ততা, আমানতদারি ও সবরকম নিয়ম-নীতি মেনে চলা কোনো সংবাদ হয় না। অথচ বিপরীতে একজন থাকলেও সেটাই সংবাদ হয়ে যায়। আর এই ব্যক্তিদের কেউ যদি হয় ক্ষমতাসীন তাহলে তো সেসব হয়ে ওঠে ইতিহাসের অনিবার্য অংশ। যেমন : সাধারণ কেউ যদি অপর কাউকে গালি দেয় তাহলে সেটার কোনো গুরুত্বই থাকে না; কিন্তু কোনো ক্ষমতাসীনের থেকে যদি এমন আচরণ প্রকাশ পায় তাহলে সেটাই প্রধান

সংবাদ হয়ে থাকে। সুতরাং সেসময়কার বড় বড় ব্যক্তির ব্যাপারে যেসব কথা প্রসিদ্ধ আছে সেগুলো বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই না।

সাহাবায়ে কেরামের যুগেই মূলত প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, উত্তম আখলাক ও কল্যাণ ছিল। সাহাবায়ে কেরামের সেসব উত্তম গুণ এবং সেসময়কার ঈর্ষণীয় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আলাদা কিতাব যেমন : 'আল-ইসাবাহ' ' আল-ইসতিয়াব' ' উসদুল গাবাহ' 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' 'হিলয়াতুল আউলিয়া' এবং 'হায়াতুস সাহাবা'তে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে মূলত খেলাফত ও ক্ষমতা সংক্রান্তই ঘটনা বেশি এসেছে। সেজন্যই ইতিহাসের অধিকাংশ স্থানে তাদের যুদ্ধ-জীবনটাই ফুটে উঠেছে। নয়তো তাদের সময়কাল মূলত খুব কমই ছিল এবং অন্যায়ও খুব কমই সংঘটিত হয়েছিল।

খেলাফতে রাশেদায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত (১১ হিজরি) থেকে শুরু করে হজরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত (৩৫ হিজরি) পর্যন্ত এই ২৪ বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। যদিও হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়কালে মুসাইলামা কাজ্জাব এবং মুরতাদদের ফেতনার প্রতিরোধকে পারস্পরিক যুদ্ধই বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, তা মূলত ছিল হক ও বাতিলের মধ্যকার সংঘাত। তা ছাড়া এই ফেতনাও বছর খানিকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ১২ হিজরি থেকে ৩৫ হিজরি পর্যন্ত পুরোপুরি নিরাপত্তা বজায় ছিল। অবশ্য ইবনে সাবা এসময় যদিও গোপনে শত্রুতা ছড়াচ্ছিল; কিন্তু এতে তেমন কোনো যুদ্ধ হয়নি। হজরত উসমান রা. নিজের শাহাদাতের আগ পর্যন্ত মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি। মুসলিমদের মাঝে সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়েছিল ৩৬ হিজরিতে জঙ্গে জামালে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায়। ঠিক এমনিভাবে হয়েছিল জঙ্গে সিফফিনে। মুসলিম ও হকপন্থিদের পরস্পর সংঘটিত এই দুই যুদ্ধ এবং পূর্বাপর সবকিছু সমাধানে বেশির চেয়ে বেশি ৮ মাস সময় লেগেছিল। কারণ, জঙ্গে জামালে তরবারি চলেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। আর সিফফিনে ৩ দিন। আর হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে খারেজিদের সাথে যুদ্ধ এবং তার পূর্বাপর সবকিছু ঠিক হতে সর্বোচ্চ সময় লেগেছিল ৪ মাস। আর

কুফা এবং শামের সৈন্যদের মাঝে সীমান্ত নিয়ে সমস্যা চললো এক বছর। এরপর হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ২০ বছরের শাসন পুরোপুরি নিরাপদ ছিল এবং শতভাগ নিরাপত্তার সাথেই কেটে গেলো। সাহাবায়ে কেরামের ৫০ বছরের এই শাসনের দিকে ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, সবমিলিয়ে এই ৫০ বছরে যুদ্ধ বা অস্থির সময় কেটেছে মাত্র দুই থেকে আড়াই বছর। সাহাবায়ে কেরামের রাজনীতি ও হুকুমতের যুগ এই ৫০ (১১ হিজরি থেকে ৬০ হিজরি পর্যন্ত) বছরেই এসে শেষ হয়েছে।

এই ৬০ হিজরির পর থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত ১৩ বছরের শাসন ও ক্ষমতার অধিকাংশই কেটেছে তাবেয়িদের হাতে। এই ১৩ বছরেই মূলত মুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইয়াজিদের পৌনে চার বছরের শাসনকালে সংঘটিত হয়েছিল কারবালা, হাররা এবং দুইবার হিজাজে, যাতে সামগ্রিকভাবে সময় চলে গিয়েছিল প্রায় ১ বছর। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে শামের আমির, মুখতার সাকাফি এবং সেইসাথে খারেজি সম্প্রদায় একযোগে কেন্দ্রীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলো। সেজন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগের অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল এসবে। তবে এসব ঝামেলার দায়ভার তাদের উপরই বর্তাবে, যারা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত মেনে নেননি। ৯ বছরের এই সময়কালে ৫ বছর কেটে ছিল নিরাপত্তাহীন ও অস্থিতিশীল অবস্থায়। অথচ ৬৭ হিজরি থেকে নিয়ে ৭০ হিজরি পর্যন্ত ৪ বছরের এই সময়ে অল্প ও ছোটখাটো সমস্যা ছাড়া পুরো সময়জুড়ে বেশ নিরাপদ অবস্থা বিরাজ করেছিল। কেউ যদি খুব ভালো করে চিন্তা করে তাহলে এটা তার কাছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অধিকাংশ যুদ্ধই মূলত হয়েছিল বসরা, কুফা এবং পারাস্য ও খোরাসানে। আর সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের যুগে অন্যান্য সব স্থানেই নিরাপত্তা ছিল। ইরাক ব্যতীত যদি অন্যান্য অঞ্চল দেখা হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই ৪০ বছর সময়কালে মিসরে মাত্র দুটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। একটি মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের বিরুদ্ধে হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ। আরেকটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর গভর্নরের বিরুদ্ধে মারওয়ানের আক্রমণ। আর হিজাজে সর্বমোট ৫টি যুদ্ধ হয়েছিল:

১. মক্কায় আমর ইবনে সাঈদের আক্রমণ।
২. মদিনায় মুসলিম ইবনে উকবার আক্রমণ।
৩. মক্কায় হুসাইন ইবনে নুমাইরের হামলা।
৪. মদিনার বাইরে শামের সৈন্যদের সাথে মুসআব ইবনে যুবাইরের মোকাবেলা।
৫. সর্বশেষ, মক্কায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আক্রমণ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে জাজিরাতুল আরবের প্রান্তসীমায় অবস্থিত বাহরাইনসহ আরো কিছু অঞ্চলে খারেজিদের বেশ প্রভাব ছিল; কিন্তু 'জুওয়াসি'র যুদ্ধ ছাড়া সেখানে বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ হয়নি। আর শামে দুইটি যুদ্ধ। একটি জঙ্গে সিফফিন এবং অপরটি মারজে রাহাতে সংঘটিত হয়েছিল। তবে এই যুদ্ধে অনেক বড় বড় মনীষীর শামিল থাকায় বিষয়টা একটু জটিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকেই বাড়াবাড়ি করে বিষয়টা আরো ঘোলা করে দিয়েছে। আমরা সেই ঘটনাকে ৫০-৬০ পৃষ্ঠায় আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতোসব দুর্বল বর্ণনায় সঠিক ও ভুলটা আলাদা করে উপস্থানের কারণে তাহকিকের সফর কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে।

যদি চিন্তা করা হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরামের পরে উম্মতের মাঝে ফেতনা-ফাসাদের যে আধিক্য দেখা দিয়েছিল, তাতে তাদের মধ্যকার মতভেদ এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি অনেক বেশিই হয়েছিল। কারণ তখন মুসলমানরা মুসলমানদের রক্ত সামান্য কারণেই হালাল মনে করত। অথচ সাহাবায়ে কেরামের যুগে এক্ষেত্রে সবাই ছিল শতভাগ সতর্ক।

আমরা যদি আমাদের ইতিহাস থেকে সামান্য সরে ইউরোপ, হিন্দুস্তান এবং চীনের ইতিহাস অধ্যয়ন করি তাহলে তাতে রক্তপাত, যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও হত্যার যেই ভয়ানক চিত্র সামনে আসবে তার সামনে ইসলামের এসব যুদ্ধকে কিছুই মনে হবে না। অনেক দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দু-তিন শতক পূর্বে ইউরোপের নতুন দুনিয়া আমেরিকায় পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের যে-ইতিহাস তৈরি করেছিল এবং সাধারণ জনগণকে যে হারে নিধন করেছিল, তা নিঃসন্দেহে কয়েক লাখ ছাড়াবে। তেমনিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা তো সবারই কমবেশি জানা আছে।

এ ছাড়াও এসব অঞ্চলের অনেক ও অসংখ্য হত্যার সংবাদ, যেগুলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে না, সেগুলোর কথা না-হয় থাক।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এই ইসলামবিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা নিজেদের দোষ আড়াল করে আমাদের ইতিহাসের হাতেগোনা কিছু ঘটনাকে এমনভাবে বিকৃত করে উপস্থান করে, যা শুধু আমাদের যুগ বা ইতিহাসই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের সময়কালকেও বিকৃত করে ইসলামকে মানুষের নিকট সংশয়পূর্ণ করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

এখানে তাদের একটি প্রশ্ন হলো, এতো বড় বড় নেককার এবং পরহেজগারদের উপস্থিতিতে বারবার কেন তরবারি চলেছিল? কেন এই বিষয়গুলো পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে নেওয়া হলো না? ক্ষমতার রদবদলে কেন নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হলো; অথচ ইসলামে এসব সমাধানের জন্য সর্বপ্রকার নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থা রাখা আছে? তাহলে প্রথম যুগের মুসলিমগণ সেগুলোর প্রতি কেন ভ্রুক্ষেপ করেননি?

এই প্রশ্নগুলো আসলে তাদের মধ্যে এসেছে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে। পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই যুগের মুসলমানগণ সর্বাবস্থাতেই পরস্পর আলোচনা করে সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিল। কারণ তারা জানতেন যে, নিরাপত্তাটা সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য খুব প্রয়োজন ও জরুরি এবং এটা তাদের সমাজ টিকে থাকার মূলভিত্তি। তাই সাহাবি ও তাবেয়িগণ সেই চিন্তাই লালন করতেন এবং ক্ষমতার রদবদলের ক্ষেত্রে নীরবতাই পছন্দ করতেন। সেইসাথে নিজে ক্ষমতা পাওয়ার লোভ কখনোই করতেন না। কারণ তারা জানতেন ক্ষমতার লোভ, সম্পদের ভালোবাসা এবং পার্থিব জীবনের জন্য লড়াই করা শরিয়তসম্মত নয়। আর ইসলামের মৌলিক নিয়ম সবসময়ই ফেতনা-ফাসাদের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে আর সেগুলো করতে নিষেধ করেছে। সেইসাথে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে গোটা সমাজ এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃরাজনীতিতে নিরাপত্তাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামে একজন মানুষের জীবন ও সম্পদের যে পরিমাণ মূল্য রয়েছে, তা কুরআন-হাদিস থেকেই পরিষ্কার পাওয়া যায়। ইসলাম মুসলমানকে যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনই গুরুত্ব দেয় জিম্মিদের ব্যাপারে। সুতরাং ইসলামি ভাবধারা ও আদর্শ বজায় থাকলে একজন মানুষকে

অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে আর সেটা মুসলমানগণ মেনে নেবে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

বাস্তবতা হলো, হজরত উসমান এবং হজরত আলি থেকে নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর পর্যন্ত সকল সাহাবি শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই ছিল। সে-কারণেই তারা অন্যান্য মুসলমানের রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমনটা ইতিপূর্বে আমরা সঠিক বর্ণনার আলোকে উপস্থাপন করেছি। এ ছাড়া কালেভদ্রে যদিও তাদের কেউ তরবারি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে সেটা শুধু বিদ্রোহ দমনের জন্য, শরিয়তও যার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। আর বাস্তবেও এর প্রয়োজন অনেক। কারণ অভ্যন্তরীণ শত্রুদের যদি প্রতিহত করার কোনো অধিকার শাসকের হাতে না থাকে তাহলে কস্মিনকালেও কোনো খেলাফত বা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। যখন-তখন তা ধ্বংসের মুখে পড়বে। এজন্য আমরা যদিও সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখি, যাতে অনেক সম্মানিত ও বড়মাপের সাহাবিও শরিক ছিলেন, তাহলে আমরা যেন তা সন্দেহ এবং অতিরঞ্জন ও যেমন-তেমনভাবে গ্রহণ না করি এবং আমরা যেন সেগুলো সঠিক বর্ণনার মাধ্যমে যাচাই করি। তাহলেই সম্ভব মন থেকে এ ধরনের প্রশ্ন দূর হওয়া।

তাই বলে আমরা একথা অস্বীকার করছি না যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোনো যুদ্ধ হয়নি। বরং সেসব নিয়ে যা ছড়ানো হয়েছে, তার চেয়ে আরো অনেক কম হয়েছে। তা ছাড়া এগুলো হয়েছিল অপারগ অবস্থায়। তবু যা-কিছু হয়েছিল, সেগুলো খুব সামান্য। কিন্তু এগুলোকে কোনো কোনো পথভ্রষ্ট ও মন্দপ্রিয় ব্যক্তি রং চড়িয়ে জঘন্যভাবে উপস্থাপন করেছে এবং আরো একটু সামনে বেড়ে সেগুলোকে ইতিহাসের পাতায় জমা করে রেখে গেছে। সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, ইতিহাসকে খুব ধীরে ধীরে ও সতর্কতার সাথে পড়তে হবে এবং মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিশ্বাস রাখা যাবে না।

সাহাবিদের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে কিছু মৌলিক কথা

এসব যুদ্ধের বাস্তবতা এবং সাহাবিদের তাতে অংশগ্রহণ করার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। তবু এখানে আমরা সেগুলোকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

১. যখন হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা শুরু হলো তখন তিনি মদিনা এবং মুসলমানদের সম্মানের দিকে লক্ষ রেখে তাদেরকে প্রতিরোধ করা থেকে বিরত থাকলেন এবং নবীজির অসিয়ত অনুযায়ী খেলাফতকে কালিমাযুক্ত করতে চাইলেন না। সর্বোপরি এই রাষ্ট্রদ্রোহীরাই তাকে শহিদ করে দিলো।

২. হজরত আয়েশা, হজরত তালহা, হজরত যুবাইরসহ বেশ কিছু সাহাবি হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নিতে বসরা গিয়েছিলেন। হজরত আলি রা. তখন তাদের সাথে একমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে সাবার কুচক্রী মহল এই উভয় দলের মাঝে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলো। সুতরাং এই যুদ্ধটা হয়েছিল মূলত উভয় দলের ভুল বোঝাবুঝির কারণে। যার কারণে আমরণ তাদের মধ্যে আফসোস ছিল।

৩. হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণে কিছুটা বিলম্ব করছিলেন। কারণ শামবাসীরা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে অস্থির হয়েছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. কে খেলাফতের উপযুক্ত তো মনে করতেন ঠিকই; কিন্তু হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার আগ পর্যন্ত বাইয়াত গ্রহণ স্থগিত রাখার প্রবক্তা ছিলেন। তার এই ইজতিহাদটা ভুল ছিল। তবে তাতে তার নিয়ত সঠিক ছিল। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রটা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ইরাক ও দামেশকের দুই অপরাজেয় শক্তির কারণে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অকারণে এই হতাহতের পর উভয়

আমিরের মাঝেই নিরাপত্তার প্রয়োজনবোধ জেগে উঠল। ফলে যুদ্ধও থেমে গেলো। কিন্তু কিছু সমস্যা রয়েই গেলো এবং সেই জের ধরেই খারেজিরা হজরত আলি রা. কে শহিদ করে দিলো।

৪. হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর হজরত হাসান রা. ৬ মাস খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেন এবং কোনো প্রকার অক্ষমতা ও অপরাগতা ছাড়াই শুধু উম্মতের কল্যাণের দিকে লক্ষ করে ৪০ হিজরিতে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর প্রায় ২০ বছর উম্মত পূর্ণ নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল সময় পার করল।

৫. এরপর হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজ ইজতেহাদের ভিত্তিতে একজনের কাঁধে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তার এতটুকু ইজতিহাদ সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। কিন্তু খলিফা হিসেবে নিজের ছেলেকে নির্ধারণ করা ছিল ভুল। কিন্তু তাতেও তার নেক নিয়ত ছিল এবং উম্মতের কল্যাণের দিক বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন। কিন্তু এর ফল খুব বেশি ভালো হলো না। এরপরও প্রায় সকলেই ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিল, যাতে কোনো প্রকার রক্তপাত না হয়।

৬. হজরত হুসাইন রা. পৈত্রিকসুত্রে প্রাপ্ত খেলাফত নিয়ে খুব শঙ্কিত ছিলেন। তাই তিনি উম্মতের সংশোধন ও কল্যাণের জন্যই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কুফাবাসীদের গাদ্দারি এবং ইয়াজিদের সৈন্যদের জুলুমের শিকার হয়েছিলেন।

৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতোই ছিল। দীর্ঘদিন তিনি হারাম শরিফে আশ্রয় নিয়ে নীরবে পড়ে থেকেছেন। কিন্তু এরপরও তিনি নিজে খেলাফতের দাবি করেননি।

৮. ইয়াজিদকে আমির নির্ধারণের বিষয়টা হজরত মুয়াবিয়া রা. শরিয়তসম্মতভাবেই করেছিলেন। কিন্তু এরপর ফল দেখার জন্য তিনি জীবিত ছিলেন না। তারপর মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের অবস্থা অন্যরকম দেখে পুনরায় উম্মতের উপর খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। ফলে সাধারণ ও বিশেষ মোটকথা প্রায় সকল মুসলমানই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত

হয়ে গেলো। আর তিনি শরিয়তসম্মত আমির হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

৯. মারওয়ান এবং তার ছেলে আবদুল মালেক হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই খেলাফত মেনে নিলো না। বরং শামে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তরবারির জোরে নিজেদের বংশীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো এবং তাদের মাধ্যমেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ধ্বংস হলো।

সর্বোপরি কথা হলো, হিজরি প্রথম শতকে হকপন্থিরা খেলাফত এবং বিদ্রোহ সংক্রান্ত অন্যদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াও আরো কিছু যেমন : খারেজি, সাবায়ি এবং মুখতার সাকাফির সাথে যেই সংঘাতগুলো হচ্ছিল, সেগুলো নিঃসন্দেহে হকের উপরই হয়েছিল।

তারিখে সাহাবা : ফেতনাময় যুগের একটু ঝলক

৬০ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৯২

৬০ হিজরি

১. হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল... অনুসন্ধানী মত হলো ৪ রজব, (১১ এপ্রিল ৬৮০ খৃষ্টাব্দ) আর প্রসিদ্ধ মত ২২ রজব।

২. দামেশকে ইয়াজিদের আগমন এবং খেলাফতের অধিকার আদায়... রজব (এপ্রিয় ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. বাইয়াত গ্রহণের জন্য মদিনায় ইয়াজিদের প্রতিনিধির আগমন...রজব (মে ৬৮০)

৪. মদিনা থেকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর রওনা...রজবের শেষ দিকে (মে ৬৮০)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ও হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মক্কায় আগমন...শাবানের শুরু দিকে (মে ৬৮০)

৬. হিজাজ থেকে ওয়ালিদ ইবনে উতবার অপসারণ এবং আমর ইবনে সাঈদের নিয়োগ...রমজান (জুন ৬৮০)

৭. কুফা থেকে হজরত নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপসারণ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ক্ষমতাগ্রহণ

৮. আমর ইবনে সাঈদকে হজের আমির নির্ধারণ

৯. হজরত মুসলিম ইবনে উকবা রাহ.-এর শাহাদাত। জিলহজের ৮ তারিখ (১০ সেপ্টেম্বর ৬৮০)

১০. হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মক্কা থেকে কুফায় রওনা জিলহজের ৮ তারিখ (৯ সেপ্টেম্বর ৬৮০)

৬১ হিজরি

১. কারবালার দুঃখজনক ঘটনা। ১০ ই মুহাররম। (১১ অক্টবর ৬৮০)

২. খোরাসানের আমির হিসেবে মুসলিম ইবনে উকবার নিয়োগ। (৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে গ্রেফতার করার জন্য আমর ইবনে সাঈদের ব্যর্থ অভিযান।
৪. হিজাজের ক্ষমতা থেকে আমর ইবনে সাঈদের অপসারণ এবং ওয়ালিদ ইবনে উতবার পুনঃনিয়োগ। (৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. ওয়ালিদ ইবনে উতবাকে হজের আমির নির্ধারণ। (৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. হজরত আয়েয ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ)

৬২ হিজরি

১. ইয়াজিদের কাছে মদিনা থেকে একটি কাফেলার আগমন। (৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ)
২. আফ্রিকায় উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর তৎপরতা (৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. মধ্যএশিয়ায় মুসলিম ইবনে জিয়াদের বিজয়গাথা। (৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদের শাহাদাত এবং কাবুলের প্রান্তে পরাজয়। (৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. কাইসারিয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে আসাদের জিহাদ। (৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. হজের আমির হিসেবে ওয়ালিদ ইবনে উতবাকে নির্ধারণ। (৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. মিসরের হাকিম মুসলিম ইবনে মুখাল্লাদ, আলকামা ইবনে কায়েস নাখায়ি, আবু মুসলিম খাওলানি, বুরাইদা ইবনে খুসাইব আসলামি এবং আমর ইবনে হাযম আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ইনতেকাল

৬৩ হিজরি

১. ওয়ালিদ ইবনে উতবার পতন এবং উসমান ইবনে মুহাম্মদকে হিজাজের আমির হিসেবে নির্ধারণ। (৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
২. বাহরা এবং কিয়ানুসের সীমান্ত পর্যন্ত হজরত উকবা ইবনে নাফের বিজয়। (৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. ইয়াজিদের আনুগত্য করতে মদিনাবাসীদের অস্বীকৃতি এবং উমাইয়া-গভর্নর উসমান ইবনে মুহাম্মদের মুক্তি। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. মক্কা থেকে বনু উমাইয়ার শাসনের অবসান এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে হজ পালন। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. আফ্রিকায় উকবা ইবনে নাফে এবং আবু মুহাজির দিনার রহ.-এর শাহাদাত। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. মদিনায় শামের সৈন্যদের আক্রমণ এবং হাররার যুদ্ধ। হজরত মা'কিল ইবনে সিনান, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের শাহাদাত। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. আফ্রিকায় বিদ্রোহ এবং কয়েকটি এলাকায় আধিপত্য বিস্তার। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. কুফার ফকিহ হজরত মাসরুক ইবনে আজদা রহ.-এর ইনতেকাল। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)

৬৪ হিজরি

১. আফ্রিকার বিদ্রোহীদের অধিকারে কাইরাওয়ান। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
২. হুসাইন ইবনে নুমাইরের মক্কায় অভিযান এবং ঘেরাও। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. কা'বায় অগ্নিসংযোগ। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার ইনতেকাল। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের ইনতেকাল। (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. মক্কায় ঘেরাও সমাপ্তি। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মৃত্যু এবং ইরাকে বিশৃঙ্খলা। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
১০. মক্কা থেকে কুফায় মুখতার সাকাফির রওনা। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
১১. মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ এবং নিজ খেলাফতের ঘোষণা। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
১২. মারজে রাহাতে উমাইয়া এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদের মাঝে লড়াই। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
১৩. হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নির্মিত কা'বার অনুকরণে পুনরায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে কা'বার নির্মাণ। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১৪. ওয়ালিদ ইবনে উতবার ইনতেকাল। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
১৫. উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইনতেকাল। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৬৫ হিজরি

১. মারজে রাহাতে বনু উমাইয়াদের বিজয় এবং শামে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
২. যাহ্হাক ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. হজরত নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. তাওয়াবিনদের কুফা থেকে শামের দিকে রওনা। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. তাওয়াবিনদের পরাজয় এবং সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. মারওয়ানের মিসরে আক্রমণের পথিমধ্যে শহরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. মিসরে মারওয়ানের আধিপত্য বিস্তার। (৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. হোজাজে শামের সৈন্যদের সাথে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর লড়াই এবং তাদের পরাজয়। (৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. মারওয়ান ইবনুল হাকামের ইনতেকাল। (৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
১০. আরবে আবু তালুত খারেজির ধর পাকড়। (৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৬৬ হিজরি

১. কুফায় মুখতারের আধিপত্য বিস্তার এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের পরাজয়। (৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২. শামে মুখতারের আক্রমণ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের হত্যা ও শামের সৈন্যদের পরাজয়। (৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. হিজাজে মুখতারের ব্যর্থ অগ্রযাত্রা। (৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. নাজদা ইবনে আমের খারেজির লুটপাট। (৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. পারস্য ও ইরাকে খারেজিদের উৎপাত। (৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)

৬৭ হিজরি

১. কুফায় মুখতারকে অবরোধ এবং হত্যা। (৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. ওয়ালিদ ইবনে উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)

৬৮ হিজরি

১. ৭১ বছর বয়সে তায়েফে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানি রা. এবং আবু শুরাইহ আল খুযায়ি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. আবু ওয়াকেদ লাইসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৬৯ হিজরি

১. নাজদা ইবনে আমের খারেজির হাতে তার বিরোধী খারেজিদের পতন। (৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)
২. বসরায় জারিফের মহামারি এবং ব্যাপক মৃত্যু। (৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহার ইনতেকাল। (৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জাবের ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খাদেম হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়ালি রহ.-এর ইনতেকাল। (৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৭০ হিজরি

১. আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব রহ.-এর ইনতেকাল। (৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)
২. ইরাকের দিকে আবদুল মালেকের যাত্রা এবং মৌসুম প্রতিকূল হওয়ার কারণে প্রত্যাবর্তন। (৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. আমর ইবনে সাঈদ আল আশদাকের হত্যা। (৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. রোমানদের সাথে আবদুল মালেকের সমঝোতা ও সন্ধি। (৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৭১ হিজরি

১. যুফার ইবনে হারেসের বিরুদ্ধে আবদুল মালেকের অভিযান ও বিজয় এবং কারকিসিয়ায় আধিপত্য বিস্তার। (৬৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

২. হজরত সাফিনা, হজরত আমর ইবনে আখতাব, এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ইনতেকাল।

৭২ হিজরি

১. হজরত আহনাফ ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

২. দাইরে যা-সালিকের যুদ্ধ এবং মুসআব ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত । (৬৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. হজরত আবিদা সুলমানি রহ.-এর ইনতেকাল। (৬৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মক্কায় সৈন্য নিয়োগ এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অবরোধ। (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. হজরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল। (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

৬. হজরত মা'বাদ ইবনে খালেদ আল-জুহানি এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েবের ইনতেকাল। (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

৭. হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের জন্ম। (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

৭৩ হিজরি

১. মক্কায় হাজ্জাজের আধিপত্য বিস্তার এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত। ১৭ জুমাদাল উলা (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

২. হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার ইনতেকাল ২৭ জুমাদাল উলা, ১৫ অক্টোবর (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. হাজ্জাজের হাতে কুরাইশদের নকশায় কাবাঘরের পুনঃনির্মাণ। (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. হজরত আউফ ইবনে মালেক এবং হজরত সাবেত ইবনে যাহ্হাক আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকাল

হিজরি প্রথম শতকে

জ্ঞান, চিন্তাধারা, আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক পরিচর্যার দায়িত্ব
আঞ্জামদানকারী

উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষীজন

উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষীজন

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ৩৫ হিজরি থেকে নিয়ে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরেছি। পূর্ণ এই সময়ের মাঝখান থেকে কিছুকাল বাদ দিলে আমরা দেখতে পাবো যে, এর নেতৃত্বে ছিলেন হজরত উসমান, হজরত আলি, হজরত হাসান, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বড় বড় সাহাবি। আমরা সেই সময় এবং তখনকার আসল অবস্থা ইতিহাসের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী বিস্তারিত বর্ণনা করে এসেছি। তবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। কারণ সেই সময়টা মূলত ছিল উম্মতের বিকশিত হওয়ার মাত্র প্রাথমিক সময়। একশো বছরও পেরোয়নি তখন। আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য সাহায্যে তারা এর মধ্যেই পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী সেইসকল মহান ব্যক্তি যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের পথপ্রদর্শন করছিলেন তেমনই উম্মতের দীনি, ঈমানি ও রুহানি দিক থেকেও তারা ছিলেন উম্মতের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক। সেইসাথে তারা উম্মতকে নিজেদের মতো অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকা ও তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাউকে ক্ষমতায় বসানোর ব্যাপারে তাদের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। এসব মনীষী ছিলেন সর্বগুণের আধার। সে-কারণেই তারা জিহাদ ও রাজনীতির ময়দানে এবং সমাজসংস্কারের কাজে নিজেদের সবধরনের দায়িত্বই আঞ্জাম দিতে পেরেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, পরবর্তীতে সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের কারণে মুসলমানদের রাজনৈতিক অঙ্গন এবং দীনি দিকনির্দেশনার কেন্দ্রগুলো পৃথক হয়ে যাবে। যুদ্ধবাজ সৈন্যদের নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, সীমান্ত এলাকাগুলো সংরক্ষণ এবং উম্মতের সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ ও দেখভাল করার জন্য যেকাউকে দিয়ে হবে না। তাই আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের এই যুগে যখন অনেক বড় বড় সাহাবি বিদ্যমান ছিলেন তখন তিনি কাউকে রাজনীতির ময়দান থেকে সরিয়ে মুসলমানদের দীনি, ঈমানি, রুহানি এবং আখলাকি তরবিয়তের জন্য

বাছাই করে নিলেন। তারা আমৃত্যু নিজেদেরকে এই কাজেই লিপ্ত রেখেছিলেন। যেন উম্মত আকিদা-বিশ্বাস এবং ইলম ও আমলে পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পারে। আর পবিত্র সেই ধারা যেন বন্ধ না হয়ে যায়, যা চালু করেছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাকে প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্যও ছিল এটাই। সুতরাং এসব মনীষী সাহাবি উম্মতের জন্য এতটাই প্রয়োজনীয় ছিলেন যতটা ফসলের জন্য প্রয়োজন হয় পানির। তারা নবীজির সংস্পর্শে থেকে অর্জিত ফয়েজ, বরকত ও কল্যাণকে তাবেয়িদের কাছে পৌঁছে দিলেন। আর তাবেয়িগণও ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত, যুহুদ ও ইবাদত এবং তাকওয়া ও তাহারাতের এমন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তারা পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে নবীজির চালু-করা সেই ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। এভাবেই এই উম্মতের গোড়ায় তালিম-তাআল্লুম, দরস-তাদরিস, দাওয়াত ও ইরশাদ, সত্যকথন এবং ঈমান তাজা করার এমন আয়োজন শুরু হলো, যা আজ পর্যন্ত আমাদের মাঝে নানানভাবে এসে পৌঁছেছে। কখনো দীনি মাদরাসার রূপে। কখনো কিতাবের আকৃতিতে। কখনো খানকা আবাদের মাধ্যমে আবার কখনো বাতিলকে দমনের রূপ ধরে, কখনো কাফেরদের প্রতিরোধে সিনা টান করে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর ময়দানে, কখনো নীরবে তাসনিফ (রচনা) ও তালিফ (সংকলন) এবং ইলমি তাহকিকাতের (জ্ঞানগবেষণা) রূপে এই কাজ চালু ছিল এবং এখনো আছে। এইসব কিছু যে-আকৃতিতেই আসুক না কেন এগুলোর সবই হলো সেইসকল মনীষীর ফয়েজ ও বরকত। যদি দীনের জন্য তারা কুরবানি পেশ না করতেন এবং নিজেদের উৎসর্গ করে না দিতেন তাহলে হয়তো এই দীন আজ আমাদের পর্যন্ত এভাবে পৌঁছতো না এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান ভিত্তিও তৈরি হতো না।

আসলে সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ জীবন এবং তারা সকল কাজেই আমাদের জন্য উত্তম ও আদর্শ শিক্ষা হয়ে আছেন। তবে তা দেখার জন্য একটি জিনিসের প্রয়োজন আর তা হলো ঈমানি বাসিরাত বা অন্তর্দৃষ্টি। আর এটা তখনই অর্জন হয় যখন আমাদের ভেতরে আল্লাহ এবং তার রাসুল ও সাহাবিদের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা থাকে। যদি আমাদের ভেতরে এই মহব্বত থাকে তাহলে তাদের প্রতিটি নড়াচড়াতেই আমরা আমাদের জন্য শিক্ষা খুঁজে পাবো। আর আল্লাহ না করুন, যদি কেউ এই

নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে এসব হাজার হাজার পৃষ্ঠা কোনো কাজেরই না।

এখন আমরা উম্মতের সেইসকল হিতাকাঙ্ক্ষী ও অনুগ্রহকারী ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করব। আলোচিত মনীষীদের অধিকাংশই ছিলেন সাহাবি। তবে একজন মর্যাদাবান তাবেয়িও আছেন, যিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে পরিপূর্ণ ফয়েজ ও বরকত হাসিল করেছিলেন এবং আমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন।[৫৭৬]

[৫৭৬] এখানে খোলাফায়ে রাশেদিনসহ অন্যান্য শাসক সাহাবির আলোচনা এজন্য আনা হয়নি যে, পূর্বে তাদের বিস্তারিত বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।

হজরত আবু হুরাইরা রা.

হজরত আবু হুরাইরা রা. এমন একজন সাহাবি ছিলেন যিনি উম্মতের কাছে সবচেয়ে বেশি হাদিস পৌঁছানোর গৌরব অর্জন করেছিলেন। তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

তিনি মূলত ইয়েমেনের দাউস গোত্রের ছিলেন। সেখানে তিনি ছাগল চড়াতেন। ইয়েমেনে যখন ইসলাম পৌঁছল তখন বিভিন্ন গোত্রের লোকজন ইসলাম শেখার জন্য দলে দলে মদিনায় আসতে থাকল। তিনিও তার গোত্রের সাথে ৮ হিজরিতে গাজওয়ায়ে খাইবারের স্থানে নবীজির খেদমতে হাজির হলেন এবং নবীজির বাণী সংরক্ষণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে মদিনাতেই থেকে গেলেন। সেসময় তার বয়স হয়েছিল ত্রিশের কিছু বেশি। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ, প্রশস্ত বক্ষ, প্রলম্বিত কাঁধ এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এরপর যখন বয়স্ক হলেন তখন দাড়িতে খেযাব লাগাতেন। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল, সাদাসিধে এবং খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আসহাবে সুফফার সাথে বসে বসে তিনি হাদিস মুখস্থ করতেন।[৫৭৭]

তিনি তার মায়ের অনেক খেদমত করতেন। মাকে তিনি ইয়েমেন থেকে মদিনায় নিজের কাছে এনে রাখলেন। তখনো তার মা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই হজরত আবু হুরাইরা মাকে দীনের দাওয়াত দিতেন এবং বোঝাতেন। কিন্তু তাতে খুব বেশি ফায়দা হতো না। বারবার অস্বীকার করে যেতেন। একদিন তো তার মা তাকে খুব শক্ত ভাষায় অনেক কথাও বলে দিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে মায়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া চাইলেন। সাথে সাথে নবীজির হাত আকাশের দিকে উঠে গেলো।

---

[৫৭৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৫৮৬-৫৮৮

হজরত আবু হুরাইরা রা. নবীজির দোয়ার প্রভাব দেখার জন্য দৌড়ে ঘরে গেলেন। দেখলেন দরজা বন্ধ। তবে ভেতর থেকে গোসলের শব্দ আসছিল। কিছুক্ষণ পর তার মা দরজা খুলে বাইরে এলেন এবং কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। আর এই কথা বললেন যে, অন্তরে হেদায়েতের আলো প্রবেশ করেছে।[৫৭৮] ইতিহাসে তিনি উম্মে আবু হুরাইরা রা. নামেই পরিচিত।[৫৭৯]

হজরত আবু হুরাইরা রা. সবসময় আসহাবে সুফফার সাথেই নবীজির খেদমতে হাজির থাকতেন। ইলম অর্জন করা তখন কোনো সহজ বিষয় ছিল না। অন্য সাহাবিদের তাও তো আয়-রোজগারের একটা না একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল কিংবা তাদের গোত্র ও প্রতিবেশীরা ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ছিন্নমূল মানুষ। কারণ এখানে মা ছাড়া তার আর কেউই ছিল না। আয়-রোজগারও তিনি করতেন না। বরং সবসময় ইলমে দীন অর্জন এবং দাওয়াতের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। মদিনাবাসীরা তার জন্য মসজিদের একটি খুঁটিতে খেজুর ঝুলিয়ে দিতেন অথবা অন্য কোনো দান-সদকা পাঠাতেন। সেগুলো আসার সাথে সাথে আসহাবে সুফফার সকল সদস্যের মাঝে সমানভাবে বণ্টন হয়ে যেতো। অনেক সময় আবার না খেয়েই থাকতে হতো। ক্ষুধার তীব্রতায় অনেকে তখন মসজিদে নববিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। এসব অবস্থা তিনি সহ্য করেছেন একমাত্র দীন অর্জনের জন্য। তিনি নিজেই বলেছেন, "মাঝে মাঝে আমার এমন অবস্থা হতো যে, ক্ষুধার কারণে মসজিদে নববিতে নবীজির হুজরা এবং মিম্বরের মাঝখানটায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতাম।"[৫৮০]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারণে তার মাও অনেক দরিদ্রতার সাথে জীবনযাপন করেছিলেন। একবার হজরত আবু হুরাইরা রা. প্রচণ্ড ক্ষুধায় অস্থির হয়ে ছুটে গেলেন আসহাবে সুফফার কাছে কিছু আছে কি না খুঁজতে। কিন্তু গিয়ে দেখলেন তারাও অনাহারে ভুগছে।

---

[৫৭৮] সহিহ মুসলিম : ৬৬৫১

[৫৭৯] আল-ইসাবাহ : ৮/৩২৭

[৫৮০] সুনানুত তিরমিজি : ২৩৬৭ হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৭৮

তখন তিনি নবীজির কাছে গেলেন এবং এই অবস্থার কথা অবগত করলেন। তখন নবীজি খেজুরভর্তি একটি থালা নিয়ে মসজিদে এসে সকলের মাঝে ভাগ করে দিয়ে বললেন, "এগুলো খেয়ে পেট ভরে পানি পান করে নাও। আজকের দিন কেটে যাবে।" হজরত আবু হুরাইরা রা. একটি খেজুর খেলেন এবং আরেকটি রেখে দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এটি আমার মায়ের জন্য রেখে দিয়েছি।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুব নম্রতার সাথে বললেন, "তুমি এটিও খেয়ে নাও। আর বাড়তি দুটি খেজুর তোমার আম্মার জন্য আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।"[৫৮১] তখন প্রায় সময়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুজেযা প্রকাশ পেতো। একবার ক্ষুধার তাড়নায় হজরত আবু হুরাইরা রা. গেলেন নবীজির কাছে। নবীজির ঘরে তখন মাত্র এক পেয়ালা হাদিয়ার দুধ ছিল। নবীজি তাকে বললেন, "আসহাবে সুফফার সকলকে ডেকে নিয়ে আসো।" হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, "আমি তখন মনে মনে ভাবছিলাম যে, তাদের সকলকে এক পেয়ালা দুধ দেওয়ার পর আমার জন্য আর কীই-বা বাকি থাকবে!" যাক, তিনি নবীজির আদেশমতো আসহাবে সুফফার সকলকে ডেকে আনলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সকলকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব তাকেই দিলেন। তিনি সকলকে পান করালেন। উপস্থিত সকলেই একেবারে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কি কুদরত! পাত্রে যতটুকু দুধ ছিল ততটুকুই রয়ে গেলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একটু মজাক করে বললেন, "আবু হুরাইরা, এখন তো শুধু তুমি আর আমিই বাকি।" এই বলে তিনি পাত্রটি হজরত আবু হুরাইরা রা.-এর হাতে দিয়ে পান করতে বললেন। তিনি পাত্রটি হাতে নিয়ে পান করতে থাকলেন আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকলেন, "আবার পান করো। আবার পান করো।" একপর্যায়ে হজরত আবু হুরাইরা রা. বললেন, "এর চেয়ে বেশি পান করা আমার

---

[৫৮১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/৩২৮

পক্ষে সম্ভব নয়।” এরপর সেই দুধের পেয়ালা নবীজি নিয়ে পান করলেন এবং শেষ করে দিলেন।[৫৮২]

অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, হজরত আবু হুরাইরা রা. রোজগারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বরং তিনি এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হজরত উকবা ইবনে গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বোন হজরত বাসরা বিনতে গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে পানি এনে দিতেন। বিনিময়ে তাকে দু- বেলা রুটি দেওয়া হতো। এরপর একপর্যায়ে তিনি যখন একটু সচ্ছল হলেন তখন বাসরা বিনতে গাজওয়ান রা. কে বিয়ে করে নিলেন।[৫৮৩]

বিড়ালের সাথে হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুব সখ্য ছিল। ইয়েমেনে তিনি যখন ছাগল চড়াতেন তখন একটি বিড়ালের বাচ্চা খুব আদর করে লালন-পালন করেছিলেন। তিনি সেই বিড়ালের সাথে খেলতেন। কিন্তু তার এই আগ্রহ মদিনাতে আসার পরও রয়ে গিয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সে-কারণেই “আবা হিররা” (বিড়ালের বাবা) বলে ডাকতেন। ভালোবাসা-মাখা এই ডাক পরবর্তীতে এমনই প্রচার হয়েছিল যে, তার আসল নামই বিস্মৃত হয়ে গেলো এবং আবু হুরাইরা তার উপনাম হিসেবে লোকমুখে প্রচার হলো। এই নামটা তারও অনেক বেশি পছন্দ হয়েছিল। ফলে তিনি খুব খুশির সাথেই মানুষকে বলতেন যে, আমার এই নাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখেছেন। শতবছর পরের আলেমগণ যখন তার আসল নাম জানতে চাইলেন এবং খোঁজ নিলেন তখন দেখলেন যে, প্রত্যেকের কথা ও মত আলাদা। যাদেরকেই জিজ্ঞাসা করলেন, সবাই পৃথক পৃথক নাম বলল। এমনকি একপর্যায়ে তার নামের সংখ্যা ৩০ ছাড়ালো। এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কথা হলো, জাহেলিয়াতের যুগে তার নাম ছিল আবদে শামস। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয়েছিল আবদুল্লাহ।[৫৮৪]

---

[৫৮২] সহিহ বুখারি : ৬৪৫২; সুনানুত তিরমিজি : ২৪৭৭

[৫৮৩] তারিখে দিমাশক : ৬৭/৩৬৫

[৫৮৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৫৮৬-৫৮৮

তার এমন মুখস্থশক্তিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই একটি মুজেযা ছিল। কারণ নবীজি একবার তাকে বলেছিলেন, "তুমি তোমার চাদর বিছাও।" তিনি নবীজির আদেশ মেনে চাদর বিছালেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেশ কিছু হাদিস শোনালেন এবং বললেন, "এখন এটিকে তোমার বুকে জড়িয়ে ধরো।" তিনি তা-ই করলেন। এরপর থেকেই মূলত তিনি নবীজির আর কোনো হাদিস ভুলতেন না।[৫৮৫]

আল্লাহ তায়ালা তার হাদিসের দরসে অনেক বরকত দান করলেন। কারণ তার থেকে হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি ও তাবেয়ির সংখ্যা আটশোর অধিক। মদিনার গভর্নর মারওয়ান তাকে খুবই সম্মান করতেন। মসজিদে নববিতে মারওয়ানের কাতেব হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের দরসে বসে রেওয়ায়েত লিখতেন। হজরত আবু হুরাইরা রা. যদি কখনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বিতীয়বার বলতেন তাহলে তাতে একটা শব্দেরও এদিক-ওদিক হতো না।[৫৮৬] আর কেউ যখন তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা এতো অধিক পরিমাণ দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতো তখন বলতেন, "আমাদের মুহাজির ভাইগণ ব্যবসা করতেন। আর আনসার ভাইগণ করতেন চাষাবাদ। অথচ আমি তখনো পড়ে ছিলাম সুফ্ফার দরিদ্র সাথিদের সাথে। পেটে সয় এমন সামান্য খাবার খেয়ে নবীজির খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। আমি তখনো উপস্থিত থাকতাম যখন অন্যরা অনুপস্থিত থাকতো এবং সেইসব কথা শুনতাম, যা অন্যরা শুনতে পেতো না।

তিনি ইলমি ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রচুর জিকির করতেন। দৈনিক ১২০ তাসবিহ আদায় করতেন। একটি পাত্রে তিনি খেজুরের বিচি জমিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলো দিয়ে তিনি তাসবিহ পড়তেন।[৫৮৭]

রাজত্ব ও ক্ষমতার ব্যাপারে তার ভেতর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। কিন্তু এরপরও হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় কিছুদিনের জন্য

---

[৫৮৫] সহিহ মুসলিম : ২৫৫৫; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৮১

[৫৮৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৫৯৮

[৫৮৭] সহিহ মুসলিম : ৬৫৫২, ৬৫৫৫

বাহরাইনের হাকিম ছিলেন। হজরত আলি রা. এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় তিনি নিরপেক্ষ অবস্থানে ছিলেন। মদিনায় তার অবস্থিত ঘরটি তিনি তার আজাদকৃত গোলামকে দান করে দিয়েছিলেন। আর তিনি শহর থেকে দূরে যুলহুলাইফার এক গ্রামে বসবাস করতে থাকলেন। ৫৯ হিজরিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা যখন খুব তীব্র হয়ে গেলো তখন তার চোখে পানি দেখে এক ব্যক্তি তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের এই দুনিয়ায় থাকার জন্য নয়; বরং আমি কাঁদছি আমার সফরের দীর্ঘতা দেখে; অথচ পাথেয় সে অনুপাতে খুব অল্প দেখে। তুমি একটি পাহাড়ের চূড়ায় আছো। আর নীচে এক পাশে আছে জান্নাত আরেক পাশে জাহান্নাম। জানা নেই তুমি জান্নাতে পড়বে নাকি জাহান্নামে।" এর কিছুদিন পরেই তিনি ৭৮ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। মদিনার হাকিম ওয়ালিদ ইবনে উতবা তার জানাজা পড়ান। এরপর তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।[৫৮৮]

---

[৫৮৮] সুনানে আবু দাউদ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. খাইরুল কুরুনের সেই প্রবীণ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের অবদান ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ছড়িয়ে আছে। তাকে হিবরুল উম্মাহ বলেও ডাকা হতো।

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। হিজরতের পূর্বে আবু তালেবের ঘাঁটিতে বনু হাশেমকে অবরুদ্ধ করার দিন তার জন্ম হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার মুখে পবিত্র লালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার মা ছিলেন উম্মে ফজল লুবাবা বিনতে হারেস রা.। উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা. এবং হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা, এই তিনজনই পরস্পরে বোন ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করলেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। তার পরিবার তখনো হিজরত করেননি। এমনকি তার পিতা হজরত আব্বাস রা. তখন পর্যন্ত নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও প্রকাশ করেননি।[৫৮৯]

৭ হিজরির যিলকদ মাসে উমরাতুল কাযার স্থানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে 'সারফ' নামক স্থানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর খালা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে হয়। এই বিবাহের সকল আয়োজন হজরত আব্বাস রা. এবং তার স্ত্রীই

---

[৫৮৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৬২; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৬১০-৬২৬

আঞ্জাম দিচ্ছিলেন।[৫৯০] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স তখন মাত্র দশ বছর।

এরপর ৮ হিজরির শেষদিকে যখন মক্কাবিজয় হলো তখন তার বাবা হজরত আব্বাস রা. সপরিবারে মদিনায় হিজরত করলেন। তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বয়স এগারো বছর হয়েছিল। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আড়াই বছর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তিনি সবসময় নবীজির খুব কাছাকাছি থাকতে পারতেন।[৫৯১]

কিন্তু এই অল্প সময়েই তার ইলমের প্রতি আগ্রহ ও মেধার তীক্ষ্মতা প্রায় সবার সামনেই এসে গিয়েছিল। কখনো তো তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের আমল দেখার জন্য নিজ খালা হজরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে থাকতেন। এসময় তিনি যথাসম্ভব নবীজির প্রায় সকল খেদমত আঞ্জাম দিতেন এবং দোয়া নিতেন। একবার তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেই ছিলেন। তখন তিনি নবীজির অজুর জন্য এক পাত্র পানি পূর্ব থেকেই রেখে দিলেন। এরপর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন তখন বললেন, "এখানে এই পানি কে ভরে রেখেছে?" হজরত মাইমুনা রা. বললেন, "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস"। এই কথা শুনে নবীজি তার জন্য দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, তুমি তাকে ফিকহে দীন এবং ইলমে তাফসির দান করুন।"[৫৯২]

একবার নবীজির রাতে তাহাজ্জুদের আমল দেখার জন্য খালার ঘরে ছিলেন। এরপর নবীজি যখন তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠলেন তখন তিনিও সাথে সাথে উঠে গেলেন। নবীজি যখন নফলের নিয়ত করলেন তখন তিনিও পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধরে টেনে আনলেন এবং নিজের বরাবর দাঁড় করিয়ে

---

[৫৯০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৩১, ৩৩২

[৫৯১] সুনানুন নাসায়ি : ৩২৭৩ সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২৩৫

[৫৯২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৩২

দিলেন। কিন্তু নবীজি যখন নামাজের নিয়ত বাঁধলেন তখন আবার সে পেছনে চলে গেলো। এরপর নবীজি নামাজ শেষ করে বললেন, "আচ্ছা! তুমি এমন করলে কেন?"

উত্তরে তিনি বললেন, "কারো জন্য এটা কখনোই উচিত নয় যে, নামাজে আপনার বরাবর দাঁড়াবে! কারণ আপনি আল্লাহর রাসুল।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন এবং দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, তুমি তার ইলম এবং বুদ্ধিমত্তা আরো বাড়িয়ে দাও।"[৫৯৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের সময় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। সেজন্য তিনি নবীজি থেকে পরিপূর্ণভাবে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ পাননি। কিন্তু উলুমে নবুওয়াত অর্জনের জন্য তখন তার ভেতরে আগ্রহ জেগে উঠেছিল পূর্ণমাত্রায়। তাই তিনি এক একজন সাহাবির কাছে গেলেন এবং হাদিস মুখস্থ করতে থাকলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতেকাল করলেন তখন আমি আমার এক আনসারি সাথিকে বললাম, "আসো, আমরা সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিস শিখতে যাই। কারণ, এখনো তাদের প্রায় সবাই জীবিত আছেন।"

সাথি উত্তর দিলো, "কী আশ্চর্য! তুমি কি এটা ভাবছো যে, ভবিষ্যতে তোমার প্রয়োজন পড়বে? আর মানুষ তোমার কাছে কি হাদিস ও মাসআলা জানার জন্য আসবে?"

সেই সাথি এই কাজকে তেমন গুরুত্ব দিলো না। কিন্তু আমি খুব গুরুত্ব ও আগ্রহের সাথে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে মাসআলা ও হাদিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ করতে থাকলাম। আমি যখন জানতে পারতাম যে, কারো কাছে হাদিস আছে তখন তার কাছে ছুটে যেতাম। যদি কখনো দেখতাম তিনি ঘুমাচ্ছেন তাহলে তার দরজার কাছে মাথার নিচে চাদর রেখেই ঘুমিয়ে পড়তাম এবং তার অপেক্ষা করতাম। এরপর যখন তিনি বের হতেন তখন বলতেন, "হে রাসুলের চাচাতো ভাই, আপনি

---

[৫৯৩] ফাযাইলুস সাহাবা লি আহমাদ ইবনে হাম্বাল : ১৮৫৮ সহিহ বুখারি : ১৪৩

কোন প্রয়োজনে এখানে এসেছেন? আর আমাকেই-বা কেন আপনি ডেকে পাঠালেন না? তখন আমি উত্তরে বলতাম, "এখানে উপস্থিত হওয়া আমার দায়িত্ব ছিল। তাই উপস্থিত হয়েছি। আর এভাবেই আমি হাদিস সংগ্রহ করেছি। তারপর সেই সময় এলো যখন আমার আনসারি সাথি দেখল যে, লোকজন হাদিস ও মাসআলা জানার জন্য আমার আশপাশে এসে জড়ো হচ্ছে। তখন সে বলল, "এই যুবক আসলেই খুব বুদ্ধিমান।"[৫৯৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যার কাছ থেকে একটি হাদিসও সংগ্রহ করতেন তাকে তিনি নিজের উসতাদের মতোই সম্মান করতেন। একবার তিনি হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহনের লাগাম ধরলে তিনি বললেন, "হে নবীজির চাচাতো ভাই, এমন করো না।" উত্তরে হজরত আব্বাস রা. বললেন, "আলেমদের এমন সম্মানপ্রদর্শনেরই আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।" হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. একথা শুনে তার হাতে চুমু দিলেন এবং বললেন, "আহলে বাইতের সাথে এমন সম্মানপ্রদর্শনেরই নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে।"[৫৯৫]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন টগবগে যুবক। কিন্তু এরপরও হজরত উমর রা. তাকে বড় বড় সাহাবির সাথে বিশেষ মজলিসগুলোতে রাখতেন। খুব কঠিন কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। তার সম্মানিত পিতা হজরত আব্বাস রা. এটা দেখে একবার বললেন, "আমি দেখছি যে, আমিরুল মুমিনিন তোমাকে বিশেষ বিশেষ মজলিসে ডাকেন এবং তোমার থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। সেইসাথে বড় বড় সাহাবির মতের উপর তোমারকে প্রাধান্য দেন। এখন শোনো, আমি তোমাকে এক্ষেত্রে চারটি উপদেশ দিচ্ছি।

এক. তুমি কখনোই তাদের গোপন বিষয় ফাঁস করবে না।
দুই. কখনো তাদের সাথে কোনো বিষয়ে মিথ্যা বলবে না।
তিন. তাদের সামনে কারো গিবত করবে না।

---

[৫৯৪] মুসনাদে আহমাদ : ৩০৬০
[৫৯৫] আল-ইসাবাহ : ৪/১২৫

চার. সর্বোপরি তাদের জন্য কল্যাণকর কোনো কথা তাদের থেকে লুকাবে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তার বাবার এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে থাকলেন এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের বিশেষ মজলিসের পরামর্শদাতা হিসেবে অব্যাহত রইলেন।[৫৯৬]

একবার এক লোক হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করলেন যে, "আপনি ইবনে আব্বাসকে মজলিসে রাখেন; অথচ আমাদের ছেলেদের রাখেন না?"

হজরত উমর রা. তখন তার উত্তরে বললেন, "ইবনে আব্বাস যদিও যুবক; কিন্তু চিন্তা অনেক পোক্ত এবং সে খুবই মেধাবী। সেইসাথে দূরদৃষ্টিসম্পন্নও।[৫৯৭]

বড় বড় সাহাবিও তার যোগ্যতার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, "যদি সে আমাদের সমবয়সি হতো তাহলে কেউ তার বরাবর হতে পারতো না।" তিনি একথাও বলতেন যে, "কুরআনের সবচেয়ে বড় এবং সবথেকে ভালো মুফাসসির হলেন হজরত ইবনে আব্বাস রা.।" হজরত আলি রা. বলতেন, "সে ইলমের সাগর থেকে মুক্তা সংগ্রহ ও বের করতে জানতো।" হজরত আয়েশা রা. বলতেন, "হজের মাসআলা সম্পর্কে সবচেয়ে গভীর ও ভালো জ্ঞান রাখেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।" হজরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. বলতেন, "আমি ইবনে আব্বাসের মতো এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে দেখিনি।" হজরত মুজাহিদ রহ. বলেছেন, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন ইলমের সাগর।" হজরত মাসরুক রহ. বলেছেন, "যখন তার চেহারা দেখলাম তখন বলে উঠেছিলাম, উনি সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। আমি যখন তাকে কথা বলতে শুনতাম তখন মনে হতো উনিই সবচেয়ে ভালো বাগ্মী। যখন হাদিস বলতে শুনতাম তখন লাফিয়ে বলে উঠতাম, উনিই সবচেয়ে বড় আলেম।" হজরত আ'মাশ রহ. যখন তাকে সুরা নুর তাফসির করতে

---

[৫৯৬] আল-ইসাবাহ : ৪/১২৭

[৫৯৭] উয়ুনুল আখবার : ১/৭৩

শুনলেন তখন বললেন, “যদি রোম ও পারস্যের অধিবাসীরা এই বয়ান শুনতো তাহলে নিশ্চিত ইসলাম গ্রহণ করে ফেলতো।”[৫৯৮]

তিনি হজরত উসমান রা.-এরও নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা ছিলেন। খেলাফত চলাকালে তিনি আফ্রিকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে বাদশাহ জুরজিরের সাথে কথা বলার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল। তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান এবং বাগ্মিতা দেখে জুরজির বলেছিল, “আপনি আরবের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব।”[৫৯৯]

৩৫ হিজরিতে হজরত উসমান রা. যখন শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে গেলেন তখন তিনিই হজের আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৬০০]

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি তার ডান হাত ছিলেন এবং বসরার গভর্নর হয়েছিলেন। তখন তার বয়স বড়জোর ৪০ হয়েছিল। বসরার আলেমগণ বলতেন, “হাদিস, ফিকাহ, তাফসির, কবিতা, সিরাত, ইলমে মিরাস, ইতিহাস-সহ সব বিষয়েই আমরা তাকে অদ্বিতীয় ও অনন্য হিসেবে পেয়েছি।”[৬০১]

বসরায় তিনি হাদিসের দরস দিতেন। বিশেষত রমজানে তার থেকে ইলমে ফিকাহ অর্জনের জন্য অনেক দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর জ্ঞানপিপাসু আসতো। এই অল্প সময়েই তিনি তাদের একেকজনকে ফকিহ বানিয়ে দিতেন।[৬০২]

তার দরসদানের পদ্ধতিও ছিল অসাধারণ। হজরত সাঈদ ইবনে জাবির রহ. বলেন, “আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাদিস সংগ্রহ করতাম। তার হাদিস পড়ানোর পদ্ধতি এতই সুন্দর ও অসাধারণ ছিল যে, যদি তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমি তার কপালে চুম্বন করতাম।”[৬০৩]

---

[৫৯৮] আল-ইসাবাহ : ৪/১২৮

[৫৯৯] আল-ইসাবাহ : ৪/১৩১

[৬০০] তারিখুত তাবারি : ৩৫ হিজরির আলোচনাধীন।

[৬০১] উসদুল গাবাহ : ৩/২৯১

[৬০২] আল-ইসাবাহ : ৪/১২৯

[৬০৩] আল-ইসাবাহ : ৪/১২৯

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তিনি মদিনায় চলে গেলেন এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে পুরোমাত্রায় ইলমি খেদমত করতে থাকলেন। এখানে তার দরস এতই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল যে, সর্বদিক থেকে ইলমপিপাসুরা ছুটে আসছিল এবং তার থেকে ইলম অর্জন করছিল। তার এক ছাত্র বলেন, "তিনি কিছু বিষয়ে সকলের চেয়ে ঊর্ধ্বে ছিলেন। তার পূর্বে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছিল তিনি সেই সবই জানতেন। ইলমে ফিকহেও তার জ্ঞান ছিল অসামান্য। ইলমে আনসাব (কুলবিদ্যা) এবং তাফসিরে তিনি ছিলেন সবার উপরে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি হজরত আবু বকর, হজরত উমর ও হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও কোনো অংশে কম ছিলেন না। তিনি যেদিন ফিকহ নিয়ে কথা বলতেন সেদিন অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন না। আবার যেদিন তাফসির নিয়ে কথা বলতেন সেদিন অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতেন না। এভাবে যেদিন কবিতা নিয়ে কথা বলতেন সেদিন এটাই থাকতো আলোচনার মূলবিষয়। আবার যেদিন তিনি আরবের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতেন, সেদিন শুধু ইতিহাসই বলে যেতেন।[৬০৪]

জীবনের শেষদিকে তিনি কিছু রাজনৈতিক কারণে মদিনা ছেড়ে তায়েফে চলে যান এবং সেখানেই তিনি ৬৮ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। সেসময় তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তার জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রহ.।[৬০৫] আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবদান বা সতর্কতা নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা গিয়েছে। তাই এখানে সেগুলোর বিবরণ দেওয়ার তেমন প্রয়োজন নেই।

---

[৬০৪] উসদুল গাবাহ : ৩/২৯১

[৬০৫] আল-ইসাবাহ : ৪/১২৫-১৩৩

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সেইসকল সম্মানিত সাহাবির একজন, যাদের জীবন, কথা ও কাজ শরিয়তের দলিল হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, তার প্রমাণ হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে এবং উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই ছিলেন।[৬০৬]

নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হজরত উমর রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল ৫ বছর। আর যখন হজরত উমর রা. মদিনায় হিজরত করে চলে গেলেন তখন তার বয়স ছিল ১২। তখন তাদের পরিবারে ছিল সম্পূর্ণ দীনী পরিবেশ; তাই তিনিও সেভাবেই বেড়ে উঠতে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই তার বুদ্ধিমত্তা ও মুখস্থশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে বললেন, "আচ্ছা, সেই গাছটা কী, যা মুমিনের মতো। সবসময়ই তাজা থাকে এবং ফল দেয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে হজরত আবু বকর, হজরত উমর-সহ সকলকে চুপ থাকতে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সেটি হলো খেজুর গাছ।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. প্রথমেই বুঝে গিয়েছিলেন এবং এই উত্তরটাই দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন সাহস করেননি। এরপর যখন ঘরে এলেন তখন তিনি তার পিতা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মনের সেই কথা জানালেন। হজরত উমর রা. তখন বললেন, "যদি তুমি তখনই উত্তরটা দিয়ে দিতে তাহলে আমার জন্য তা অনেক খুশির কারণ হতো।"[৬০৭]

---

[৬০৬] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৪২

[৬০৭] সহিহ বুখারি : ১৩১

ইলমের প্রতি আগ্রহী হওয়ার পাশাপাশি জিহাদের ময়দানেও কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। গাজওয়ায়ে বদর এবং গাজওয়ায়ে উহুদে শরিক হওয়ার জন্য নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু বদরযুদ্ধের সময় তার বয়স ১৩ এবং উহুদের সময় ১৪ হওয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যুদ্ধে শরিক হওয়ার অনুমতি দেননি। এরপর গাজওয়ায়ে খন্দকে যখন তার বয়স ১৫ হলো তখন নবীজি তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন।[৬০৮] তারপর থেকে তিনি সবক'টা যুদ্ধেই শরিক হয়েছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিতেও শামিল ছিলেন।[৬০৯] ১৮ বছর বয়সে তিনি মুতার ভয়ানক যুদ্ধেও শরিক ছিলেন।[৬১০] আর মক্কাবিজয়ের সময় তিনি ছিলেন ২০ বছরের পূর্ণ যুবক। তখন তিনি ছিলেন প্রথম কাতারে। এ সময় তিনি নবীজির সাথে কাবাঘরে প্রবেশের গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৬১১] এরপরও তিনি বিভিন্ন গাজওয়া এবং সারিয়াতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।[৬১২] যুবাবয়সে ঘোড়দৌড়ের প্রতি তার খুব আগ্রহ ছিল। মদিনায় ঘোড়দৌড়ের যে প্রতিযোগিতা হতো সেগুলোতেও তিনি শরিক থাকতেন।[৬১৩]

চেহারা ও আকৃতিতে তিনি তার বাবার মতোই ছিলেন। উঁচু-লম্বা গড়ন। তিনি ছিলেন গোধুম বর্ণের। তার দাড়ি ছিল এক মুষ্ঠি পরিমাণ। চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত। অধিকাংশ সময়ই তিনি সাদা পোশাক পরতেন। কুর্তা, সালোয়ার এবং সাদা পাগড়ি ছিল তার সবসময়কার পরিধেয়।[৬১৪]

ইবাদত ও আমল-আখলাকের দিকে থেকেও তিনি ছিলেন এক অনন্য উচ্চতায় সমাসীন। যৌবন থেকেই তার এগুলো অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। হিজরত করে যখন মদিনায় এলেন তখন অধিকাংশ সময়ই মসজিদে থাকতেন এবং মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়তেন। একবার তিনি

---

[৬০৮] সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪৭২৭
[৬০৯] সহিহ বুখারি : ৪১৮৬
[৬১০] সহিহ বুখারি : ৪২৬১
[৬১১] সহিহ বুখারি : ৪২৮৯
[৬১২] আল ইসতিয়াব : ৩/৯৫১
[৬১৩] সহিহ বুখারি : ৪২০
[৬১৪] উসদুল গাবাহ : ৩/৩৩৬

খুব ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন তিনি তার বোন হজরত হাফসা রা. কে জানালেন। হজরত হাফসা রা. নবীজির কাছে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে নবীজি বললেন, "আবদুল্লাহ্ অনেক ভালো মানুষ। তবে সে যদি রাতে নফল নামাজ পড়ে তাহলে আরো ভালো হবে।" এরপর থেকেই তিনি নফল এবং তাহাজ্জুদকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিলেন।[৬১৫] নিজ পিতার খেলাফত চলাকালে তার মূলত যুদ্ধ-জীবন কেটেছে। ইয়ারমুক এবং মিসরের যুদ্ধেও তিনি শরিক ছিলেন।[৬১৬]

অন্যান্য সব কিছুর মতোই তার অন্তর্দৃষ্টিও ছিল প্রখর। হজরত উমর রা. যখন হামলাকারীদের আক্রমণে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখনো তিনি কাউকে খলিফা বানানোর ঘোষণা দেননি। তাই সকলের মধ্যে কানাঘুঁষা শুরু হয়ে গেলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নিজের বাবাকে খুব ভয় করতেন। তাই বাবার সামনে নীরব থাকাই বেশি পছন্দ করতেন; কিন্তু অবস্থা বেসামাল দেখে তিনি হিম্মত করে সামনে গেলেন এবং বললেন, "যদি আপনার উট এবং ছাগলগুলো রাখাল একলা একটা জায়গায় ফেলে রেখে চলে আসে তাহলে আপনি এটাই বুঝবেন যে, সে ওগুলো নিশ্চিত ধ্বংস করে দিয়েছে। তাহলে মানুষের দেখভাল করার মতো কাউকে রেখে যাওয়াটা তো আরো বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।" হজরত উমর রা. ছেলের এই কথা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন[৬১৭] এবং পরবর্তী খলিফা নির্বাচন ও নির্ধারণের জন্য শুরা গঠন করলেন।[৬১৮] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. খলিফার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও এসব ব্যাপার এড়িয়ে চলছিলেন এবং দূরত্ব বজায় রাখছিলেন। হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তাকে কাজি বানানোর জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং দায়িত্ব নেওয়া থেকে মুক্ত থেকেছেন। তবে

---

[৬১৫] সহিহ মুসলিম : ৪৮১৮
[৬১৬] সহিহ বুখারি : ৩৭০০
[৬১৭] ফুতুহুল বুলদান : ২২৪; তারিখুত তাবারি : ৪/২৬৯
[৬১৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৬৬

তখনো তিনি ২৭ হিজরিতে একজন সাধারণ ও স্বাভাবিক যোদ্ধার মতোই আফ্রিকা এবং ৩০ হিজরিতে খোরাসান ও তাবারিস্তানে যুদ্ধ করে চলছিলেন।[৬১৯] হজরত উসমান রা. কে রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, যাতে তিনি কোনোভাবেই খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে না দেন।[৬২০]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নিজের পিতার প্রতিষ্ঠিত শুরার সদস্যদের একজন ছিলেন। তিনি তার বংশীয় মর্যাদা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আত্মীয়তা এবং জ্ঞানে-গুণে ছিলেন এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। তার উপর তিনি ছিলেন একজন খলিফার ছেলে। সেইদিক থেকে তিনি ছিলেন মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপযুক্ত ও যোগ্য। চাইলেই করতে পারতেন অনেক কিছু। তার সমর্থনেও থাকতো অসংখ্য জনবল। কিন্তু তিনি নিজে কখনোই এসব নিয়ে ভাবেননি। এমনকি বিন্দুমাত্র চিন্তাও করেননি। অনেকেই চাইতো, তিনি যেন এমন পরিস্থিতিতে রাজনীতির লাগামটা নিজের হাতে তুলে নেন। সেইসাথে অনেকে এসে তার কাছে এমন আবেদনও করতো। কিন্তু তিনি রাজি হননি। বরং নিজের পবিত্রতা রক্ষা করাই তার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই তিনি তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিতেন এবং এসব থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেন।

হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর অনেকেই তাকে আমির হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলল, "আপনি হলেন আমির ইবনে আমির। সুতরাং আপনি আমাদের বাইয়াত করে নিন।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, "আমি আমার কারণে একটি মশা পরিমাণ রক্তও প্রবাহিত হতে দেবো না।"[৬২১]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে এক ব্যক্তি তাকে বলল, "এখন তো প্রায় সকলেই চলে গেছেন। তা ছাড়া আপনি

---

[৬১৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৫১
[৬২০] সুরা বাকারা, আয়াত ১৯৩
[৬২১] সহিহ বুখারি : ৪৫১৩

হলেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুযোগ্য সন্তান। তাহলে আপনি কেন রাজনীতির ময়দানে আসছেন না?"

উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহ তায়ালা এক মুসলিম ভাইয়ের রক্ত আরেক মুসলিমের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এজন্যই আমি রাজনীতিতে আসছি না।" অন্য এক ব্যক্তি বলল, "আল্লাহ্ তায়ালা তো কুরআনে বলেই দিয়েছেন যে, "তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না ফেতনা দূর হয় এবং দীন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই হয়ে যায়।""[৬২২]

এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এটা তো তখনকার বিধান যখন কাফেররা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতো। এটাই সেই ফেতনা যা ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা জিহাদের বিধান দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আমরা সেজন্যই ততক্ষণ লড়াই করেছি যতক্ষণ না ফেতনা দূর হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার দীনই অবশিষ্ট রয়েছে। আর তোমরা যে লড়াই করতে চাচ্ছো, তাতে আরো ফেতনা তৈরি হবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার দীনও খতম হয়ে যাবে।"[৬২৩]

তিনি তাফসির, হাদিস এবং ফিকহের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২৬৩০। তিনি কুরআন মাজিদ অনেক গভীর চিন্তা-ফিকিরের সাথে শিখেছিলেন। শুধু সুরা বাকারার ইলম অর্জনের জন্য তিনি ১৪ বছর ব্যয় করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর তিনি সম্ভবত ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তার মূল ব্যস্ততা ছিল হাদিস ও ফিকহ নিয়ে। এজন্যই তিনি কখনোই কোনো দায়িত্ব নেননি, যাতে এই পবিত্র খেদমতে ঘাটতি দেখা না দেয়। তিনি প্রতিবছরই হজ ও উমরা আদায় করতেন। হজের সময় সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা আসতেন। অনেক সম্মানিত তাবেয়িও আসতেন এবং তার থেকে ফায়দা গ্রহণ করতেন।[৬২৪]

---

[৬২২] উসদুল গাবাহ : ৩/৩৩৬
[৬২৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/২১১-২১৩
[৬২৪] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৭৬

মদিনায় তার দরস আলাদা এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। সবসময় তার দরসে ইলমপিপাসুরা লেগেই থাকতো। শুধু বর্ণনাতেই নয়, সুন্নাতে নববি একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠত তার দরসে। সাহাবি ও তাবেয়িগণ বলতেন তার কোনো কাজ সুন্নাতে নববির বাইরে গিয়ে হতো না।

হজরত আয়েশা রা. বলতেন, "নবীযুগের আদর্শ ও সুন্নাত তার মতো এতটা কেউ ধরে রাখতে পারেনি।"[৬২৫]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ শাগরেদ হজরত নাফে রহ. তার থেকে টানা ৩০ বছর ফায়দা গ্রহণ করেছেন। তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, "যদি তোমরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে সুনান এবং আসারের অন্বেষণ ও সুন্নাতের পাবন্দিতে নিমগ্ন দেখতে তাহলে তোমরা তাকে পাগল মনে করতে।"[৬২৬]

তখনকার নেককার লোকেরা এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আমরা যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তুমি ইবনে উমর রা. কেও জীবিত রেখো। কারণ তার মতো সুন্নাতের এতো অধিক পাবন্দ ও জ্ঞানী দ্বিতীয় কেউ নেই।"[৬২৭] হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি নবীজির বলা শব্দগুলোই হুবহু শোনানোকে খুব জরুরি মনে করতেন। কেউ একজন হাদিস শুনালো, "মুনাফিক হলো সেই বকরির মতো, যে দুই ভেড়ার মাঝখানে আছে।" এটা শুনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "এখানে রবিদাতাইন এবং গনামাইন'-এর উদ্দেশ্য তো একই।"[৬২৮] এসব কারণেই মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণনাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্ভবত ১৫ বছর নবীজির খেদমতে ছিলেন। হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণ খেলাফতকাল তার সামনেই অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তার পিতা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংশ্রব কমপক্ষে ৩০ বছর পেয়েছেন। এরপর তিনি ১২ বছর হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন।

---

[৬২৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৪৪

[৬২৬] মুসনাদে আহমাদ : ৪৮৭২

[৬২৭] আল-ইসাবাহ : ৪/১৫৯

[৬২৮] আল মাবসুত লিসসারাখসি : ৪/৬

তিনি হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকেও জ্ঞান অর্জন করেছেন। এরপর যখন তিনি ইলমের চর্চায় লেগে গেলেন তখন হজরত নাফে রহ. তার থেকে ৩০ বছর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তারপর ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. ১২ বছর হজরত নাফে রহ.-এর সংস্পর্শে থেকেছেন এবং তার থেকে ইলম অর্জন করেছেন। ইবনে উমর, হজরত নাফে এবং ইমাম মালেক; এই তিনজনই আমরণ মদিনাতেই থেকেছিলেন। এজন্যই মুহাদ্দিসগণ এই তিনজনের সনদকে 'সিলসিলাতুয যাহাব' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সকল আলেমই এব্যাপারে একমত যে, হাদিসের কিতাবাদির সব থেকে উচ্চমানের সনদ হলো, "মালেক আন নাফে, আন ইবনে উমর রা.।" সহিহ বুখারির পরেই মতন এবং সনদের দিক থেকে যেই কিতাবের অবস্থান তা হলো মুওয়াত্তা ইমাম মালেক রহ.। সেখানকার অধিকাংশ বর্ণনাই ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের সাথে সাথে ফিকহের ক্ষেত্রে তার অবদান অবিস্মরণীয়। ফিকহে মালেকির মূলভিত্তিই হলো হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতোয়ার উপর। সে-কারণেই ইমাম মালেক রহ. বলতেন, "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ৬০ বছর পর্যন্ত ফতোয়ার কাজ করেছেন।" সেই ফতোয়া এবং সিদ্ধান্তমূলক ফিকহি আলোচনা যদি একত্র করা হয় তাহলে বিশাল একটি কাজ হয়ে যাবে। অবশ্য মুওয়াত্তা মালেক এবং মুসনাদে আহমাদে সেসবের অনেক কিছুই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ তো একথাও বলেছেন যে, "যদি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতোয়া এবং বর্ণনা একত্রিত করা হয় তাহলে পূর্ণ দীনের জন্য সেই ইলমই যথেষ্ট।"[৬২৯] কবিতা, সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তার আগ্রহ তেমন ছিল না। কারণ তিনি ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানেই প্রশান্তি অনুভব করতেন। তাই বলে এসব তার দৃষ্টির বাইরে ছিল না। হাদিস ও ফিকহি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনে সেসব অনর্গল বের হতে থাকতো।[৬৩০]

---

[৬২৯] সহিহ বুখারি : ১১২২
[৬৩০] ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান : ১/৪৪০; উসদুল গাবাহ : ৩/৩৩৬

রাতের অনেক বড় একটি অংশ কাটতো তার নফলে।[৬৩১] প্রতিদিনই তিনি একবার করে কুরআন খতম করতেন।[৬৩২]

সাওয়াব অর্জনের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। ঘর থেকে অজু করে ছোট ছোট কদম ফেলে মসজিদে যেতেন, যাতে প্রতি কদমে যে-সাওয়াব দেওয়ার ওয়াদা আছে তা যেন অর্জন হয়ে যায়।[৬৩৩]

প্রত্যেক বছরই তিনি হজ আদায় করতেন। কখনো বাদ দিতেন না। এমনকি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে যে-বছর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঘেরাও করে ফেলল, সেবারও তিনি হজ আদায় করেছিলেন।[৬৩৪] তখন তিনি এই চিন্তা করে প্রথমে উমরা তারপর হজের ইহরাম বেঁধেছিলেন যে, যদি হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হন তাহলে হুদাইবিয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমরা না করেই ইহরাম খুলে ফেলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে এবং নবীজির আমলের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে সাওয়াবও পাওয়া যাবে।[৬৩৫] সুন্নাতের পাবন্দিতে তার আগ্রহ ছিল সীমাহীন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনেকটা পাগল প্রেমিকের মতো।[৬৩৬] হজে যাওয়ার সময় তিনি সেসব জায়গাতেই থামতেন, যেখানে নবীজি থেমেছিলেন। যেখানে নবীজি নামাজ আদায় করেছিলেন, সেখানে তিনিও নামাজ আদায় করতেন।[৬৩৭] কেউ দাওয়াত দিলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করতেন। নবীজির অনুসরণে তিনিও দাওয়াত গ্রহণ করতেন। যখন তিনি নফল রোজা রাখতেন তখন মেজবানের সাথে খাবার না খেলেও উপস্থিত অবশ্যই হতেন, যেন সুন্নাত আদায় হয়ে যায়।[৬৩৮]

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় তিনি বাইয়াত গ্রহণ করলেও রাজনীতির ময়দান থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু

---

[৬৩১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৫৪
[৬৩২] আখবারি মাক্কা : ২/৩৪৩
[৬৩৩] সহিহ বুখারি : ১৮০৬
[৬৩৪] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৩৭৬
[৬৩৫] আল-ইসাবাহ : ৪/১৬০
[৬৩৬] সহিহ মুসলিম : ৩৫৮৯
[৬৩৭] আল ইসতিয়াব : ৩/৯৫১
[৬৩৮] সুরা হুজুরাত, আয়াত ৯

পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে তিনি এটা ভাবতেই বাধ্য হয়েছিলেন যে, ফেতনা-ফাসাদের সময় দূরে অবস্থানের চেয়ে খলিফায়ে হকের সঙ্গ দেওয়াই উচিত। সেজন্য তিনি বলতেন, "আমি নীরব থেকেছি এবং হাতও গুটিয়ে রেখেছি। কিন্তু যারা হকের জন্য লড়াই করেছে তারাই উত্তম।"[৬৩৯]

একবার তিনি কুরআন মাজিদের আয়াত فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবৎ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।[৬৪০]

এর আওতায় আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "আমার অন্য কোনো বিষয়ে এতো চিন্তা নেই, যতটা চিন্তা হয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার বিষয়ে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা এরই নির্দেশ দিয়েছেন।"[৬৪১]

তার সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার এমন যোগ্যতা ছিল যে, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা, যিনি জঙ্গে জামালের ভুল ইজতিহাদের কারণে লজ্জিত ছিলেন, তিনি একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে বললেন, "আমি দেখলাম হজরত যুবাইর রা. আপনার সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছেন।" উম্মুল মুমিনিন বলেন, "আল্লাহর শপথ, আপনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে একবারও নিষেধ করতেন তাহলে আমি এই যুদ্ধের সফরে বের হতাম না।"[৬৪২]

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াতে খেলাফতের মজলিসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু তিনি উম্মতকে ফেতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করতে চাইতেন; তাই ইয়াজিদের রাজত্বকালে কিছু সময় বিলম্ব করলেও পরবর্তীতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত থেকে এজন্য বিলম্ব করছিলেন যে, আবদুল মালেক এবং তার মধ্যে যুদ্ধ তখনো অব্যাহত ছিল। আর শেষ ফলও ছিল অস্পষ্ট। কারো প্রতি তার ঝোঁক প্রকাশ করা পছন্দ

---

[৬৩৯] মুসতাদরাকে হাকিম : ৩৭২২
[৬৪০] আল ইসতিয়াব : ৩/৯১০; তারিখে দিমাশক : ৩১/১১০
[৬৪১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩০৬-৩২২
[৬৪২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৮৭

করছিলেন না। আর তিনি এগুলোকে ফেতনাই মনে করছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তিনি আবদুল মালেকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নেন। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানও তাকে অনেক সম্মান করতো। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই নির্দেশ দিলেন যে, যেন হজের বিধান পালানের ক্ষেত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে অনুসরণ করে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কারণে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. অনেক ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই হাজ্জাজ যখন তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা শুরু করল তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মুখের উপর হাজ্জাজকে সেসবের উত্তর দিয়ে দিলেন। অবশ্য এই কারণে হাজ্জাজ অনেক অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তার থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিল। ৭৩ হিজরির হজে অজ্ঞাত কোনো লোকের বিষমাখা তিরের আঘাতে আহত হন। আর এই আঘাতের ফলেই তিনি ৭৪ হিজরির মহররম মাসের ১ তারিখে ইনতেকাল করেন। সকলের ধারণা হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফই তাকে হত্যা করিয়েছিল।[৬৪৩]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার ছেলে সালেমকে বলেছিলেন, "বেটা, আমার মৃত্যু হয়ে গেলে তুমি আমাকে হারামের সীমানার বাইরে কোথাও দাফন করবে। আমার কখনোই এটা সহ্য হবে না যে, যেখান থেকে আমি হিজরত করেছি সেখানেই আমাকে দাফন করা হবে।"

ছেলে সালেম তখন বলল, "আব্বাজান, যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি তা অবশ্যই করব।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একথা শুনে খুব রেগে গেলেন এবং বললেন, "আমি বলার পরও তুমি বলছো যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে করবে!"

ছেলে সালেম তখন বুঝিয়ে বললেন, "আমি আসলে বুঝাতে চাচ্ছি, হাজ্জাজ হয়তো জোরজবরদস্তি করবে এবং সে-ই জানাজার নামাজ পড়াবে।"

---

[৬৪৩] মুসনাদুল হারেস: ২/৭৫৯ রেওয়ায়েত নং ৭৫৫

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এ কথা শুনে একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। এরপর যখন তার ইনতেকাল হয়ে গেলো তখন সে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওসিয়তের বিপরীত হারামের ভেতরেই দাফন করে দেয়।[৬৪৪]

ফেতনার যুগ এবং ইবনে উমর রা. এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. রাজনৈতিক ফেতনার সময় কার পক্ষে ছিলেন? আর তার দৃষ্টিতে কে হক আর কে বাতিল ছিলেন? এই প্রশ্নটা এখন প্রায়শই করতে দেখা যায়। যেহেতু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর

---

[৬৪৪] ব্যাপকভাবে এটাই ছড়ানো আছে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হজরত আলি রা.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি। কারণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন ছিলেন নিরপেক্ষ অবস্থানে। বাইয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে তার নাম স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু ওয়াকিদির এক বর্ণনা থেকে এটা জানা যায় যে, তিনি হজরত আলি রা.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩০, ৪৩১; তবে প্রবল ধারণামতে যেই রেওয়ায়েতে আনসার এবং মুহাজির সাহাবিদের সাধারণভাবে বাইয়াত গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে, তাদের সাথে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. শরিক ছিলেন। বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন হজরত তালহা যুবাইর, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, আম্মার বিন ইয়াসির, উসামা ইবনে যায়েদ, সাহল ইবনে হুনাইফ, আবু আইয়ুব আনসারি, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, যায়েদ ইবনে সাবেত, খুযাইমা ইবনে সাবেতসহ যারা মদিনায় অবস্থানকারী সাহাবি ছিলেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৩১; মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, মুহাজির এবং আনসার সাহাবিগণ গেলেন এবং বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এরপর অন্যান্য সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করলো। তারিখুত তাবারি : ৪/৪২৭; যখন হজরত উসমান রা. শহিদ হয়ে গেলেন তখন লোকেরা হজরত আলি রা.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক: ৯৭৭০; এরপর সকলেই তার হাতে বাইয়াত হয়ে গেলো। তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৩; অধিকাংশ আলেম বলেছেন, হজরত আলি ইবনে আবু তালেবের প্রতি আমরা সকলেই সন্তুষ্ট। তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৪; এখন শুধু ওয়াকিদির বর্ণনা থেকে যায়। তবে এটাও বেশি শক্তিশালী নয়। এক্ষেত্রে প্রবল ধারণা হলো এই যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হয়তো বাইয়াত হয়েছিলেন; কিন্তু সতর্কতার জন্য প্রকাশ্যে সহযোগিতা করা থেকে বিরত ছিলেন। যেমনটা অনেক সাহাবিই করেছিলেন। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, উসমানিগণ বলেন যে, হজরত আলি রা.-এর খেলাফত মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সাহাবি বিরত ছিলেন। যেমন, হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হজরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হজরত উসামা ইবনে যায়েদ-সহ আরো কয়েকজন সাহাবি। এক্ষেত্রে আমরা বলি যে, উসমানিরা যাদের নাম উল্লেখ করেছে, তারা বাইয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে পেছনে তো অবশ্যই ছিলেন না; তবে হ্যাঁ এটা সত্য যে, তারা প্রকাশ্য সহযোগিতা থেকে বিরত ছিলেন। কারণ এটি একটি ইজতিহাদি মাসআলা ছিল। আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম : ১৫০

রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্বটা ছিল বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং সবধরনের ও প্রত্যেক শ্রেণির লোকই তাকে সম্মান করতো, তার বক্তব্য ও ফতোয়া গ্রহণ করতো। এজন্য প্রত্যেক শ্রেণির লোকই চায় যে, কীভাবে তাকে নিজেদের দলে নিয়ে আসা যায়। আর কীভাবে নিজেদের সমচিন্তার লোক হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। সে কারণেই কেউ কেউ বলে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. উমাইয়া আমিরদেরকে বেদীন ও মুনাফিক মনে করতেন। আবার কেউ কেউ বলে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বনু উমাইয়ার শাসন খেলাফতে রাশেদার চেয়ে কোনো অংশে কম উত্তম নয় এবং তিনি এই আফসোস করেছেন যে, হায়! বনু উমাইয়ার বিরোধিতাকারীদের সাথে কেন আমি যুদ্ধ করলাম না! মোটকথা সকলেই নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থান সঠিক বানানোর জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অথচ আমাদের উচিত হলো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা ও আদর্শ সেইসকল লোকের কাতারে রেখে বিচার করা, যারা ছিলেন নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুতরাং আমরা এখানে বাস্তবতা জানার জন্য কোনোরকম বিতর্কে না গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব এবং এক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহিহ বর্ণনাগুলোই প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবতাটা তুলে ধরবো। প্রথমে সাহাবায়ে কেরামের সেই মজলিসের কথা উল্লেখ করব, যেখানে শুধু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরই নয়; বরং অন্যান্য বেশ ক'জন প্রবীণ সাহাবির রাজনৈতিক চিন্তাধারাও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে: "হিশাম ইবনে হাসসান বলেন, একবার কয়েকজন সাহাবি একত্র হলেন, যাদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত হুযাইফা, হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুম শরিক ছিলেন। তারা ফেতনার যুগ বা সময়কাল নিয়ে আলোচনা করছিলেন। হজরত হুযাইফা রা. তখন বললেন, "যদি আমি সেই জমানা পেয়ে যাই তাহলে তখন আমি জেনে যাবো যে, সেখান থেকে বাঁচার পথ কী।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, "যদি আমি সেই জমানা পেয়ে যাই তাহলে আমার

জানা নেই যে, সেখান থেকে কীভাবে বাঁচবো।" হজরত সা'দ রা. বললেন, "যদি আমি সেই জমানা পেয়ে যাই আর তখন আমার কাছে যদি এমন তরবারি থাকে যে, সে বলে দেবে কে কাফের এবং কে মুসলমান তাহলে আমি যুদ্ধ করব অন্যথায় করব না।" হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন বললেন, "আমি আপনার সাথে একমত।" হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. বললেন, "যদি আমি সেই জমানা পেয়ে যাই তাহলে আমি তরবারি উঠিয়ে কাঁধে রাখবো এবং উম্মতের বড় অংশের সাথে মিলে সেই তরবারি ততক্ষণ চালাবো যতক্ষণ না বিরোধীশক্তি ধ্বংস হয়ে যায়।"[৬৪৫]

হজরত আলি ও হাসান রা. এর যুগে

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হজরত আলি রা. এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমস্যায় অংশগ্রহণ করেননি। জঙ্গে জামাল এবং জঙ্গে সিফফিন উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও ফাটল তৈরি করে দিয়েছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা ছিল নিরপেক্ষ এবং উভয় দলের সাথেই সম্পর্কহীন।[৬৪৬] তবে একথা সত্য যে, এই নিরপেক্ষ লোকদের কারণে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শক্তি ও ক্ষমতা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৬৪৭]

যখন ইরাক ও শামের অধিবাসীদের লড়াই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল তখন ঘটলো জঙ্গে সিফফিন। এরপর তা সমাধানের জন্য বিজ্ঞজনদের একটি পরামর্শসভাও বসেছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন নিরপেক্ষ হয়েই সেই মজলিসে গেলেন।[৬৪৮] কিন্তু মজলিসের আলোচনা যখন এদিক-সেদিক হয়ে যাচ্ছিল এবং সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না তখন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.

---

[৬৪৫] এসব হজরত আসলে ফিকহি রায়ের কারণে মা'জুর ছিলেন। কারণ তারা সেই সকল হাদিস দেখছিলেন, যেখানে ফেতনার সময়ে নির্জনতাকে বেছে নেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

[৬৪৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫৭০, ৫৭১; তারিখুত তাবারি : ৫/৬৭-৭১

[৬৪৭] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১/২৯৪

[৬৪৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/২২৭

কে খলিফা বানানোর প্রস্তাব করেন। আর নিঃসন্দেহে তিনি খেলাফতের উপযুক্তও ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে যতটা উন্নত আসন প্রদান করেছিলেন ততটাই বিজ্ঞতা দান করেছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র বা হুকুমত তাই ছিল, যাতে সাধারণ জনগণ নিজেদের পছন্দ, সন্তুষ্টি এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্তমতো একজনকে খলিফা বানাতে পারে। মুসলমানদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা তার কাছে একটি ভুল ও অন্যায় পথ ছিল, যা তিনি না নিজের বেলায় পছন্দ করতেন আর না অন্যের বেলায়। এজন্যই যখন মজলিসে তার খলিফা হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা উঠল তখন তিনি বললেন, "উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্য ও সন্তুষ্টি ছাড়া এই পদ না আমাকে দেওয়া ঠিক হবে আর না আমার গ্রহণ করা।"[৬৪৯] হাফেজ জাহাবি রহ. বলেছেন, "সেদিন হজরত আলি রা. এবং হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার অনেক সম্ভাবনা ছিল। আর যদি সকলে সত্যিই তার হাতে বাইয়াত হয়ে যেতো তাহলে এই দুই সাহাবিও নারাজ হতেন না এবং এ নিয়ে কোনো বিবাদ বা বিতর্ক করতেন না।"[৬৫০]

হজরত ইবনে উমর রা. এর কাছে উত্তম শাসকের মাপকাঠি

মূলত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি এটাই ছিল যে, শাসনক্ষমতা যেন উত্তম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এতে ক্ষমতা প্রদর্শন ও প্রভাব না খাটানোই ভালো।[৬৫১] সেইসাথে তিনি মনে

---

[৬৪৯] উত্তম পদ্ধতি এটাই। কারণ অনেক হাদিসে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হাঙ্গামার সময় তা বৈধ আছে। যেমন : এই আয়াতের অধীনে মুফতি শফি রহ. এই মাসআলা শর্তসাপেক্ষে উল্লেখ করেছেন। اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْض। এই আয়াতের অধীনে মুফতি শফি রহ. এই মাসআলা শর্তসাপেক্ষে উল্লেখ করেছেন। মাআরিফুল কুরআন: সুরা ইউসুফ: আয়াত ৫৫

[৬৫০] হজরত উবনে উমর রা.-এর মাসআলা ছিল যে, যোগ্য ও উপযুক্ত লোক থাকতে অযোগ্যের হাতে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইয়াত গ্রহণ ঠিক নয় যতক্ষণ ফেতনার আশঙ্কা না থাকে। ফাতহুল বারি : ৭/৪০৪

[৬৫১] সহিহ বুখারি : ৪১০৮

করতেন যে, শাসনক্ষমতা যেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম কারো কাছে যায়, যেন উম্মতের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও মতভিন্নতা খুব কম তৈরি হয়। নামাজের ইমামতি করার ক্ষেত্রে শরয়ি মাসআলা এমনই।[৬৫২] একারণেই হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন চেষ্টা এবং কৌশলে বিজয়ী হলেন এবং শাসক হলেন আর হজরত হাসান রা. উম্মতের কল্যাণের দিকে লক্ষ করে খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ক্ষমতার এই রদবদলে সন্তুষ্ট ছিলেন না।[৬৫৩] কিন্তু তবু তিনি উম্মতকে ফেতনায় জড়ানো থেকে বাঁচানোর জন্য বাইয়াত গ্রহণ করে নিলেন।[৬৫৪] এমনকি হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন খেলাফতের প্রথম ভাষণে পূর্বের খলিফাদের প্রতি বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করছিলেন তখনো তিনি উত্তেজিত হওয়ার বদলে নীরব ছিলেন, যেন এখনকার এই ঐকমত্যে কোনো ফাটল না ধরে।

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যদিও হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন; কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে তিনি সম্পূর্ণই পৃথক ছিলেন। তবে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর তখনো ভেতরে ভেতরে ভয় কাজ করছিল যে, না জানি কখন হজরত আবদল্লাহ ইবনে উমর রা. ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টায় নেমে যান। তাই তিনি নিজের সান্ত্বনা ও নিশ্চিন্তির জন্য হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে তার কাছে

---

[৬৫২] একারণেই তিনি তার পর হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং পরবর্তীতে তার ছেলে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সাথে নিজের ছেলেকেও তাদের বাইয়াত ভঙ্গ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। ফাতহুল বারি : ৭/৪০৪

[৬৫৩] হজরত মুয়াবিয়া রা. সেই খুতবায় বলেছিলেন: এখন এই বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চাইলে মাথা তুলে বলতে পারো। তবে আমরা এই খেলাফতের সবচেয়ে বেশি হকদার। এর থেকে এবং এর পিতা থেকে।" হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, আমি একথা শোনার পর জায়গা থেকে কিছু বলার জন্য উঠতে চাইলাম। আমি তাকে বলতে চাচ্ছিলাম যে, এই খেলাফতের সবচেয়ে বেশি হকদার হলো তারা, যারা তোমার এবং তোমার পিতার ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু আমি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। কারণ এতে সমাবেশে বিঘ্নতা দেখা দিতে পারে। এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্তও গড়াতে পারে। সেইসাথে আমার কথা ভিন্ন খাতেও প্রবাহিত হতে পারে। সুতরাং আমি জান্নাতের ছাওয়াবকেই প্রাধান্য দিলাম এবং যথেষ্ট মনে করলাম। (সহিহ বুখারি : ৪১০৮)

[৬৫৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৬৪

পাঠালেন, যেন আসল তথ্যটা চলে আসে। হজরত আমর ইবনুল আস রা. তার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "আবু আবদুর রহমান, আপনাকে কোন জিনিস লোকদের বাইয়াত করা থেকে বিরত রেখেছে? আপনি তো আল্লাহর নবীজির সাহাবি এবং আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র। আপনিই তো এই ক্ষমতার সবচেয়ে বেশি হকদার।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন বললেন, "আচ্ছা! আপনি যা বলছেন এর উপর কি সকলেই একমত?"

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশ্নে হজরত আমর ইবনু আস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, কিছু লোক ছাড়া সকলেই এ বিষয়ে একমত।"

"শুনুন। যদি হিজরের তিনজন খ্রিষ্টানও এব্যাপারে মতানৈক্য করে তাহলেও আমার এই পদের কোনো প্রয়োজন নেই।"[৬৫৫]

ফেতনার সেই সময়জুড়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি এটাই ছিল যে, বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই না করাই উত্তম। অবশ্য কেউ কেউ এ বিষয়টা নিয়ে প্রশ্নও উত্থাপন করতো। এক ব্যক্তি এসে বলল, "আপনি তো এক বছর হজ এবং এক বছর উমরা করেন ঠিকই; কিন্তু আপনি জিহাদ ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ আপনি এটা ভালো করেই জানেন যে, আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে কতোটা গুরুত্বারোপ করেছেন।"

উত্তরে তিনি বললেন, "ইসলামের মূল রুকন ৫টি। আল্লাহ এবং তার রাসুলের উপর ঈমান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। রমজান মাসের রোজা। জাকাত প্রদান এবং হজ আদায় করা।"

"আচ্ছা! আপনি কি আল্লাহ তায়ালার এই ফরমান শোনেননি?

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

[৬৫৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৬৪

মুসলিমদের মধ্যে দুটি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ো। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবৎ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দিয়ো। এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।[৬৫৬]

তখন উত্তরে তিনি বললেন, "এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে লজ্জা দেওয়া আর না লড়াই করা আমার কাছে পছন্দ। তবে আমি এটা নিশ্চিত যে, আমাকে কেউ এই আয়াত পড়ে লজ্জা দেবে না, যাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে জেনেবুঝে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি গজব নাজিল করবেন ও তার প্রতি লানত করবেন। আর আল্লাহ তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৬৫৭]

এর উত্তরে সেই ব্যক্তি বলতে লাগল, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হলো,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(হে মুসলিমগণ,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যাবৎ না ফেতনা দূরীভূত হয়। এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লার হয়ে যায়।[৬৫৮]

এর উত্তরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, "আমরা এটা নবীজির জীবদ্দশায় করেছি। যখন মুসলমান ছিল খুবই অল্প। তখন

---

[৬৫৬] সুরা হুজরাত : আয়াত ৯
[৬৫৭] সুরা নিসা : আয়াত ৯৩
[৬৫৮] সুরা আনফাল : আয়াত ৩৯

মানুষকে দীনের জন্য কষ্ট দেওয়া হতো। লোকেরা এমন কাউকে পেলে হয় বন্দি, নয় হত্যা করে ফেলতো। এমনকি এভাবে এক সময় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলো এবং ফেতনাও দূর হয়ে গেলো।"

এরপর লোকটি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, "আচ্ছা, আপনি হজরত উসমান রা. এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কী বলেন?"

এর উত্তরে তিনি বললেন, "তাদের ব্যাপারে আমি ভালো ছাড়া কীই-বা বলতে পারি! হজরত উসমান রা. কে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের এটা সহ্য হয় না যে, আল্লাহ তাকে কেন ক্ষমা করবেন? আর হজরত আলি রা. তো নবীজির চাচাতো ভাই এবং তার জামাতা ছিলেন। এখনো তার পরিবারের লোকজন আছে, যাদেরকে তোমরা দেখছো।"[৬৫৯]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, এক লোক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে এই আয়াত-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(হে মুসলিমগণ,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যাবৎ না ফেতনা দূরীভূত হয়। এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লার হয়ে যায়।[৬৬০]

শুনিয়ে সমালোচনার পাত্র বানাতে চাইলে তিনি বললেন, "আচ্ছা, ফেতনা কী তোমরা জানো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতেন। আর মুশরিকদের ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হওয়াই ছিল ফেতনা। আর রাসুলের সেই যুদ্ধ তোমাদের মতো নিছক রাজত্ব দখলের জন্য ছিল না।" [৬৬১]

---

[৬৫৯] সহিহ বুখারি : ৪৬৫০
[৬৬০] সুরা আনফাল : আয়াত ৩৯
[৬৬১] সহিহ বুখারি : ৭০৯৫

ইয়াজিদের পৈত্রিক ক্ষমতা নিয়ে ইবনে উমর রা. এর মন্তব্য

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ইয়াজিদের পৈত্রিকসূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্তির ব্যাপারে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই মতের পক্ষে ছিলেন না, যা তিনি নিজের খেলাফতকালের শেষদিকে করেছিলেন। কারণ ইয়াজিদ কোনোভাবেই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল ছিল না। তার এই পদে সমাসীন করার বিষয় এবং নাম প্রকাশটা একান্তই হজরত মুয়াবিয়া রা. -এর পক্ষ থেকে ছিল। আর তিনি চাচ্ছিলেন যে, অন্যরাও যেন তার এ মতের সাথে একাত্মতা পোষণ করে। তখনো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতোয়া তাই ছিল যে, একজন অযোগ্য শাসকের হাতে তখনো বাইয়াত হওয়া বৈধ যখন বাইয়াত না হলে মানুষের মাঝে ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। হজরত মুয়াবিয়া রা. তখনো মনে মনে ভয় পাচ্ছিলেন যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আবার বিরোধিতা না করে বসে! তিনি এ নিয়েও আতংকে ছিলেন যে, হিজাজবাসীরা তার অস্বীকারের কারণে বিদ্রোহ না করে বসে। তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন হজের জন্য হিজাজ গেলেন এবং মদিনায় পৌঁছলেন তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ছিলেন মক্কায়। হজরত মুয়াবিয়া রা. তখন মসজিদে নববির মিম্বরে উঠে এ বিষয়ে খুতবা দিলেন এবং একপর্যায়ে বললেন, "আল্লাহর শপথ, যদি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বাইয়াত গ্রহণ না করে তাহলে আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো।"[৬৬২]

অবশ্য পরবর্তীতে হজরত মুয়াবিয়া রা. বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার ব্যাপারে এমন কথা বলাটা সঠিক হয়নি। কিন্তু খুব দ্রুততার সাথে এই কথা মক্কায় পৌঁছে যায়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে অবস্থান করছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান এই সংবাদ শুনে বললেন, "আপনার কি মনে হয় মুয়াবিয়া রা. আপনাকে হত্যা করে ফেলবে আর আমি বসে থাকব? আল্লাহর শপথ, যদি পৃথিবীতে শুধু আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া কেউ না থাকে তখনো আমি আপনার জীবন রক্ষার জন্য লড়াই করে যাবো।"

---

[৬৬২] তারিখে খলিফা : ২১৪ তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৮৩

এরপর হজ করার জন্য হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন মক্কায় এলেন, তখন যারা তাকে স্বাগত জানিয়েছিল তাদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ানও ছিলেন। তিনি তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, যদি ইবনে উমর রা. আপনার ছেলে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত না হয় তাহলে আপনি নাকি তাকে হত্যা করবেন?

হজরত মুয়াবিয়া রা. তার একথার উত্তর দিয়েছিলেন যে, "আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে কেন হত্যা করতে যাবো! আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই ইবনে উমরকে হত্যা করব না।"[৬৬৩]

এরপর তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের উৎসাহ দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, "যখন সবাই একটি বিষয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে তখন আমিও তাদের সাথে শামিল হয়ে যাবো।"[৬৬৪]

ইয়াজিদের যুগে

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকালের পর যখন ইয়াজিদ ক্ষমতায় আসীন হলো তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছিলেন, "যদি এটাতেই কল্যাণ থাকে তাহলে তো ভালোই। আর যদি মুসিবত হয়, তাহলে ধৈর্যধারণ করব ইনশাআল্লাহ।"[৬৬৫]

---

[৬৬৩] তারিখে খলিফা : ২১৫; এখানে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর বলা শব্দগুলো চিন্তার দাবি রাখে। তিনি কিন্তু উত্তরে মিথ্যা কিছু বলেননি। তিনি এমনভাবে প্রত্যাখ্যানও করেননি যে, আমি তো একথা বলেছি বা একথা বলিনি। বরং তিনি বলেছেন, আমি কখনোই তাকে হত্যা করবো না।" প্রকাশ্য যে, একথা সম্পূর্ণই সত্য। আর পূর্বের কথাটা রাগের কারণে তখন তার মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছিল। তার এমন কোনো কাজের ইচ্ছা ছিল না। আর যদি থেকেও থাকে তাহলেও তিনি তা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং পরিত্যেগ করেছিলেন। সুতরাং এই সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই যে, তিনি ভুল কোনো কথা থেকে ফায়েদা গ্রহণ করেছেন। এটা শরয়ি সতর্কতা এবং স্মৃতিতে তীক্ষ্মতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, মিথ্যা বা ভুল বয়ান ছাড়াও অন্যকে শান্ত ও নিরাপদ করা যায়।

[৬৬৪] তারিখে খলিফা : ২১৩, ২১৪

[৬৬৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৮২ তারিখে খলিফা : ২১৭

সে-সময়ে তিনি হজরত হুসাইন রা. কে কুফায় যেতে বারণ করেছিলেন। কারণ তিনি আশংকা করছিলেন সেখানে গেলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[৬৬৬] তিনি ইয়াজিদের বাইয়াত সেই সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখেন যতক্ষণ তিনি শরয়ি অবকাশ লাভ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লেখেন, "ইয়াজিদের গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উতবা তাকে ডেকে বললেন, "ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে যান।"

উত্তরে তিনি বললেন, "যখন সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করে নেবে তখন আমি করব।" এক ব্যক্তি তখন বলল, আপনি কি এটা চাচ্ছেন যে, লোকেরা পরস্পরে লড়াই করতে করতে খতম হয়ে যাক? যখন আপনারা ছাড়া কেউ বাকি থাকবে না তখন বাইয়াত গ্রহণ করবেন?

উত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা যেমনটা বলছো আমি তেমনটা চাচ্ছি না। আমি বরং বলছি যে, সকলেই যখন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নেবে এবং আমি ছাড়া কেউই বাকি থাকবে না তখন আমিও বাইয়াত গ্রহণ করে নেবো।" আসলে বনু উমাইয়ারা মূলত এমন লোকদেরকে খুব ভয় করতো।[৬৬৭] এজন্যই তারা হাররার যুদ্ধের আগ পর্যন্ত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিস্যদেরকে খলিফার বিরোধিতা করার ব্যাপারে সতর্ক ও নিষেধ করতো।[৬৬৮]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে মূলত নবীজির সেই সকল হাদিস ছিল, যাতে তিনি খলিফাদের বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন; যদিও সে জালেম বা ফাসেক হয়; আর যতক্ষণ না সে স্পষ্ট কুফুরিতে লিপ্ত হয়। সেই কারণে এক্ষেত্রে তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদি জনসাধারণের সন্তুষ্টি ও সম্মতি ছাড়াও কেউ শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং ক্ষমতা মজবুত করে ফেলে তাহলে পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে সে শাসক হয়ে যায়। আর এমতাবস্থায় তার বিরোধিতা করাও উচিত নয় এবং যারা করবে তাদেরকে মূলত পথহারা এবং রাষ্ট্রদ্রোহী

---

[৬৬৬] আল মু'জামুল আওসাত লিততাবারানি : ৫৯৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৫১৩০; তারিখে দিমাশক : ১৪/২০২; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/২৯২

[৬৬৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৬৯

[৬৬৮] সহিহ বুখারি : ১১১

হিসেবেই গণ্য করা হবে।[৬৬৯]

এক ব্যক্তি তাকে তার সকল ইলম লিখে রাখার কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "ইলম তো অনেকেই আছে। কিন্তু যদি সম্ভব হয় তাহলে এটা করো যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যখন তোমার উপর মানুষের রক্তের কোনো দায়ভার না থাকে। তোমার পেটে অন্যদের কোনো সম্পদ না থাকে। তোমার জবান মানুষের অসম্মান করা থেকে নিরাপদ থাকে এবং তুমি মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরে থাকো।"[৬৭০]

ইবনে যুবাইর রা. এবং বনু উমাইয়াদের মাঝে গণ্ডগোলের সময়কাল

আসলে এই সময়ের শুরু থেকেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিগত খেয়াল ছিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে না জড়ানো। কিছু বর্ণনায় তো এটাও পাওয়া যায় যে, তিনি 'বিদ্রোহী দল'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে পেরে আফসোস প্রকাশ করেছেন।

এ ব্যাপারে মৌলিকভাবে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে 'বিদ্রোহী দল' বলতে শামের অধিবাসীরা উদ্দেশ্য, যারা হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তার কাছে 'বিদ্রোহী দল' বলতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দল উদ্দেশ্য।

আবার কিছু বর্ণনায় এটাও পাওয়া যায় যে, 'বিদ্রোহী দল' বলতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দল উদ্দেশ্য।

এখন এই তিনটি বর্ণনার প্রথমটিকে যদি আমরা ধরে নিই তাহলে এতে কোনো সমস্যা থাকে না। কারণ অধিকাংশ আলেমের মতও এটাই যে, হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে শামের যেসব বাসিন্দা লড়াই করেছে, তারাই মূলত বিদ্রোহী দল।

---

[৬৬৯] অধিকাংশ ফকিহর মাসলাক এটাই।
[৬৭০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/২২২

আর যদি দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করি তাহলেও কোনো সমস্যা বা আপত্তি থাকে না। কারণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর হাজ্জাজ বিদ্রোহ করেছিল। আর তার নেতা মারওয়ান ইবনে আবদুল মালেক তো নিঃসন্দেহে বিদ্রোহী ছিল। কিন্তু সমস্যা বাধে যদি তৃতীয় সুরত গ্রহণ করা হয়। কারণ তখন এই প্রশ্নটা অবশ্যই সামনে আসবে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ ছিল?

সুতরাং আমরা যদি এগুলো নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখি তাহলে সহজেই বুঝে উঠবো যে, এগুলো মূলত তার আলাদা আলাদা সময়ের চিন্তা বা সিদ্ধান্ত।

ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আন্দোলনকে এজন্য বিদ্রোহ বলা যেতে পারে যে, তখন আসলে ইয়াজিদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আর উম্মতও হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বাঁচার জন্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাকেই শাসক হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তাই বলে এই বিদ্রোহ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর বিরুদ্ধে নয়। বরং অসৎ ও জালেম শাসকের বিরুদ্ধে ছিল, যা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে বৈধ ও জায়েজ এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে অবৈধ ও নাজায়েজ ছিল। সেজন্যই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে বিদ্রোহী বলা মূলত সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ছিল।[৬৭১]

[৬৭১] এই মাসআলাটা বিস্তারিতভাবে 'ইযালায়ে শুবহাত' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.

হজরত আনাস রা. সেই লোকদের একজন, যার সত্তার আবির্ভাবটাই মূলত ছিল হেদায়েতের একটি আলোকসদৃশ, যা আজও মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে চলছে। নবীজির নানিবাড়ি বনু নাজ্জারের দিক থেকে তার সম্পর্ক ছিল।[৬৭২] তার যখন বয়স ১০ বছর হয়েছিল তখনই নবীজি হিজরত করে এলেন মদিনায়।[৬৭৩] হজরত আনাস রা. কে তার মা উম্মে সুলাইম রা. নবীজির খেদমতে তখনই নিয়ে গেলেন এবং বললেন, "আল্লাহর রাসুল, এই ছেলেটিকে আপনার খেদমতের জন্য কবুল করে নিন।"[৬৭৪]

তিনি এমন মেধাবী ছিলেন যে, নবীজির খেদমতে আসার পূর্বেই তিনি লেখাপড়া সব শিখে গিয়েছিলেন।[৬৭৫] হজরত আনাস রা. দশ বছর পর্যন্ত নবীজির খেদমতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৬৭৬] নবীজি তার এই ছোট্ট খাদেমের সাথে মজাকও করতেন এবং বলতেন, "হে দুই কানওয়ালা।"[৬৭৭]

হজরত আনাস রা. অনেক কমবয়সি হওয়া সত্ত্বেও নবীজির প্রধান খাদেম হিসেবে গাজওয়ায়ে বদর,[৬৭৮] গাজওয়ায়ে উহুদ[৬৭৯] এবং গাজওয়ায়ে খাইবারে উপস্থিত ছিলেন।[৬৮০] চোখে দেখা এইসব যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তিনি স্পষ্ট করে দিতে পারতেন। কমবয়সি হওয়া সত্ত্বেও তার

---

[৬৭২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৭
[৬৭৩] সহিহ মুসলিম : ৫৪০৯
[৬৭৪] সহিহ মুসলিম : ৬৫৩১
[৬৭৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৯
[৬৭৬] সহিহ মুসলিম : ৫৪০৯
[৬৭৭] সুনানে আবু দাউদ: ৫২০০
[৬৭৮] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৪৪৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/২১৫
[৬৭৯] সহিহ বুখারি : ৫৮১১
[৬৮০] সহিহ বুখারি : ২৮৯৩

ভেতরে দায়িত্ববোধের অবস্থা এমন ছিল যে, নবীজির গোপন সব কিছুই তিনি আমানতের সাথে সংরক্ষণ ও গোপনই রাখতেন। একবার নবীজি একটি পত্র দিয়ে তাকে এক লোকের কাছে পাঠালেন। পরে তার মা উম্মে সুলাইম রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সেখানে কী লেখা ছিল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নবীজির দরবারের কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করতে পারবো না।"[৬৮১] ইত্তেবায়ে সুন্নাতের অবস্থা এমন ছিল যে, একদিন তিনি নবীজির সাথে গেলেন দাওয়াত খেতে। তখন তিনি দেখলেন নবীজি লাউয়ের টুকরা খুঁজে খুঁজে খুব আগ্রহের সাথে খাচ্ছেন। হজরত আনাস রা. বলেন, এর পর থেকেই লাউ আমার অত্যন্ত প্রিয় খাবার হয়ে উঠল।"[৬৮২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য খুব দোয়া করতেন। একবার বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি আনাসের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে বরকতওয়ালা বানিয়ে দাও।"[৬৮৩] নবীজির দোয়ার বরকতে তিনি যখন বড় হলেন তখন তার খুবই ভালো সময় কাটতে লাগল। সম্পদ ও সন্তানে প্রাচুর্য চলে এলো। তার সন্তানসন্ততি ও নাতি-পুতি সব মিলিয়ে একশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৬৮৪]

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তিনি বাহরাইনে জাকাত উসুলের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আর তার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। এরপর যখন হজরত উমর রা. খলিফা হলেন তখন তিনি মদিনায় ফিরে এলেন। ইরাকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। ইরানি সরদার হুরমুজকে গ্রেফতার করে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন। ইরাক বিজয়ের পর তিনি বসরায় স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন আর পরবর্তী জীবন তিনি সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন।[৬৮৫] বসরায় তার একটি বাগান ছিল। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এই বাগানে বছরে দু'বার ফল ধরতো এবং সেখান থেকে মেশকের মতো সুঘ্রাণ বেরিয়ে আসতো।[৬৮৬]

---

[৬৮১] মুসনাদে আহমাদ : ১৩৪৬৯

[৬৮২] সহিহ মুসলিম : ৫৪৪৬

[৬৮৩] সহিহ মুসলিম : ৬৫২৭

[৬৮৪] সহিহ মুসলিম : ৬৫৩১

[৬৮৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪০১, ৪০২

[৬৮৬] সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৩৩

হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বড় সাহাবিগণ শুধু তাকে সম্মান নয়; বরং খেদমত করতেন। কারণ তিনি ছিলেন 'খাদেমে রাসুল।'[৬৮৭]

হজরত আনাস রা. একজন মুসতাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। একবার দুর্ভিক্ষের সময় তার কাছে দোয়ার দরখাস্ত করা হলো। যেন আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করেন। তখন তিনি অজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন এবং দোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশে মেঘ এসে জমা হলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো।[৬৮৮] হজরত আনাস রা. নবীজির প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করতেন। নামাজের আদবের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মানুষ তার নামাজ দেখে অনিচ্ছাতেই বলে ফেলতেন, নবীজির মতো নামাজ হজরত আনাস রা. ছাড়া আমি কাউকে পড়তে দেখেনি।"[৬৮৯]

হজরত আনাস রা. সবসময় রাজনৈতিক বিষয়াদি থেকে দূরে থাকতেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও তিনি কিছু খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তিনি বসরায় শুরার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।[৬৯০]

হজরত আনাস রা. তার এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক কিছুই দেখেছিলেন। তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সেও ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক মুজাহাদা করতেন। রাতের নফল তিনি এত লম্বা করে পড়তেন যে, তার পা ফুলে যেতো।[৬৯১] রাফেজি এবং নাসেবিদের প্রতি তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। বলতেন, "এরা বলে যে, হজরত উসমান রা. এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মহব্বত এক স্থানে জমা হতে পারে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা তো আমাদের অন্তরে তাদের দুজনের মহব্বত তৈরি করে রেখেছেন।"[৬৯২]

---

[৬৮৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪০১

[৬৮৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪০০

[৬৮৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪০০

[৬৯০] তারিখুত তাবারি : ৫/২২৪

[৬৯১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪০৫

[৬৯২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪০০

৬০ হিজরির উত্তাল ও অস্থির এবং হাঙ্গামামুখর পরিস্থিতিকে তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত মাথা তিনি কুফার রাজপ্রাসাদে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের সামনে দেখেছিলেন।[৬৯৩] ৬৬ হিজরির মহামারিতে তার পরিবারের প্রায় ৭০ জন সদস্য ইনতেকাল করেছিলেন।[৬৯৪] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তাকে খুব সম্মান করা হতো এবং সেকারণেই তাকে বসরার জামে মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[৬৯৫] কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে যখন শহিদ করে সাহাবায়ে কেরামের খেলাফত ধ্বংস করে দিয়ে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হলো এবং হাজ্জাজকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হলো তখন তাকে অনেক কষ্টের সময় পার করতে হয়েছিল। হাজ্জাজ তাকে পদে পদে অসম্মান করতো এবং সুযোগ পেলেই অপমান করে বসতো। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে একটি অভিযোগপত্র আবদুল মালেকের কাছে পাঠালেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই হাজ্জাজকে আবদুল মালেক তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেয়।[৬৯৬] এতটুকুতেই হাজ্জাজ তার কাছে ক্ষমা চাইলো এবং তার

---

[৬৯৩] সহিহ বুখারি : ৩৭৪৮

[৬৯৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪০৫

[৬৯৫] তারিখে খলিফা : ২৫৯

[৬৯৬] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৪৫৪ এটি বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, জিয়াদ ইবনে আইয়ুব, এবং আবু কুরাইব, তারা উভয়ে আবু বকর ইবনে আইয়াশ থেকে আর তিনি আ'মাশ থেকে।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা

১. মুহাম্মদ ইবনে ইয়া'কুব: তিনি ৩৬৮ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন। তার ব্যাপারে ইমাম জাহাবি রহ. বলেছেন, "আসসদুক"। তারিখুল ইসলাম : ৮/২৯৫

২. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক: ইমাম দারাকুতনি তার ব্যাপারে বলেছেন, "ইমামান, সাবাতান মা'দুমুন নাযার"। মওসুআতু আকওয়াল: ২/৫৫৪ ইমাম জাহাবি তার ব্যাপারে বলেছেন, "আল হাফেজুল হুজ্জাহ, ইমামুল আইম্মাহ"। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৪/৩৬৫

৩. জিয়াদ ইবনে আইয়ুব : তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৬০ হিজরিতে আর মৃত্যুবরণ করেছেন ২৫২ হিজরিতে। তিনি হলেন সহিহ বুখারির রাবি। সর্বসম্মতিক্রমে সিকাহ। তাকরিবুত তাহযিব : ২০৫৬

৪. আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনুল আলা : তিনি ১৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ২৪৭ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন। তিনি বুখারি এবং মুসলিমের রাবি। সর্বসম্মতিক্রমে সিকাহ। তাকরিবুত তাহযিব : ৭৯৮৫

ব্যাপারে খুব সতর্ক হয়ে গেলো। সেইসাথে ভালো ব্যবহারও করতে শুরু করল। তবে হাজ্জাজের অন্যান্য কাজ ঠিকই অব্যাহত রইলো। হাজ্জাজ নামাজ পড়ানোতে এতো বেশি বিলম্ব করতো যে, হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলতেন, "নবী-জমানায় অনেক কিছু হয়ে গেলেও নামাজের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় ছিল না। কিন্তু এখন তো নামাজই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"[৬৯৭] লোকেরা হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অন্যায়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন হজরত আনাস রা. তাদেরকে ধৈর্য ধরার তাগিদ দিয়ে বলতেন, "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের উপর এমন কোনো সময় আসবে না, যা গত হয়ে যাওয়া সময় থেকে উত্তম হবে। এমনকি এই অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে গিয়ে মিলিত হবে।"[৬৯৮]

শেষজীবনে তিনি দুনিয়া নিয়ে ভীষণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন বলতেন, জীবন এতই লম্বা যে, আমি এখন বেঁচে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি।[৬৯৯] সেই সময় নবীজিকে স্বপ্ন দেখাই ছিল তার একমাত্র সান্ত্বনা। একবার তিনি বলেছেন, "আমার এমন কোনো রাত অতিবাহিত হয় না, যাতে আমি নবীজিকে স্বপ্নে দেখি না।" এই বলে তিনি অঝোরধারায় কাঁদতে থাকলেন।[৭০০] হজরত আনাস রা. ৯৩ হিজরিতে একশো বছর বয়সে ইনতেকাল করলেন এবং বসরা থেকে ছ' মাইল দূরে তাকে দাফন করা হয়। বসরায় মৃত্যুবরণকারী তিনিই সর্বশেষ সাহাবি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার মহব্বত কেবল এক ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, নবীজির কিছু চুল তিনি আজীবন সংরক্ষণ করেছেন। আর ইনতেকালের আগে তিনি এই অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার ইনতেকালের পর এই চুল তোমরা আমার

---

৫. আল আ'মাশ : তিনি ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১৯৪ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনিও বুখারি এবং মুসলিমের রাবি। সর্বসম্মতিক্রমে সিকাহ। তাকরিবুত তাহযিব : ২৬১৫

[৬৯৭] আল আখবারুত তুওয়াল : ৩২৪

[৬৯৮] মুসনাদে আহমাদ : ১৩১৬৮ সহিহ বুখারি : ৫৩০

[৬৯৯] সহিহ বুখারি : ৭০৬৮

[৭০০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/২০

জিহ্বার নিচে রেখে দেবে। পরবর্তীতে তাই করা হয়েছিল।[৭০১]

হজরত আনাস রা. আমরণ কুরআন ও হাদিসের প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ফতোয়া ও মাসআলাও দিতেন। এজন্যই তাকে মুকরি, মুহাদ্দিস ও মুফতি আখ্যা দেওয়া হয়।[৭০২]

সিরাত ও মাগাজি নিয়ে তার আগ্রহ ছিল অনেক। তিনি নবীজির শুধু মাদানি-জীবনটাই দেখেছিলেন; কিন্তু তিনি মক্কি-জীবন নিয়েও আলোচনা করতেন। মোটকথা, তিনি নবীজির যেই সময়কাল ও জীবন দেখেননি, তাও তিনি বড় বড় সাহাবির থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২৮৬টি। যার মধ্যে ১৮০টির শুদ্ধতার ব্যাপারে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. একমত। এবং ৮০টি বুখারিতে আর ৯০টি তিরমিজিতে বর্ণিত হয়েছে।

---

[৭০১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/২০

[৭০২] আল-ইসাবাহ : ১/২৭৬

ওয়ায়েস ইবনে আমের আল-কারনি রহ.

তিনি ছিলেন ইয়েমেনের বাসিন্দা। এবং মুরাদ গোত্রের শাখা কারনের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি নবীজিকে জীবদ্দশাতেই পেয়েছিলেন; কিন্তু নবীজির সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য তার অর্জন হয়নি। তিনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা ইবাদতকে নিজেদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তিনি আজীবন অপ্রসিদ্ধভাবে নীরবে ও নির্জনেই বসবাস করেছিলেন। তিনি 'খাইরুত তাবেয়িন" উপাধিতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাফেজ জাহাবি রহ. তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, "দুনিয়াবিমুখ, পথপ্রদর্শক এবং তৎকালীন সময়ের সাইয়িদুত তাবেয়িন।" এরপর তিনি লেখেন, "তিনি একজন আল্লাহর অলি ছিলেন এবং মুত্তাকি ও মুখলিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"[৭০৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই উম্মতের বুজুর্গি ও কারামাত সম্পর্কে জানতেন। তাই তিনি সাহাবিদেরকে তার বিশেষ কিছু নির্দশন বলে তাগিদ দিতেন যে, যদি তোমাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তাহলে তার কাছে মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাইবে। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমর রা. কে বললেন, "তাবেয়িদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলেন ওয়ায়েস নামের এক ব্যক্তি। বনু মুরাদের শাখাগোত্র কারনের সাথে তার সম্পর্ক থাকবে। সে তার মায়ের অনেক খেদমত করবে। সে হবে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। কিন্তু দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেবেন। তবে নাভির কাছে ছোট্ট একটি দাগ থাকবে কুষ্ঠরোগের আলামত হিসেবে। সে যখন কোনো বিষয়ে শপথ করবে তখন আল্লাহ তায়ালা তা নিজ কুদরতে পূর্ণ করে দেবেন।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এটাও বলেছিলেন যে, "তোমাদের কাছে ইয়েমেন থেকে সাহায্যের জন্য

---

[৭০৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৯৬

রিজার্ভ বাহিনী আসবে। তাদের মধ্যে ওয়ায়েস কারনি থাকবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে তার থেকে ক্ষমার জন্য দোয়া করিয়ে নিয়ো।"[৭০৪]

হজরত উমর রা. বছরের পর বছর ওয়ায়েস কারনি রহ.-এর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখনই ইয়েমেন থেকে কোনো সৈন্য আসতো, তিনি খোঁজ নিতেন তাদের মধ্যে ওয়ায়েস কারনি কে? সর্বশেষ একদিন তার সাথে দেখা হয়ে গেলো। হজরত উমর রা. তাকেও চিনে ফেললেন। নাম ও বংশের পর সেইসব বিষয়েই জিজ্ঞেস করলেন, যেগুলো নবীজি বলেছিলেন। যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, তিনিই ওয়ায়েস কারনি তখন তার কাছে মাগফিরাতের দোয়া চাইলেন। এরপর হজরত উমর রা. জিজ্ঞাস করলেন, "কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "কুফা"। হজরত উমর রা. চাচ্ছিলেন, যেন তার সম্মান হয়; তাই তিনি বললেন, "আমি কি সেখানকার গভর্নরের কাছে কোনো পরোয়ানা লিখে দেবো?" তখন তিনি উত্তরে বললেন, "না। আমি অপ্রসিদ্ধ ও নীরবে থাকাই পছন্দ করি।"

এরপর হজরত ওয়ায়েস কারনি রহ, কুফায় চলে গেলেন। ধারণা এটাই করা যায় যে, তিনি সাধারণ মুজাহিদদের সাথেই কুফায় প্রেরিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি ইয়েমেন থেকে এজন্যই বের হয়েছিলেন। জিহাদ ছাড়াও তিনি জিকির-আজকার এবং অন্যান্য ইবাদতে জীবন কাটিয়েছিলেন। কুফা থেকে আগমনকারী হাজিদেরকে তিনি হজরত ওয়ায়েস কারনি সম্পর্কে খোঁজ নিতে থাকলেন। যারা হজরত ওয়ায়েস কারনিকে চিনতেন, তারা বলল, তিনি খুব দরিদ্রতার মাঝে জীবনযাপন করছেন।

হজরত উমর রা. নবীজির ইরশাদ অনুযায়ী তিনিও অন্যান্যকে বলতেন যে, তোমরা তার দেখা পেলে মাগফিরাতের দোয়া করিয়ে নিও।[৭০৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদেশ থেকে একথা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়, আল্লাহওয়ালাদের জিয়ারত করা, দীনি ও ঈমানি ফায়দা গ্রহণের জন্য

---

[৭০৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/১৯, ২০

[৭০৫] সহিহ মুসলিম : ৬৬৫৪; মুসতাদরাকে হাকিম : ৫৭১৯

তাদের খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের থেকে দোয়া নেওয়া হলো সুন্নাত। আর এ বিষয়টাতে খুব গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদেশের কারণে কুফার অনেক বড় বড় মনীষী হজরত ওয়ায়েস রহ.-এর কাছে যেতেন এবং তার কাছে মাগফিরাতের দোয়া চাইতেন। অনেকেই আবার তার অনেক খেদমতও করে দিতেন। ইবনে জাবের রহ. হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশের কারণে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার থেকে দোয়া চাওয়ার পর একটি উত্তম পোশাক পরিয়ে দেন। হজরত ওয়ায়েস রহ. যখন সেসব পরিধান করে বাইরে বের হতেন তখন যারা তাকে চিনতো সকলেই অনেক আশ্চর্য হয়ে যেতো। কারণ, তিনি সবসময় অত্যন্ত সাদাসিধেভাবেই চলাফেরা করতেন।[৭০৬] যদিও কুফায় তিনি খুব নীরবেই বসবাস করছিলেন; কিন্তু মেশকের সুঘ্রাণ কয়দিন আর লুকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সকলেই তার অবস্থান সম্পর্কে জেনে গেলেন। আর সকলেই তার কাছে একত্র হতেন। হজরত ওয়ায়েস রহ. স্বভাবতই স্বল্পভাষী এবং নীরব ছিলেন। এজন্য তার মজলিসে ওয়াজ ও নসিহত এবং হাদিসের দরসের রেওয়াজ ছিল না। তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো তিনি কাউকে উপদেশ দিতেন। যার মূল বিষয় ছিল দুনিয়ার বিনাশ এবং আখেরাতের ফিকির। এ ছাড়া তার মজলিসে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার জিকির হতো। যতটুকু ধারণা করা যায়, এই জিকির কুরআনের তেলাওয়াত এবং মাসনুন জিকিরই ছিল।[৭০৭] হজরত ওয়ায়েস কারনি রহ. সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে জিহাদ করতে করতে শহিদ হয়ে যান।[৭০৮]

---

[৭০৬] সহিহ মুসলিম : ৬৬৫৬

[৭০৭] সহিহ মুসলিম : ৬৬৫৬

[৭০৮] তারিখুল ইসলাম : ৩/৫৫৫-৫৫৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/২০-২৪

হজরত আখনাফ ইবনে কায়েস রহ.

হজরত আখনাফ ইবনে কায়েস রহ. সেসব মনীষীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নবীজিকে জীবদ্দশায় পেয়েছিলেন; কিন্তু তার সাথে সাক্ষাতের তাওফিক হয়নি। তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী এবং বনু তামিম গোত্রের সরদার। তার মধ্যে নেতৃত্ব-সহ সব গুণই বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী, সতর্ক, বাহাদুর, মুজাহিদ, মুত্তাকি, পরহেজগার এবং সর্বোপরি আল্লাহওয়ালা। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় তিনি মদিনায় এসে তার কাছে তরবিয়ত গ্রহণ করেছেন। হজরত উমর রা. তার অসাধারণ গুণাবলির কারণে তার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন ও যত্ন নিতেন। সর্বশেষে তাকে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে বসরা পাঠিয়ে দিলেন। এরপর থেকে তার পদমর্যাদা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকল।[৭০৯]

তিনি বসরার রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক এবং সমাজের শিরোনাম ছিলেন। খলিফার কাছে কোনো বিষয় পেশ করার জন্য তার চেয়ে উত্তম কেউ ছিল না। এ ছাড়াও তিনি মদিনায় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য উপস্থিত হতেন।[৭১০]

---

[৭০৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৩১

নোট : ওয়ায়েসে কারনি রহ.-এর সম্পর্কে অনেক মওজু এবং যয়িফ বর্ণনা রয়েছে। যাতে তার অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয়ের ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। হাফেজ জাহাবি রহ. সিয়ারু আলামিন নুবালাতে সেগুলোর উপর জরাহ করেছেন। সঠিক বর্ণনা এবং যয়িফ বর্ণনা থেকে যা যা বুঝে আসে আমরা এখানে সেগুলোই তুলে ধরেছি। নবীজির জীবদ্দশায় মদিনায় তার আগমন এবং মায়ের খেদমতের জন্য নবীজির সাথে সাক্ষাৎ না করেই প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটা অনেক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই বর্ণনাটি সহিহ রেওয়ায়েত তো অনেক দূরের কথা একটি যয়িফ বর্ণনাতেও পাওয়া যায় না। আসলে এই ঘটনা অনেক পরে এসে তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই তার ব্যাপারে ছড়ানো ঘটনাগুলোকে সরলভাবে বিশ্বাস করে এবং গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু বিপরীত দিকে এমনও কিছু মানুষ আছে যারা তার অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসে। অথচ তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় বিদ্যমান। আসলে এটা তাদের তাহকিকি মানসিকতার পরিবর্তে কঠোরতাই মাত্র।

[৭১০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৯৪

ইরানের বিজয় সত্ত্বেও কুচক্রী মহলের কারণে হজরত উমর রা. খুব পেরেশান ছিলেন। হজরত আখনাফ রহ. তখন মূল বিষয়টা ধরে ফেললেন এবং বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে ইয়াজদাগিরদ থাকবে ততদিন তাদের এই চক্রান্ত ও আন্দোলন বন্ধ হবে না।" তখন হজরত উমর রা. ইরানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সৈন্য মোতায়েন করে দিলেন এবং আরো কয়েকটি দল আলাদাভাবে পাঠালেন। হজরত আখনাফ রহ. কে সেই অভিযানের প্রধান বানানো হয়েছিল। ফল এই দাঁড়ালো যে, আক্রমণের মুখে ইয়াজদাগিরদ টিকতে পারল না এবং ধাওয়া খেতে খেতে তুর্কিস্তানের দিকে পালাতে বাধ্য হলো। আর সম্পূর্ণ ইরান ও খোরাসান মুসলিমদের অধিকারে এসে গেলো।[৭১১]

হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে যখন খোরাসানিরা বিদ্রোহ শুরু করল তখন হজরত আখনাফ রহ. দ্বিতীয়বারের মতো সেসব অঞ্চল জয় করলেন এবং বিদ্রোহীদের লজ্জাজনক পরাজয় উপহার দিলেন।[৭১২]

এসবের কারণে তার বিশেষ এক অবস্থান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ফলত হজরত আলি রা. এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও তিনি বেশ সম্মানের সাথেই ছিলেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তার থেকে পরামর্শ নেওয়া হতো। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যখন বসরার গভর্নর হলো তখন তিনি খুবই অবহেলার শিকার হলেন। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন এগুলো জানতে পারলেন তখন তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে সতর্ক করলেন। ফলে পুনরায় তিনি তার সম্মান ফিরে পেলেন। হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তার অবস্থান এতটাই মজবুত ছিল যে, ইয়াজিদকে খলিফা বানানোর বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাকে বসরা থেকে দামেশক নিয়ে এলেন। হজরত আখনাফ ইবনে কায়েস রহ.-এর ইয়াজিদের ক্ষমতাসীন হওয়াকে ভালো মনে করলেন না। আর সেকথা তিনি স্পষ্ট জানিয়েওছিলেন। কিন্তু সেই সাথে একথাও বলেছিলেন যে, প্রশাসন যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে নিতে প্রস্তুত।[৭১৩]

---

[৭১১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৮৯

[৭১২] আল-কামিল ফিত তারিখ : ২১ হিজরি থেকে ২২ হিজরি পর্যন্ত।

[৭১৩] আল কামেল ফিত তারিখ : ২/১৯৯

ইয়াজিদের যুগে হজরত আখনাফ ইবনে কায়েস রহ.-এর বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি সম্ভবত তখন নীরবতা ও নির্জনতাকেই নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তবে ইয়াজিদের মৃত্যুর মাধ্যমে যখন ইরাকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো তখন তিনি ময়দানে এলেন এবং হাঙ্গামা থামানোর কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন।[৭১৪] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তিনি পুরোপুরিই তার পাশে ছিলেন। নামকরা সরদার মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা রহ. কে তিনিই খারেজিদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।[৭১৫] হজরত আখনাফ রহ.-এর ইরাকে কাজ্জাব মুখতার সাকাফির বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক ও সজাগ করার কাজেও তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৭১৬] এরপর আবদুল মালেক যখন শামে বিদ্রোহ শুরু করল তখন তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাকে মেলানোর জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন সম্ভব নয় তখন তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেই রয়ে গেলেন।[৭১৭]

তিনি উম্মতের প্রাজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শামিল ছিলেন। তার মৃত্যুর সময় অনেক বড় বড় মনীষী বলেছিলেন যে, আজ বুদ্ধি ও গভীর প্রজ্ঞার মৃত্যু হয়ে গেলা।[৭১৮] হজরত হাসান বসরি রহ. বলতেন, "আমি আখনাফের চেয়ে উত্তম কোনো জাতির সরদার দেখিনি।"[৭১৯]

তার সহ্যশক্তি, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতা প্রবাদতুল্য ছিল। একবার এক লোকের সাথে কোনো কারণে ঝগড়া বেধে গেলে সেই লোক বলল, "যদি তুমি আমাকে একটি কথা শোনাও তাহলে আমি তোমাকে দশটি শুনিয়ে দেবো।" হজরত আখনাফ রহ. তখন খুব নম্রতার সাথে তার উত্তরে বললেন, "যদি তুমি আমাকে দশটি কথাও শুনিয়ে দাও তাহলেও আমি তোমাকে একটি কথাও শোনাবো না।"[৭২০]

---

[৭১৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩০৭
[৭১৫] তারিখে খলিফা : ২৫৮
[৭১৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৬১৫
[৭১৭] তারিখুত তাবারি : ৬/৬৮-৭০
[৭১৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৯৬
[৭১৯] তাহযিবুত তাহযিব : ১/১৯১
[৭২০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৯৫

তার মুজাহাদার অবস্থা এমন ছিল যে, খুব কঠিন থেকে কঠিনতর শীতের মধ্যেও তিনি অজু করতেন। কখনো তায়াম্মুমের উপর ইকতিফা করতেন না। একবার খোরাসানের এক যুদ্ধে রাতে তার গোসল ফরজ হয়ে গেলো। তিনি তখন সেনাপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জাগ্রত করেননি। তিনি নিজেই পানি খুঁজতে বের হলেন। তখন তার পায়ে আঘাত ছিল; কিন্তু তিনি সেদিকে সামান্য পরোয়া করেননি। পরে এক জায়গায় বরফ খোদাই করে পানি বের করে গোসল করলেন।[৭২১] রাজনৈতিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তার ইবাদত ও জিকিরে কোনো কমতি হতো না। খুব কঠিন সময়েও তিনি অনেক নফল আদায় করতেন ও রোজা রাখতেন। কেউ যখন তার জীবনের উপর রহম করার কথা বলল তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "অনেক লম্বা এক সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।" সামান্য সুযোগ পেলেই তিনি কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু এসব নিয়ে তার ভেতরে সামান্য অহংকারও ছিল না। নিজেকে তিনি গুনাহগারই মনে করতেন। প্রায় সময় তিনি দোয়ায় অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, "হে আল্লাহ, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন তাহলে তা আপনার মেহেরবানি। আর যদি শাস্তি দেন তাহলে আমি তার উপযুক্ত।" রাতে তিনি খুব লম্বা সময় নিয়ে নফল পড়তেন। নফসের খুব কড়া মুহাসাবা করা তার দৈনন্দিনের রুটিন ছিল। যখন কোনো অন্যায় হয়ে যেতো তখন তিনি আগুনে আঙুল দিয়ে জাহান্নামের শাস্তির কথা স্মরণ করতেন। মোটকথা গর্হিত এই কাজ কেন হলো?[৭২২]

লোকদের পরস্পরের ঝগড়ার সমাধান তার চেয়ে সুন্দর ও হেকমতের সাথে কেউ করতে পারতেন না। একবার এক লোক কেসাসের বদলায় দিয়তের বিষয় নিয়ে এলো। তিনি বাদিপক্ষকে বললেন তাদের ইচ্ছার কথা জানাতে। সিদ্ধান্ত সে অনুযায়ীই হবে। তখন বাদিপক্ষ বলল, আমরা দ্বিগুণ দিয়ত নেবো।" তখন তিনি বললেন, "যেমন তোমাদের ইচ্ছা।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, "দেখো, আল্লাহ তায়ালা (একজনকে ভুলবশত হত্যার কারণে) এক দিয়তই আবশ্যক করেছেন। নবীজিও সেটা বহাল রেখেছেন। আরবদের মধ্যে এই প্রচলনই চলে আসছে।

---

[৭২১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৯৩
[৭২২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৯২

আজ যখন তোমরা দ্বিগুণ দিয়ত চাচ্ছো, আমার সন্দেহ হয়, হয়তো আগামীকালও তোমাদের থেকে মানুষ দ্বিগুণ চাইবে।" এরপর বিষয়টা তারা বুঝলো এবং এক দিয়ত গ্রহণেই সম্মত হলো।[৭২৩]

তিনি খুবই গম্ভীর ও সুস্থির চিন্তার মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন, "আমি কখনো নিজ থেকে কোনো হাকিমের কাছে যাইনি। কখনো দুজনের মাঝে বসিনি যতক্ষণ না তারা নিজেরা আমাকে বসিয়েছে। আর যে আমার সাথে ভালো থাকতো আমি তাকে ভালো হিসেবেই স্মরণ করতাম।"[৭২৪]

তিনি নিজেও একজন দানবীর ছিলেন এবং অন্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। একদিন এক ব্যক্তির হাতে দিরহাম দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কার?" উত্তরে সে বলল, "আমার।" তখন তিনি বললেন, "এগুলো তো তখনই তোমার হবে যখন তুমি এগুলোকে ভালো ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত শেষ হওয়ার এক বছর পূর্বে ৭২ হিজরিতে তিনি কুফায় ইনতেকাল করলেন।[৭২৫] দাফনকারীদের একজন বলেছে যে, আমি তার কবরকে ভেতর থেকে দৃষ্টির শেষ পর্যন্ত প্রশস্ত হতে দেখেছি।[৭২৬] তার মজলিসে ইলম এবং হেকমতের আলোচনা হতো। অনর্থক কথা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। মজলিসে উপস্থিতদেরকে পথ দেখিয়ে বলতেন, "আমাদের মজলিসকে মহিলা এবং খাবার দাবারের আলোচনার সাথে গুলিয়ে ফেলো না।" তার হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ একেকটা কথা মণিমুক্তার চেয়েও মূল্যবান হতো। যারা চিনতে পারতো তারা তা নিয়ে যেতো। তার একেকটা বাক্যে শত শত বাক্যের সারনির্যাস ভরা থাকতো। অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হতো। উদাহরণস্বরূপ কিছু বাক্য উল্লেখ করছি:

১. শাসকরা উজির এবং তার সাথি-সহযোগী ছাড়া চলতে পারে না। আর তারা শাসকের মেহেরবানি বা উপদেশ ছাড়া চলতে পারে না। আর এই মেহেরবানি ও উপদেশ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রভাব সৃষ্টি

---

[৭২৩] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৯৫, ৯৬, ৯৭
[৭২৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৯৩
[৭২৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৯২
[৭২৬] তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি : ৫/৩৫৩

করতে পারে না যতক্ষণ তার পেছনে দূরদর্শিতা ও পবিত্র মনোভাবের নেতৃত্ব না থাকবে।

২. তিন ধরনের মানুষ তিন ধরনের লোকের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে পারে না। এক. ভদ্র ব্যক্তি অভদ্রের সাথে। দুই. নেককার ব্যক্তি ফাসেক ও ফাজেরদের সাথে। তিন. জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তির সাথে।

৩. আদবের শেকড় বা গোড়া হলো জবান।

৪. নেতৃত্ব বা ক্ষমতা ছাড়া কথা, দান ছাড়া ধন, জ্ঞান ছাড়া অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা ছাড়া সঙ্গী, তাকওয়া ছাড়া ইলম, নেক নিয়ত ছাড়া দান বা সদকা এবং সুস্থতা ও নিরাপত্তা ছাড়া জীবন কোনো কাজে আসে না।

৫. যার হাতেগোনা কিছু ভুলত্রুটি হয় সে হলো একজন কামেল মানুষ (মাসুম বা নিষ্পাপ তো শুধু নবীগণই হয়ে থাকেন)।

৬. যেই ব্যক্তি অসহ্য আচরণের ক্ষেত্রে দ্রুততা দেখায় মানুষও তার ব্যাপারে ভালো-মন্দ কথা ছড়ানোর ব্যাপারে দ্রুততা প্রদর্শন করে।

৭. শাসকের জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া মানানসই নয়। কারণ তাৎক্ষণিক তরবারি চালানো পরবর্তীতে আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৭২৭]

---

[৭২৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৯৫

কাজি শুরাইহ ইবনুল হারেস রহ.

কাজি শুরাইহ ইবনুল হারেস রহ. ইসলামের প্রসিদ্ধ একজন কাজি এবং প্রথম শ্রেণির তাবেয়িদের অন্তর্ভুক্ত। তার সম্পর্ক মূলত ইয়েমেনের এক পারস্য গোত্র কান্দার সাথে ছিল। তিনিও নবীজির জীবদ্দশাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার নবীজির সাথে সাক্ষাৎ ও সোহবতের সৌভাগ্য হয়নি। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তিনি ইয়েমেন ছেড়ে মদিনায় চলে আসেন।[৭২৮]

তিনি প্রায় সকল বড় বড় সাহাবির সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। হজরত উমর, হজরত আলি, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বড় বড় সাহাবি থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। হজরত শাবি, ইবনে সিরিন এবং হজরত ইবরাহিম নাখায়ির মতো ফকিহগণ তার শাগরেদ ছিলেন।[৭২৯] যদিও তিনি অনেক উঁচুমাপের মুহাদ্দিসও ছিলেন; কিন্তু তার মূল ও আগ্রহের বিষয় ছিল ফিকাহ। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার সমাধান খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারতেন। তার স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে অনেক জটিল কোনো মাসআলার গভীরে বা তলানিতে পৌঁছে যেতে পারতেন। হজরত উমর রা. একবার একটি জটিল বিষয়ে তার থেকে অনেক সুন্দর সমাধান পাওয়ার কারণে তিনি প্রভাবিত হয়ে তাকে কুফার কাজি বানিয়ে দিলেন। তিনি তার এই দায়িত্ব এতই সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছিলেন যে, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানা থেকে নিয়ে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসন পর্যন্ত এই দায়িত্বেই বহাল ছিলেন। হিসাব করলে দেখা যায়, তার এই দায়িত্বের বয়স প্রায় ৬০ বছর ছিল। এর মধ্যে কতো কী হয়েছে! কতো পরিবর্তন এসেছে। কতো সংগ্রাম-আন্দোলন ও জিহাদ হয়েছে; কিন্তু

---

[৭২৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৯৩, ৯৪

[৭২৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/১০০

সকলের ভেতরেই তার প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল। হজরত আলি রা. তাকে 'আকযাউল আরব' (আরবের শ্রেষ্ঠ কাজি) বলে ডাকতেন।[৭৩০]

তিনি সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বড় ব্যক্তিত্বকেও সামান্য ছাড় দিতেন না। বরং প্রমাণ ও সাক্ষ্য সামনে রেখে শরিয়তসম্মত ফয়সালা দিতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি নিজের আশা বা নিজের কোনো দিককে একেবারেই প্রাধান্য দিতেন না। বরং প্রমাণ যদি এমন ব্যক্তির বিপক্ষে যেতো, যে তার দৃষ্টিতে নিরপরাধ বা হকের উপর আছে বলে মনে হতো, তবু তিনি মামলার সিদ্ধান্ত দলিল এবং সাক্ষীদের উপর ভিত্তি করেই দিতেন। এটাই হলো ইনসাফের সর্বোচ্চ স্থান। আর এ ধরনের কাজিকেই প্রকৃত কাজি বলা যায়। হজরত আলি রা. যখন কুফাকে রাজধানী বানালেন তখন তিনি নিজে একবার বিবাদি হয়ে কাজি শুরাইহের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিচার বা মামলা ছিল এই যে, তার একটি যুদ্ধপোশাক মাটিতে পড়ে গিয়েছিল এবং সেটি এক ইহুদির হাতে পড়ে যায়। কিন্তু ইহুদি এখন এই বর্মটি নিজের বলে দাবি করছে। তাই পরিশেষে হজরত আলি রা. আদালতে এই পোশাকটি তার বলে দাবি করলেন। মামলার শুনানি যখন শুরু হলো তখন কাজি শুরাইহ ইহুদিকে জিজ্ঞাস করলেন, "তুমি কী বলো?" উত্তরে ইহুদি স্পষ্ট জানিয়ে দিলো যে, "এটা আমার।"

কাজি শুরাইহ এর প্রমাণ চাইলে সে বলল, "এটি যেহেতু এখন আমার কবজায় আছে তাই বর্মটা আমার হবে এটাই স্বাভাবিক।"

কাজি শুরাইহ হজরত আলি রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা! আপনার কাছে এর কোনো প্রমাণ আছে যে, পোশাকটি আপনারই?"

হজরত আলি রা. নিজের ছেলে হাসান রা. আর গোলাম কাম্বারকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন।

কাজি শুরাইহ বললেন, "কাম্বারের সাক্ষ্য তো ঠিক আছে; কিন্তু হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

হজরত আলি রা. তখন বললেন, "আপনি কি নবীজির এই হাদিস শোনেননি যে, হাসান-হুসাইন জান্নাতি যুবকদের সরদার!"

---

[৭৩০] তাযকিরাতুল হুফফাজ : ১/৪৭, ৪৮

কাজি শুরাইহ তখন বললেন, "হ্যাঁ, আমি তো হাদিস শুনেছি। কিন্তু আমার কাছে বাবার বিষয়ে ছেলের সাক্ষ গ্রহণযোগ্য নয়।"

যেহেতু কোনো কিছুর মালিকানা দুজনের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়; তাই হজরত কাজি শুরাইহ রহ. একজনের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলে মামলা খারিজ করে দিলেন। এই সিদ্ধান্তে সেই ইহুদি লোক এতোই প্রভাবিত হয়েছিল যে, সে নিজে নিজেই বলে দিয়েছিল, "আসলে বর্মটি হজরত আলিরই। আর আমি নিশ্চিত যে, এই ধর্ম সত্য, যে ধর্মের কাজি সমকালীন খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারে এবং খলিফাও সেই রায় হাসিমুখে মেনে নিতে পারে।"

এই বলে সে ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। হজরত আলি রা. এ বিষয়ে এতোই খুশি হলেন যে, তিনি বর্মটি তাকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন।[৭৩১]

একজন কাজির জন্য নিয়ম-নীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, আমানত ও দিয়ানতদারির পাশাপাশি প্রখর বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিরও অনেক প্রয়োজন। কারণ এ ছাড়া একজন সফল ও স্বার্থক কাজি বা বিচারক হওয়া সম্ভব নয়। হজরত কাজি শুরাইহ রহ.-এর ভেতরে এই গুণগুলো পূর্ণমাত্রায় ছিল। এর প্রমাণ অনেক ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। একবার দুই মহিলা একটি বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে তার কাছে বিচারের জন্য এলো। একজন বলছে এটা আমার বিড়ালের বাচ্চা। আরেকজন বলছে এটা আমার বিড়ালের বাচ্চা। হজরত কাজি শুরাইহ বললেন, "আচ্ছা, তোমরা এই বাচ্চাটিকে এই মা বিড়ালটির কাছে ছেড়ে দাও। যদি এই বিড়াল বাচ্চাটিকে আদর করে, দুধ খাওয়ায় এবং খুশির প্রকাশ করে তাহলে এই মা বিড়ালটি যার, বাচ্চাটিও তার হবে। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে বাচ্চাটিও তার হবে না।" এরপর তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হলো এবং সমস্যারও সমাধান হয়ে গেলো।[৭৩২]

তার চালাকি, সাবধানতা ও সর্বদা হুঁশিয়ার থাকার একটি মজার ঘটনা হলো এই—একবার শহরে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ফলে তিনি একটি অনাবাদ খোলা প্রান্তরে চলে গেলেন। আর সেখানেই রাতভর নফল

---

[৭৩১] আখবারুল কুযাত : ২/১৯৪-২০০ আল ইসতিয়াব : ২/৭০১, ৭০২; তাহযিবুল আসমা ওয়াললুগাত : ১/২৪৩

[৭৩২] আখবারুল কুযাত : ২/২০০

আদায় করতে থাকলেন। কিন্তু সমস্যা যেটা ঘটলো তা হলো, তিনি নামাজ শুরু করতেই একটি নেকড়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং বিকট শব্দে ডাকতে থাকতো। এতে তার নামাজে অমনোযোগিতা চলে আসতো। তাই একদিন তিনি তার জায়নামাজে একটি লাঠি দাঁড় করিয়ে রাখলেন এবং লাঠিতে নিজের পোশাক চড়িয়ে দিয়ে তিনি একটু দূরে বসে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। সময় মতো নেকড়ে এলো এবং চিৎকার করে ডাক আরম্ভ করলে তিনি ধীরে ধীরে পেছন দিক থেকে এসে নেকড়েটাকে আটকে ফেললেন। এরপর থেকেই আরবরা তাকে "আদহা মিনাস সা'লাব" (নেকড়ে থেকেও অধিক চালাক) বলতে থাকল।[৭৩৩]

কাজি শুরাইহ রহ.-এর ভেতরে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার গুণ পরিপূর্ণ ছিল। যখনই দুনিয়াবি কোনো দুঃখ আসতো তখনই তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়তেন। আর এরপর চারবার আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিতেন। তিনি বলতেন, "একবার আলহামদুলিল্লাহ এজন্য পড়ি যে, এর চেয়েও বড় কোনো মুসিবত এসে পড়েনি। দ্বিতীয়বার আলহামদুলিল্লাহ এই কারণে পড়ি যে, ধৈর্যধারণের তাওফিক পেয়েছি। তৃতীয়বার এই কারণে পড়ি যে, বিপদের কথা শুনে আমার ইন্নালিল্লাহ পড়ার সুযোগ হয়েছে। আর চতুর্থবার এই কারণে পড়ি যে, মুসিবতটা দীনি নয়; বরং দুনিয়াবি।[৭৩৪]

হজরত কাজি শুরাইহ রহ. একশো দশ বছর জীবিত ছিলেন। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময়কালে ৮০ হিজরিতে তার ইনতেকাল হয়ে যায়।[৭৩৫]

জরুরি নোট : এই যুগে মুসলিম উম্মাহর ইলমি, ঈমানি এবং আখলাকি তরবিয়াতকারী ব্যক্তিদের মধ্যে নবী-পত্নীগণ বিশেষত হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবদান অনেক। তারা উভয়ে প্রায় অর্ধশত হিজরি সাল পর্যন্ত এই খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের জীবনী যেহেতু যথাস্থানে 'উম্মাহাতুল মুমিনিন' শিরোনামে অতিবাহিত হয়েছে; তাই এখানে পুনরাবৃত্তির তেমন প্রয়োজন নেই।

---

[৭৩৩] আখবারুল কুযাত : ২/৩৯৩
[৭৩৪] তাহযিবুল কামাল : ১২/৪৪৪
[৭৩৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/১০৬

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে আল-মানহালের অনুমতিপত্র

AI-MANHAL
Publishers

92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
@almanhalpublish

Ref: AMP-107

Date: 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلہ دیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور و معروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

Al Manhal Publisher

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز، کراچی

ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

Cover : Kefayat 01712-813999